হেমেন্দ্রকুমার রায়
রচনাবলী

হেমেন্দ্রকুমার রায়

রচনাবলী

২১

সম্পাদনা

গীতা দত্ত

এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি
কলেজ স্ট্রিট মার্কেট ।। কলকাতা সাত

সূ চি প ত্র

রুনু-টুনুর অ্যাডভেঞ্চার : ৫
মানুষের গন্ধ পাই : ৭১
ইতিহাসের রক্তাক্ত দৃশ্য : ১১৯
চতুর্ভুজের স্বাক্ষর : ১৩৭
কবিতা : ১৯৮

রুনু-টুনুর অ্যাডভেঞ্চার

'রুনু-টুনুর অ্যাডভেঞ্চার' উপন্যাসটি প্রথমে ধারাবাহিক ভাবে বের হয় রামধনু পত্রিকায়, পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির থেকে। গ্রন্থটি উৎসর্গ করা হয় কুমারী নবনীতা দেবকে।

॥ প্রথম ॥

টুনু

সে হচ্ছে অরণ্যের স্বদেশ। এবং যারা সেখানে বাস করে, সাধারণত জীব হলেও তারা মানুষ নয়।

সেখানে বনে বনে ঘুরে বেড়ায় হাতির পাল, নদীর তীরে তীরে জলপান করতে আসে হরিণের দল এবং এখানে-সেখানে তাদের উপরে হানা দিতে চায় বড়ো বড়ো বাঘ। প্রকাণ্ড বন্য বরাহ ও তারও চেয়ে বড়ো আর হিংস্র বয়ার, নেকড়ে এবং বিষধর সর্প প্রভৃতি এসব কিছুরই অভাব নেই সেখানে।

সে যেন সবুজের সাম্রাজ্য। বন আর বন আর বন এবং মাঝে মাঝে জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়ের পর পাহাড়। কতরকম বড়ো বড়ো গাছ, কতরকম ফুলন্ত লতা এবং মাঝে মাঝে ঘাসের মখমলে ঢাকা শ্যামল মাঠ। কত রঙের কতরকম বনফুল, আদর করে কেউ তাদের নাম রাখেনি আজ পর্যন্ত। এখান থেকে বহু দূরে নির্বাসিত হয়ে আছে নাগরিক সভ্যতা। স্নিগ্ধ শ্যামলতায় চোখ জুড়িয়ে যায়, বিহঙ্গরাগিণীর ঝঙ্কারে শ্রবণ পূর্ণ হয়ে যায়, কলনাদিনী তটিনীর নৃত্যলীলা দেখে পরিতৃপ্ত হয়ে যায় নয়ন মন।

সারা বনভূমি জুড়ে দিনের বেলায় গাছের উপরে বা গাছের নীচে খেলা করে ময়ূর-ময়ূরী, হিমালয়ের পারাবত, বন্য হংস ও আর আর নানান জাতের রংবেরঙের পাখি। যতক্ষণ আকাশের পটে মাখানো থাকে রোদের সোনালি, ততক্ষণ তাদের কণ্ঠস্বরের সঙ্গে ছন্দ রেখে জেগে থাকে অরণ্যের অশ্রান্ত মর্মরধ্বনির কাব্যসংগীত।

কিন্তু সন্ধ্যা এসে যেই আলো মুছে চারিদিকে মাখিয়ে দেয় অন্ধকারের কালো রং, তখনই থেমে যায় মর্মর সংগীতের সঙ্গে গীতকারী বিহঙ্গদের সঙ্গত। তারপরে সেখানে জাগ্রত হয় এমন ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি, তা শ্রবণ করলে মনের মধ্যে পাওয়া যায় না কিছুমাত্র আশ্বস্তির ইঙ্গিত। গাছে গাছে পেচকদের চিৎকার আনে অমঙ্গলের সম্ভাবনা এবং বনে বনে ব্যাঘ্র ও অন্যান্য হিংস্র জন্তুদের ভৈরব গর্জনে সর্বাঙ্গ হয়ে ওঠে রোমাঞ্চিত। থেকে থেকে শোনা যায় আসন্ন মৃত্যুর কবলগত আহত জীবদের আর্তনাদ। কখনও হুড়মুড় করে ঝোপঝাপ দুলিয়ে [illegible] পদশব্দে পৃথিবীর মাটি কাঁপিয়ে ছুটে চলে যায় বন্য বরাহের দল। আবার কখনও বা শোনা যায় হস্তীজননীর কাতর আহ্বান-ধ্বনি—হয়তো জঙ্গলের কোথায় হারিয়ে গিয়েছে তার শাবক। কখনও অন্য কোথাও জাগে বিষম এক ঝটপটানির শব্দ—হয়তো অজগরের মৃত্যুপাকে জড়িয়ে পড়েছে কোনও হতভাগ্য হরিণ।

যতক্ষণ থাকে রাত্রি, যতক্ষণ থাকে অন্ধকার, যতক্ষণ আকাশে ওড়ে বাদুড় আর [illegible], ততক্ষণ কিছুতেই নিঃশব্দ হতে পারে না অরণ্যের নির্জনতা। ধ্বনি আর ধ্বনি এবং প্রত্যেক ধ্বনি দিচ্ছে কেবল মৃত্যুর আর হত্যার আর রক্তপাতের সাঙ্ঘাতিক ইঙ্গিত।

এমনকি, দিনের বেলায় বনস্পতিদের যে-মর্মরধ্বনির মধ্যে পাওয়া যায় কাব্যের আনন্দ, রাত্রে ভয়াল অন্ধকারের ছোঁয়াচ পেয়ে সে-ধ্বনিও হয়ে ওঠে ভয়াবহ। বাতাসে গাছের পরে গাছ নড়ে নড়ে ওঠে, আর সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় পৃথিবীর উপরে যেন বিষাক্ত নিশ্বাস ফেলছে অপার্থিব অভিশপ্ত আত্মারা। বনের আনাচে কানাচে যেদিকে চলে দৃষ্টি, সেই দিকেই যেন ওত পেতে অপেক্ষা করে থাকে কোনও না কোনও মূর্তিমান ও মারাত্মক বিপদ। এখানকার একমাত্র নীতি হচ্ছে—হয় মারো, নয় মরো। দয়ামায়া আসতে পারে না এখানকার ত্রিসীমানায়।

কিন্তু এই ভয়ংকর স্থানেও মানুষের আনাগোনা বন্ধ নেই। কাঠ কাটবার বা মধু সংগ্রহের জন্যে এখানে আসে অনেক লোক। ব্যাধরা বেড়ায় জঙ্গলে জঙ্গলে পশুপক্ষী বধ বা বন্দি করবার জন্যে। আরও নানা কাজে আসে আরও নানান রকম লোক। তারা অনেকেই হিংস্র পশুর পাল্লায় পড়ে প্রাণ দেয়, কিন্তু নাগরিক মানুষের তাগিদ মেটাবার জন্যে তবু তাদের এখানে আসতে হয় বারংবার। তারা সবাই যে প্রত্যহ বনে এসে আবার বন ছেড়ে বাইরে চলে যায়, তা নয়; তাদের অনেকেই বনের এখানে-সেখানে দল বেঁধে বসতি স্থাপন করে। এবং সেইসব বসতির ভিতরে তাদের সঙ্গে থাকে স্ত্রী-পুত্র-কন্যারাও।

যেখান থেকে সবে আরম্ভ হয়েছে বনের রেখা, সেইখানেই এক জায়গায় আছে একখানি বাংলো। সেই বাংলোর ভিতরে বাস করেন অরণ্যপাল বা বনরক্ষক। জাতে তিনি বাঙালি, নাম তাঁর অসিতকুমার রায়। আমাদের কাহিনি শুরু হবে এই বাংলোখানি থেকেই।

ছোটোখাটো বাংলো। খান-তিনেক ঘর। তারপরেই একটুখানি উঠোনের মতো জায়গা, তার পরেই আরও তিনখানি ছোটো ছোটো মেটে ঘর। রান্নাঘর, ভাঁড়ারঘর ও দাসদাসীদের থাকবার ঘর। বাংলোর চারিপাশেই আছে খানিকটা করে খোলা জমি। তার মধ্যে আছে শাক-সবজি ও ফুল গাছ দিয়ে বাগান রচনার চেষ্টা। জমির চারিদিকেই বাঁশ ও লতাপাতার সাহায্যে বেড়া দেওয়া হয়েছে।

সকাল। ঝিলমিলে গাছের সবুজের উপরে চিকন রোদের স্বচ্ছ সোনার পাত। চারিদিকে গানের আসর জমিয়েছে কোকিল, শ্যামা ও অন্যান্য পাখির দল এবং তারই মধ্যে থেকে থেকে ছন্দপাত করছে বেসুরো কাকের দল।

বাংলোর বারান্দায় একটি গোলটেবিলের ধারে বসে অসিত ও তার স্ত্রী সুরমা প্রভাতি চা পান করছিল। অসিতের বয়স তিরিশের বেশি নয় এবং সুরমা তারও চেয়ে দশ বছরের ছোটো। টেবিলের আর এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে তাদের মেয়ে রেণুকা, ডাক নাম টুনু। এই মেয়েটি ছাড়া তাদের আর কোনও সন্তান হয়নি।

টুনুর বয়স বছর পাঁচ। ফুটফুটে গায়ের রং, মুখখানি সুন্দর। ঠিক যেন একটি জ্যান্ত মোমের পুতুল।

টুনু এখনও চা খেতে শেখেনি, কিন্তু তার লোভ চায়ের সঙ্গের খাবারগুলোর দিকে। দু-খানি বিস্কুট ও একখানি জেলি-মাখানো খণ্ডরুটি পেয়ে টুনু যখন বুঝলে আপাতত আর কোনও খাবার পাবার আশা নেই, তখন মাথার কোঁকড়ানো চুলগুলি দুলিয়ে নাচতে নাচতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল বাংলোর বাগানে।

রোজ সকালে-বিকালে টুনুর খেলার জায়গা ছিল এই বাগানটি। এরই মধ্যে বসে বসে সে ধুলো-মাটি দিয়ে ঘর বানায়, লতাপাতা ছিঁড়ে রান্না করে খেলাঘরের তরকারি। তার আরও অনেক রকম খেলা আছে, সে-সবের কথা এখানে না বললেও চলবে। সেদিন টুনু বাগানের এদিকে-ওদিকে একটু ছুটোছুটি করেই দেখতে পেলে, একটা ফুলগাছের উপরে বসে আছে মস্ত একটি প্রজাপতি। কী চমৎকার তার ডানা দুটির রং! রামধনুকেও অত রকম রঙের বাহার থাকে না! অতএব টুনুর আজকের খেলা হল ওই প্রজাপতিটিকে বন্দি করবার চেষ্টা।

কিন্তু প্রজাপতি ধরা দেয় না। টুনু যেই তার কাছে যায়, অমনি সে ফুস করে এ গাছ থেকে উড়ে অন্য গাছে গিয়ে বসে। টুনুর রোখ চেপে গেল, আজ সে ওই প্রজাপতিটিকে ধরবেই ধরবে। প্রজাপতি ডানা কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে যত ওড়ে, টুনুও তার পিছনে পিছনে তত ছোটে। সে যেন এক নতুন রকম মজার চোর চোর খেলা।

প্রজাপতি উড়ছে, টুনুও হাত বাড়িয়ে ছুটছে। প্রজাপতি উড়তে উড়তে বাগানের ফটক পেরিয়ে বাইরে গিয়ে পড়ল, টুনুও তার পিছু ছাড়লে না। তার দৃষ্টি আর কোনওদিকেই নেই এবং তার চোখের সুমুখ থেকে যেন মুছে গিয়েছে ওই প্রজাপতি ছাড়া পৃথিবীর আর সব দৃশ্যই। সে কোনওদিনই বাগানের ফটকের বাইরে যায় না, বাপ-মায়ের মানা আছে। কিন্তু আজ সে যে ফটকের বাইরে চলে গিয়েছে, এ খেয়ালও তার ছিল না।

প্রজাপতি উড়ে পালায়, টুনুও ছোটে পিছনে পিছনে। প্রায় মিনিট-দশ ধরে চলল এই ছুটোছুটি। রোদের তাপ লেগে টুনুর কচি মুখখানি রাঙা হয়ে উঠল, কপালে দেখা দিলে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম। তার ছোটো ছোটো পা দু-খানি শ্রান্ত হয়ে এল, তবু প্রজাপতির সঙ্গ ছাড়তে পারলে না।

অবশেষে একটা ঝোপের কাছে এসে প্রজাপতি হঠাৎ আকাশের দিকে উড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল কোথায়। টুনু খানিকক্ষণ আকাশের দিকে চোখ তুলে হতাশ ভাবে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল এবং দুষ্টু প্রজাপতির এই অন্যায় ও অসঙ্গত ব্যবহার দেখে তার নরম ঠোঁট দু-খানি ফুলে ফুলে উঠতে লাগল দারুণ অভিমানে।

এতক্ষণ পরে তার হুঁস হল, সে বাগানের ফটক পেরিয়ে এসেছে। চারদিকে তাকিয়েও সে তাদের বাড়ি বা বাগান দেখতে পেল না। এখানে চারদিকেই রয়েছে জঙ্গল আর ঝোপঝাড়। কোনও দিকে তাদের বাড়ি আছে, তাও সে বুঝতে পারলে না। শেষটা আন্দাজে, একটা দিক ধরে আবার ছুটতে শুরু করলে।

কতকক্ষণ ধরে সে ছুটলে, তা সে জানে না। তবে এটুকু বুঝলে, যতই সে ছুটছে, জঙ্গল হয়ে উঠছে ততই নিবিড়। এদিকে নিশ্চয়ই তাদের বাড়ি নেই।

তখন বনের কাঁটাঝোপে লেগে তার ঘাগরার নানা জায়গা গেছে ছিঁড়ে এবং পায়ে কাঁটা ফুটে বেরুচ্ছে রক্ত। টুনু আর ছুটতে পারলে না, সেইখানেই বসে পড়ে সভয়ে করুণ স্বরে কেঁদে উঠল—'মামণি, বাবা গো!'

কিন্তু মা বা বাবার কোনওই সাড়া পাওয়া গেল না।

ওদিকে চা-পানের পর খানিকক্ষণ বসে বসে গল্প করলে অসিত ও সুরমা। টুনু এমন সময় রোজই বাগানের ভিতরে গিয়ে খেলা করে, সুতরাং তার জন্যে তাদের কোনওই ভাবনা হল না।

তারপর সুরমা বললে, 'টুনু বাগানে গিয়ে কী করছে বলো তো? কালকের মতো আজও আবার ফুলগাছ ছিঁড়ছে না তো?'

অসিত বললে, 'টুনু দিনে দিনে ভারী দুষ্টু হয়ে উঠছে। তুমি একবার গিয়ে দ্যাখো তো, সে কী করছে!'

সুরমা নিশ্চিন্ত ভাবেই বাগানের দিকে নেমে গেল। তার খানিক পরেই তাড়াতাড়ি ব্যস্ত ভাবে ফিরে এসে বললে, 'ওগো, টুনু তো বাগানের ভিতরে নেই!'

অসিত বললে, 'বাগানের ভিতরে নেই! সে কী?—টুনু! টুনু! ও টুনু!'

ডাকাডাকির পরেও টুনুর কোনওই সাড়া পাওয়া গেল না। অসিত তখন উদ্বিগ্ন মুখে বাগানের বাইরে চলে গেল দ্রুতপদে।

সুরমা সেইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই শুনতে পেলে, অসিত খুব চেঁচিয়ে, 'টুনু, টুনু' বলে বারবার ডাকাডাকি করছে। স্বামীর কণ্ঠস্বর ক্রমেই দূরে, আরও দূরে চলে গেল, তারপর ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে আর তা শোনা গেল না।

সুরমার মায়ের প্রাণ ভয়ে তখন সারা হয়ে উঠেছে। সে তো জানে, বাগানের বাইরে এই বনের ভিতরেই আছে কত রকম বিপদ-আপদ। কাঠের পুতুলের মতন আড়ষ্ট হয়ে সে দাঁড়িয়ে রইল।

একঘণ্টা কেটে গেল, তখনও অসিত বা টুনুর দেখা নেই। নিশ্চয়ই এখনও টুনুকে পাওয়া যায়নি, নইলে এতক্ষণে তার স্বামী নিশ্চয়ই ফিরে আসত। নানারকম অমঙ্গলের দুঃস্বপ্ন দেখতে দেখতে কেটে গেল আরও অনেকক্ষণ। সুরমার দু-চোখ দিয়েই ঝরছে তখন অশ্রুজল।

আরও কতক্ষণ পরে অসিত ফিরে এল মাতালের মতো টলতে টলতে। স্বামীর ভাবভঙ্গি দেখেই সুরমার বুঝতে বিলম্ব হল না যে খুঁজে পাওয়া যায়নি তার বুকের নিধিকে। অসিত বারান্দায় উঠে ধুপ করে একখানা চেয়ারের উপরে বসে পড়ল, কিন্তু কোনও কথাই কইতে পারলে না।

আশার বিরুদ্ধেও আশা করে সুরমা থেমে থেমে প্রায় অবরুদ্ধ স্বরে জিজ্ঞাসা করলে, 'টুনুকে খুঁজে পেলে না?'

'না। সে বনের ভিতরে হারিয়ে গিয়েছে।'

তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করে সুরমা অজ্ঞান হয়ে মাটির উপরে লুটিয়ে পড়ল।

॥ দ্বিতীয় ॥

বৎসহারা

সেটি হচ্ছে একটি প্রকাণ্ড সরোবর। মানুষের হাতে কাটা নয়, স্বাভাবিক সরোবর। গ্রীষ্মকালে জল হয় অগভীর, কিন্তু বর্ষাকালে জল ওঠে তার কূল ছাপিয়ে।

জায়গাটি মনোরম। অনেক দূরে উত্তর দিকে আকাশের গায়ে আঁকা নীল মেঘের মতো দেখা যাচ্ছে একটি পাহাড়। সরোবরের পূর্ব আর পশ্চিম দিকে দাঁড়িয়ে আছে ঘনশ্যাম অরণ্যের প্রাচীর। দক্ষিণ দিকে মস্ত একটা নতোন্নত প্রান্তর করছে ধু ধু। সরোবরের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অনেকগুলো গাছ যেন সকৌতূহলে জলের উপরে ঝুঁকে পড়েছে নিজেদের চেহারা দেখবার জন্যে। সেখানে খানিকটা জায়গা জুড়ে বাতাসের দোলায় হিন্দোলিত সরোবরের জলের সঙ্গে দুলে দুলে উঠছে স্নিগ্ধ ছায়ার মিষ্ট মায়া।

রোজ দুপুরবেলা রোদের ঝাঁঝে যখন উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পৃথিবী, তখন একদল হাতি সরোবরের এই ছায়া-ঢাকা অংশটাতে জলের ভিতরে গা ডুবিয়ে আরাম উপভোগ করতে আসে। কতকাল থেকে তারা যে এই জায়গাটিতে অবগাহন-স্নান করে আসছে, সে-খবর কেউ রাখে না। কিন্তু গ্রীষ্মের যে-কোনও দুপুরে এখানে এলেই তাদের দেখা পাওয়া যায়। এবং প্রতিদিনই সেই সময় এখানকার আকাশ বাতাস ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত করে জেগে ওঠে তাদের ঘন ঘন বৃংহিতধ্বনি। সেই ধ্বনি শুনতে পেলে কেঁদো বাঘগুলো পর্যন্ত দূর থেকেই সরে পড়ে মানে মানে।

এই সরোবরে দুপুরে স্নান করতে আসে বয়ার বা বন্য মহিষরাও। কিন্তু তারা থাকে সরোবরের অন্য দিকে, হাতিদের কাছ থেকে নিরাপদ ব্যবধানে। হরিণরাও এখানে আসে অনেক দূর থেকে জল পান করবার জন্যে। আবার সাঁতার কাটবার জন্যে আসে পালে পালে বালিহাঁসরাও। পক্ষীরাজ্যের ধীবর জাতীয় মাছরাঙারাও থেকে থেকে গাছের ডাল থেকে হঠাৎ জলের উপরে ছোঁ মেরে আবার উড়ে যায় এক-একটা রঙিন বিদ্যুতের মতো। আর বকেরাও জলের ধারে চিত্রার্পিতের মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে লোক-দেখানো ও মাছ ভোলানো তপস্যা করে। জলতেষ্টা পেলে বন্য বরাহদেরও মনে পড়ে এই সরোবরটি। আরও আসে কত জাতের জানোয়ার, সকলকার নাম বলতে গেলে বেড়ে যাবে পুথি। মোট কথা, এই সরোবরের চারিদিকটা হচ্ছে যেন বনবাসী জানোয়ারদের মিলনের ক্ষেত্র। তারা কেউ কারুর সঙ্গে কথা কয় না বটে, কিন্তু তাদের বিভিন্ন কণ্ঠস্বরগুলো সারাদিনই মুখর করে তোলে এই স্থানটিকে। তাদের অনেকেরই গলার আওয়াজ শুনে ও গায়ের গন্ধ পেয়ে কেঁদো বাঘ এবং আমিষের ভক্ত অন্যান্য জীবদের রসনা রীতিমতো সরস হয়ে ওঠে। কিন্তু ও অঞ্চলে দিনের বেলায় তাদের প্রবেশ নিষেধ। কারণ তাদের দেখলেই শিং উঁচিয়ে আর শুঁড় তুলে বয়ার এবং হাতিরা অত্যন্ত অভদ্র ব্যবহার করতে উদ্যত হয়। মোষ আর হাতিদের বাচ্চাদের বাগে পেলে কেঁদো বাঘেরা ছেড়ে কথা কয় না। সেইজন্যেই বাঘেদের উপরে এদের এত রাগ।

বাঘদের আমরা হিংস্র জীব বলি, কিন্তু পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে হিংস্র জীব কে? এর একমাত্র উত্তর হচ্ছে, মানুষ। সিংহ ও ব্যাঘ্র প্রভৃতি মাংসাশী জানোয়ার জীবহত্যা করে নিজেরা বাঁচবে বলে। মাংস না খেলে তাদের চলে না। কিন্তু মানুষ বনবাসী জন্তুদের বধ করে প্রায় অকারণ পুলকেই। যেসব জন্তু তাদের কোনওই অপকার করে না এবং যেসব জন্তুর মাংসও তারা খায় না, মানুষরা বধ করে তাদেরও। কিন্তু জানোয়ারদের সবচেয়ে বড়ো শত্রু মানুষও এই সরোবরের সন্ধান পায়নি, তাই রক্ষা! মানুষরা যদি একবার খবর পেত যে এই জায়গাটি হচ্ছে বনবাসী জন্তুদের মিলন ক্ষেত্র, তাহলে দু-দিনেই এখান থেকে লুপ্ত হয়ে যেত জানোয়ারদের এই বিপুল 'জনতা'। না, এখানে মানুষের গন্ধ পায় না কেউ।

সেদিন দুপুরেও বসেছে হাতিদের জলের আসর এবং পুরোদমে চলছে তাদের জলকেলি। জলের ভিতরে কোনও কোনও হাতি প্রায় সর্বাঙ্গ ডুবিয়ে শুঁড় দিয়ে জল তুলে চারিদিকে ছিটিয়ে দিচ্ছে সকৌতুকে। কোনও কোনও হাতি জলের ভিতরে স্থির হয়ে বসে এক মনে উপভোগ করছে অবগাহন-স্নানের আরাম। কোনও কোনও হাতি সাঁতার কেটে সরোবরের মাঝখান পর্যন্ত গিয়ে আবার ফিরে আসছে গা ভাসিয়ে। কয়েকটা বাচ্চা হাতি জলে নেমে অত্যন্ত দাপাদাপি করছে। কোনও কোনও হাতি থেকে থেকে চেঁচিয়ে উঠছে অতিরিক্ত আনন্দে। আমরা বলি তাকে বৃংহিত, কিন্তু হাতিদের সভায় বোধহয় সেটা সংগীত বলেই গণ্য হয়।

কেবল একটি হাতি জলে নামেনি, চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল একটা বাঁশঝাড়ের পাশেই। হাতি না বলে তাকে হস্তিনী বলাই উচিত। বাঁশের কচি পাতা হাতিদের অত্যন্ত আদরের খাবার। কিন্তু এই হস্তিনীটির লক্ষ বাঁশের পাতার দিকেও নেই। দেখলেই মনে হয়, সে যেন অতিশয় মনমরা ও বিমর্ষ হয়ে আছে। তার ছোটো ছোটো চোখদুটিও কেমন ক্লান্তি মাখানো।

তা, হস্তিনীর বিমর্ষ হবার কারণও আছে। আজ দু-দিন হল, তার ছোটো বাচ্চাটি বনের ভিতরে হারিয়ে গিয়েছে। বাচ্চাটির বয়স দু-মাসের বেশি নয়। খুব সম্ভব সে হয়েছে কেঁদো বাঘের খোরাক। সেই বাচ্চার শোকেই হস্তিনী হয়ে আছে আচ্ছন্নের মতো। তার স্তন দুধের ভারে টনটন করছে, কিন্তু দুধ পান করবার কেউ নেই। হঠাৎ কী-একটা শব্দ শুনে সচমকে হস্তিনীর দুই কান খাড়া হয়ে উঠল।

বনের ভিতরে দূর থেকে ভেসে এল একটা ক্রন্দনধ্বনি। শিশুকণ্ঠে শোনা গেল, 'ওগো মামণি, মামণি গো!'

বছর তিনেক আগে একবার মানুষের হাতে বন্দিনী হয়েছিল এই হস্তিনী। কিন্তু বছর দুই বন্দি অবস্থায় কাটিয়ে আবার সে পেয়েছিল পালিয়ে আসবার সুযোগ। সেই দুই বৎসরেই মানুষের স্বভাবচরিত্র সম্বন্ধে সে যথেষ্ট অভিজ্ঞতাই লাভ করেছিল। ওই কান্না আর কথা শুনেই হস্তিনীর বুঝতে দেরি লাগল না যে, বনের ভিতরে এসেছে একটি মানুষের শিশু।

শিশু কণ্ঠস্বর আবার সক্রন্দনে বললে, 'ওগো মামণি, তুমি এসে আমাকে নিয়ে যাও, আমার যে বড্ড ভয় করছে! আমার যে বড্ড খিদে পেয়েছে!'

হস্তিনীর আচ্ছন্ন ভাবটা একেবারে কেটে গেল। যেদিক থেকে কান্নার আওয়াজ আসছিল, সে বেগে ছুটে গেল সেইদিকেই।

জঙ্গল ভেঙে খানিকটা এগিয়ে গিয়েই সে দেখলে, একটি ঝোপের ধারে মাটির উপরে বসে হাপুস চোখে কাঁদছে মানুষদের একটি ছোট্ট মেয়ে। বলা বাহুল্য, মেয়েটি হচ্ছে আমাদের টুনু।

জঙ্গলের ভিতর থেকে মস্ত বড়ো একটা হাতিকে বেরিয়ে আসতে দেখেই টুনুর তো চক্ষুস্থির। ভয়ে তার কান্না হয়ে গেল বন্ধ।

তারপর বিস্ফারিত চোখে টুনু দেখলে, হাতিটা পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে তারই দিকে। সে তাড়াতাড়ি পাশের ঝোপের ভিতরে গিয়ে ঢুকল।

কিন্তু হস্তিনী তাকে ছাড়লে না। ঝোপের কাছে গিয়ে আস্তে আস্তে শুঁড় বাড়িয়ে খুব আলতো ভাবে তার দেহটি জড়িয়ে ধরলে—সঙ্গে সঙ্গে টুনুর কী পরিত্রাহি চিৎকার!

হস্তিনী টুনুকে শুঁড়ে করে তুলে ধরে নিজের মাথার উপরে বসিয়ে দিলে। দারুণ আতঙ্কে টুনু প্রাণপণে চিৎকার করছিল বটে, কিন্তু তখনও সে নিজের বুদ্ধিটুকু হারিয়ে ফেলেনি। হাতির শুঁড় তাকে ছেড়ে দিতেই সে বুঝে ফেললে যে এখনই দুম করে তার মাটির উপরে পড়ে যাবার সম্ভাবনা। সে তাড়াতাড়ি দুই হাত দিয়ে হাতির দু-খানা কুলোর মতো কান চেপে ধরলে খুব জোরে। তারপরে আবার সে জুড়ে দিলে কান্না।

আমরা বোকা লোককে 'হস্তীমূর্খ' বলে ডাকি বটে, কিন্তু আমাদের এই হস্তিনীটি তার হাতি-বুদ্ধিতে বুঝে নিলে যে, মানুষের এতটুকু শিশু কখনও মা ছাড়া থাকে না। তার নিজের বাচ্চার মতো এই শিশুটিও নিশ্চয় বনের ভিতরে হারিয়ে গিয়েছে এবং এখন এত কাঁদছে তার মায়ের কাছে ফিরে যাবার জন্যেই। অবশ্য তাকে দেখে মেয়েটির ভয়ও হয়েছে। মানুষদের দেশে সে যখন থাকত, তখন বরাবরই দেখে এসেছে, বয়স্ক মানুষরাও তাকে দেখে পেত রীতিমতো ভয়।

হস্তিনীর মনে পড়ল নিজের বাচ্চার কথা। হয়তো এখনও সে বেঁচে আছে, হয়তো সে-ও এখন তারই জন্যে কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছে বনে বনে।

হস্তিনীর মায়ের প্রাণ এই মাতৃহারা মনুষ্য-শিশুটির জন্যে সমবেদনায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। কিন্তু কী করে যে তাকে সান্ত্বনা দেবে, এট কিছুতেই সে আন্দাজ করতে পারলে না।

হস্তিনী আবার ভাবলে, হয়তো এই শিশুটির খুব খিদে পেয়েছে। হয়তো খাবার পেলে সে একটু শান্ত হতে পারে।

কিন্তু বড়ো ফাঁপরে পড়ল সে। এ হচ্ছে মানুষের শিশু, তার নিজের বাচ্চার মতো এ তো আর হাতির স্তনের দুধ বা বাঁশগাছের পাতা খেতে পারবে না! আর এই গহন বনে মানুষের খোরাকই বা পাওয়া যাবে কোথায়?

কিছুদূরে কী একটা বুনো ফলের গাছ ছিল, হঠাৎ হস্তিনীর চোখ পড়ল তার দিকে। তখনই তার মনে পড়ল, মানুষের বাচ্চাদের সে ফল খেতে দেখেছে। সে তখন মাথার উপরে টুনুকে নিয়ে ধীরে ধীরে সেই ফলগাছটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর শুঁড় দিয়ে

একটি ফল ছিঁড়ে দিলে টুনুর কাছে। কিন্তু টুনু ফলের দিকে চেয়েও দেখলে না, সামনে চেঁচিয়ে কাঁদতে লাগল।

হস্তিনী বোধহয় ভাবলে, আচ্ছা মুশকিল তো বাপু! মানুষের এই বাচ্চাটা ফলও খাবে না, কান্নাও থামাবে না! এখন একে নিয়ে কী করা যায়? এর কি জলতেষ্টা পেয়েছে? দেখি একবার সরোবরের কাছে গিয়ে!

হেলতে-হেলতে দুলতে-দুলতে টুনুকে মাথায় করে হস্তিনী চলল সরোবরের দিকে।

ওদিকে সরোবরের হাতিরা হস্তিনীর মাথায় টুনুকে দেখে বিপুল বিস্ময়ে একেবারে অবাক হয়ে গেল। সাঁতার কাটা, খেলা, জল ছোড়াছুড়ি ভুলে একদিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে হাতির দল টুনুর দিকে তাকিয়ে রইল নিষ্পলক চোখে।

হস্তিনীর কোনওদিকেই ভ্রূক্ষেপ নেই, সোজা সরোবরের ধারে গিয়ে দাঁড়িয়ে আবার শুঁড় দিয়ে জড়িয়ে ধরে টুনুকে মাথার উপর থেকে নীচে নামাবার চেষ্টা করলে।

কিন্তু টুনু তখন নীচে নামবে কী! একটার উপরে আবার এতগুলো হাতি দেখে সে আরও বেশি ভয় পেয়ে গেল। হাতির কানদুটো আরও জোরে চেপে ধরে সে আরও চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল।

পাছে টুনুর কচি গায়ে লাগে, সেই ভয়ে হস্তিনী টুনুকে নিয়ে বেশি টানাটানি করতে সাহস করলে না। তার উপরে এটাও সে বুঝলে, হাতির দল দেখে টুনু আরও বেশি ভয় পেয়েছে। কাজেই টুনুকে নিয়ে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে সে সরে পড়ল।

হস্তিনী অনেকক্ষণ জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ালে কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতো। এই বিপজ্জনক বনে মানুষের বাচ্চাটিকে ছেড়ে দেওয়াও যায় না, আবার নিজের কাছে রাখাও চলে না। তার কাছে থাকলে এই মানুষের বাচ্চাটি হয়তো অনাহারেই মারা পড়বে।

আমি হাতি নই, সুতরাং হস্তিনী ঠিক কোন কথা ভাবছিল তা আন্দাজ করতে পারছি না বটে, তবে সে অনেকটা ওই রকম কিছুই যে ভাবছিল, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই। তারপর ভাবতে ভাবতে বোধহয় সে একটা উপায় আবিষ্কার করে ফেললে এবং তখনই দ্রুতপদে অগ্রসর হল অরণ্যের একদিকে।

টুনু এখনও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে বটে, কিন্তু আর চিৎকার করছে না। এতক্ষণ পরে বোধহয় তার কিছু সাহস হয়েছে। সে বুঝতে পেরেছে, এই হাতিটা তার কোনও অপকার করবে না।

বনের ভিতর দিয়ে হাতি পার হয়ে গেল মাইলের পর মাইল। বনের পর বনের ভিতর দিয়ে, প্রান্তরের উপর দিয়ে এবং পাহাড়ের গা ঘেঁষে নদীর তীরে দিয়ে সমানে এগিয়ে চলল হস্তিনী।

টুনু ভাবতে লাগল, হাতিটা তাকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছে? তার মায়ের কাছে নাকি? এই কথা মনে হতেই টুনু হল অনেকটা আশ্বস্ত। সে কান্না থামিয়ে ফেললে। কচি কচি গলায় বললে, 'লক্ষ্মী হাতি, সোনার হাতি, আমাকে মায়ের কাছে নিয়ে চলো তো ভাই! তোমাকে আমি একঠোঙা লজেঞ্চুস খেতে দেব।'

হস্তিনী টুনুর কথার মানে বুঝতে না পারুক, কিন্তু সে যে কান্না থামিয়ে তার সঙ্গে কথা বলতে চাইছে, এইটুকু বুঝেই ভারী খুশি হয়ে উঠল। তাই চলতে চলতে মাঝে মাঝে টুনুর গায়ে আদর করে শুঁড় বুলিয়ে দিতে লাগল।

বৈকালের মুখে হস্তিনী যেখানে গিয়ে দাঁড়াল, সেটি হচ্ছে কাঠুরেদের একটি ছোট্ট গ্রামের মতো। কাঠুরেরা তখনও বন থেকে ফেরেনি। কাঠুরে-বউরা নিজের নিজের ঘরকন্নার কাজ নিয়ে ব্যস্ত।

একখানি ঘরের দাওয়ায় বসে খুন্তি নেড়ে রান্না করছিল একটি কাঠুরে-বউ। নাম তার পার্বতী।

বাইরের দিকে পিছন করে খুন্তি নাড়তে নাড়তে পার্বতী হঠাৎ সচমকে দেখলে, ঠিক তার পাশেই চাল থেকে যেন মাটির উপরে খসে পড়ল ছোট্ট একটি রাঙা টুকটুকে মেয়ে। তারপরেই ফিরে বসে দেখলে, দাওয়ার নীচে দাঁড়িয়ে আছে বিরাট একটা হাতি। দেখেই সে খুন্তি ফেলে দাঁড়িয়ে উঠে হাউ-মাউ করে ঘরের ভিতরে দিলে ছুট।

টুনু মাটির উপর বসে বসে দেখলে, হাতিটা আস্তে আস্তে আবার বনের দিকে ফিরে যাচ্ছে এবং যেতে যেতে মাঝে মাঝে আবার দাঁড়িয়ে পড়ে মুখ ফিরিয়ে তাকে দেখছে। তারপরে বনের ভিতরে সে অদৃশ্য হয়ে গেল।

জানোয়ারের পিঠ ছেড়ে মানুষের ঘরে এসে টুনু কতকটা আশ্বস্ত হল বটে, কিন্তু এখনও মায়ের দেখা না পেয়ে তার ভারী মন কেমন করতে লাগল।

ইতিমধ্যে পার্বতী জানলার উপর থেকে উঁকি মেরে দেখে নিয়েছে, সে মস্ত হাতিটা আর সেখানে নেই। তখন সে আস্তে আস্তে বাইরে এসে কৌতূহলী চোখে টুনুর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ। সে এত সুন্দর মেয়ে আর কখনও দেখেনি! যেমন তুলি দিয়ে আঁকা নাক মুখ চোখ, তেমনি দুধে-আলতায় গায়ের রং। আর গড়নটিও সুডৌল। দেখলেই আদর করতে আর ভালোবাসতে সাধ হয়। হাতির মাথায় চড়ে এল যখন, তখন নিশ্চয়ই কোনও রাজা-মহারাজার মেয়ে হবে।

পার্বতী জিজ্ঞাসা করলে, 'তুমি কে, খুকুরানি?'

টুনু বললে, 'আমি টুনু।'

'তুমি কোথায় থাকো?'

'বাড়িতে।'

'তোমার বাবা বুঝি রাজা?'

'না, তিনি বাবা।'

'তোমার মা আছেন?'

'উ উ-উ-উ।'

'তোমার সঙ্গে লোকজনরা কোথায়?'

টুনু এ প্রশ্নের অর্থ বুঝতে পারলে না। সে এগিয়ে গিয়ে নিজের ছোটো ছোটো হাত দু-খানি দিয়ে পার্বতীর কাপড় ধরে টানতে টানতে বললে, 'আমাকে মায়ের কাছে নিয়ে চলো। নইলে আমি কেঁদে ফেলব!'

পার্বতী বললে, 'তোমার মা কোথায় থাকেন, খুকুমণি?'

'বাড়িতে।'

'তোমার বাড়ি কোথায়?'

'জানি না।'

'তবে আমি কেমন করে তোমাকে মায়ের কাছে নিয়ে যাব?'

টুনু বললে, 'প্রজাপতিটা ধরা দিলে না। ছাই প্রজাপতি, দুষ্টু প্রজাপতি। সে পালিয়ে গেল, আমি হারিয়ে গেলুম। ওই লক্ষ্মী হাতিটা আমাকে মাথায় করে এখানে নিয়ে এসেছে। ভারী লক্ষ্মী, আমাকে একবারও বকেনি।'

এতক্ষণে পার্বতী ব্যাপারটা মোটামুটি আন্দাজ করতে পারলে এ কোনও অভাগীর চোখের মণি, হারিয়ে গিয়েছে বনের কোথায়, একে কুড়িয়ে পেয়েছে বনের হাতি। এমন আশ্চর্য কথা পার্বতী আর কখনও শোনেনি।

টুনু ছলছলে চোখে বললে, 'আমার খিদে পেয়েছে। আমাকে খাবার দাও, নইলে আমি কাঁদব!'

সত্য, টুনু যে ক্ষুধার্ত, সেটা তার শুকনো মুখ দেখেই বেশ বোঝা যায়। কিন্তু এ কোনও বড়ো ঘরের মেয়ে, বাড়িতে কত ভালো ভালো খাবার খায়, গরিব কাঠুরে-বাড়ির খাবারে তার রুচি হবে কি? এই ভাবতে ভাবতে পার্বতী বললে, 'টুনু, তুমি কী কী খাবার খাও?'

উত্তরে টুনু এক নিশ্বাসে খুব লম্বা একটা খাবারের ফর্দ দাখিল করলে।

পার্বতী হেসে বললে, 'আমাদের তো ওসব খাবার নেই।'

টুনু ঠোঁট ফুলিয়ে বললে, 'তবে আমি কাঁদি?'

পার্বতী ব্যস্ত হয়ে বললে, 'না খুকু, কেঁদো না। তুমি রুটি খাবে? রুটি আর গুড়?'

টুনু তক্ষুনি উৎসাহিত হয়ে বললে, 'পাটালিগুড় তো?'

দৈবক্রমে পার্বতীর ঘরে সেদিন পাটালিগুড় ছিল। সে তখনই একখানি সানকিতে দু-খানি রুটি আর পাটালিগুড় টুনুর সামনে ধরলে।

টুনু সেই কোন সকালে খেয়ে বেরিয়েছে, আর এখন প্রায় সন্ধ্যা হয় হয়। এতটুকু মেয়ে কি এতক্ষণ উপোস করে থাকতে পারে? দারুণ শোকে, ভয়ে আর দুর্ভাবনায় তার মন এতক্ষণ আচ্ছন্ন হয়ে ছিল বলেই ক্ষুধাতৃষ্ণার কথা সে ভুলে গিয়েছিল। সানকির উপর থেকে দু-খানি মাত্র রুটি আর একখণ্ড পাটালি অদৃশ্য হতে আর দেরি লাগল না। তারপর টুনু বললে, 'আরও রুটি খাব, আরও গুড় খাব।'

পার্বতী তাকে আরও দু-খানি রুটি আর একখানি পাটালি এনে দিলে।

খাওয়া-দাওয়া সেরে টুনু হাই তুলে বললে, 'আমার ঘুম পেয়েছে, আমি ঘুমোব।'

পার্বতী তাকে নিজের কোলের উপরে তুলে নিলে। দেখতে দেখতে ঘুমের ঘোরে টুনুর দুই চোখ গেল মিলিয়ে।

সন্ধ্যার সময় দুখিরাম ফিরে এল। সে হচ্ছে পার্বতীর স্বামী।

বিছানার উপরে শুয়ে টুনু ঘুমোচ্ছিল। তার দিকে চেয়ে আশ্চর্য হয়ে দুখিরাম বললে, 'এ আবার কে রে পার্বতী?'

পার্বতী হাসতে হাসতে বললে, 'আমাদের তো ছেলেপুলে নেই, ভগবান তাই দয়া করে এই মেয়েটিকে পাঠিয়ে দিয়েছে।'

দুখিরাম আরও আশ্চর্য হয়ে বললে, 'ভগবান মেয়ে পাঠিয়েছে কী রে? ও কার মেয়ে? কে ওকে এখানে নিয়ে এল?'

'ও কার মেয়ে তা জানি না, তবে ওকে এখানে নিয়ে এসেছে একটা হাতি।'

দুই চক্ষু ছানাবড়ার মতো করে দুখিরাম বললে, 'হাতি!'

'হ্যাঁ, একটা বনের হাতি।'

'বনের হাতি নিয়ে এল মানুষের মেয়ে? তা কখনও হয়?'

'তা হয় না বলেই তো বলছি, এসব ভগবানেরই লীলে।'

এইবারে একেবারে হাল ছেড়ে দিয়ে দুখিরাম ঘাড় নেড়ে বললে, 'তোর কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। তুই কি আমার সঙ্গে মস্করা করছিস?'

'মশকরা নয় গো, মশকরা নয়। তবে শোনো।' পার্বতী তখন একে একে সব কথা স্বামীর কাছে খুলে বললে।

সব শুনে দুখিরাম খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইল চিন্তিত মুখে। তারপর ধীরে ধীরে বললে, 'এ যে বড়ো ভাবনার কথা হল রে!'

পার্বতী বললে, 'কেন?'

'কেন তা বুঝতে পারছিস না? শেষটা কি মেয়ে চুরি করেছি বলে জেল খাটতে যাব? আমাদের কথা কে বিশ্বাস করবে? যদি বলি মেয়ে পেয়েছি হাতির কাছ থেকে, তাহলে জজ কি সে কথা মানবে? এ বড়ো বিপদের কথা রে পার্বতী, ভারী বিপদের কথা!'

পার্বতী বললে, 'দ্যাখো, তুমি এক কাজ করো। মেয়ে আপাতত আমাদের কাছেই থাক। তুমি বরং থানায় গিয়ে একটি খবর দিয়ে এসো। তাহলেই তোমার উপর আর কোনও ঝুক্কি পড়বে না। তারপর মেয়ের বাপ মেয়ে ফিরিয়ে নিতে আসে, ফিরিয়ে দেব। না আসে, মেয়ে আমাদের কাছেই থাকবে। মা দুগ্‌গা করুন, মেয়ের মা-বাপ যেন কোনও খবর না পায়!'

দুখিরাম বিরক্ত স্বরে বললে, 'ছি পার্বতী, অমন কথা মুখেও আনিসনি। একবার ভেবে দেখ দেখি, মেয়ের মা-বাপের কথা। তাদের বুকের ভিতরটা এখন কী করছে, তা কি বুঝতে পারছিস না? হে মা দুগ্‌গা, পার্বতীর কোনও অপরাধ নিয়ো না মা, ও না বুঝে অমন পাপ-কথা বলে ফেলেছে।'

পরের দিন ভোরবেলা ঘুম ভাঙতেই টুনু কাঁদতে কাঁদতে বায়না ধরলে, তাকে এখনই মায়ের কাছে নিয়ে যেতে হবেই হবে।

পার্বতী অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে খাবার-দাবার দিয়ে কোনওরকমে তার মুখ বন্ধ করলে। টুনু খাবার খেতে লাগল ফুলে ফুলে কাঁদতে কাঁদতেই।

ছোটো গাঁ, টুনুর কথা রাষ্ট্র হতে দেরি লাগেনি। সকালে গাঁয়ের যে যেখানে ছিল, সবাই ছুটে এল টুনুকে দেখতে।

বেশ একটি ছোটোখাটো জনতা। খোকাখুকি থেকে বুড়োবুড়ি পর্যন্ত সবাই এসে চারিদিক

থেকে টুনুকে ঘিরে দাঁড়াল। সকলে মিলে সবিস্ময়ে টুনু সম্বন্ধে যখন মতামত প্রকাশ করছে, তখন বনের ওদিক থেকে কারা যেন চেঁচিয়ে বললে, 'পালাও—পালাও—পাগলা হাতি, পাগলা হাতি!'

সবাই সভয়ে ফিরে দেখে, বনের ভিতর থেকে বিরাট দেহ নিয়ে হেলতে হেলতে ও দুলতে দুলতে বেরিয়ে আসছে কালকের সেই হস্তিনী। তৎক্ষণাৎ ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল জনতা। এমনকি, পার্বতী ও দুখিরাম পর্যন্ত ভয়ে প্রায় বেহুঁস হয়ে ঘরের ভিতরে ঢুকে খিল লাগিয়ে দিলে দরজায়।

সেখানে একলাটি দাঁড়িয়ে রইল কেবল টুনু।

ঘরের ভিতরে ঢুকে পার্বতীর হুঁস হল। সে বলে উঠল, 'ওই যাঃ, টুনু যে বাইরে!'

দুখিরাম বললে, 'কী করব বল পার্বতী? পাগলা হাতির সামনে বেরুব কেমন করে?'

পার্বতী তাড়াতাড়ি আবার দরজার খিল খুলতে গেল, কিন্তু দুখিরাম তার হাতদুটো চেপে ধরে বললে, 'করিস কী, শেষটা কি অপঘাতে মারা পড়বি? আচ্ছা দাঁড়া, জানলা একটু ফাঁক করে দেখি, বাইরে কী ব্যাপার হচ্ছে!'

দুখিরাম জানলার কাছে গেল। একখানা পাল্লা একটু খুলে ভয়ে ভয়ে উঁকি মারলে, কিন্তু বাইরে কারুকেই দেখতে পেলে না। না টুনু, না হাতি। সে সবিস্ময়ে বললে, 'ওরে পার্বতী, সর্বনাশ হয়েছে যে, পাগলা হাতিটা টুনুকে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছে!'

পার্বতী দরজা খুলে বেগে বাইরে ছুটে গেল। কিন্তু সে-ও টুনু বা হাতি কারুকেই দেখতে পেলে না। 'টুনু, টুনু' বলে চেঁচিয়ে অনেক ডাকাডাকি করলে, কিন্তু টুনুর কোনও সাড়াই পাওয়া গেল না। সে তখন কাঁদো কাঁদো মুখে ধপ করে মাটির উপরে বসে পড়ল। দুখিরাম তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললে, 'ভগবান দিয়েছিল, ভগবানই কেড়ে নিলে। আমাদের ঘরে কি ও মেয়ে মানায়? কী আর করবি পার্বতী, দুখ্যু করে আর কোনও লাভ নেই। নে, এখন ওঠ, দুটো পান্তাভাত দে, আমাকে আবার কাজে যেতে হবে।'

পার্বতী চোখের জল মুছে একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে উঠে স্বামী-আদেশ পালন করতে গেল।

খেয়ে-দেয়ে কুড়ুল নিয়ে বেরিয়ে গেল দুখিরাম। পার্বতীও কলশি নিয়ে নদীতে জল আনতে গেল।

তারপর ঘণ্টা-দুই কেটে গেছে। পার্বতী যন্ত্রে-চলা পুতুলের মতন ঘরকন্নার কাজ করছে বটে, কিন্তু মুখ তার ম্রিয়মাণ। মনে মনে খালি সে ভাবছে, এক দিন টুনুকে পেয়ে মায়ার টানে তার জন্যে মন কাঁদছে, আর যারা টুনুর বাপ-মা, এমন মেয়ে হারিয়ে না-জানি তাদের কী হালই হয়েছে!

হঠাৎ বাইরে শোনা গেল কচি শিশুকণ্ঠের কৌতুক হাস্য। পার্বতী চমকে উঠল। এক ছুটে সে দাওয়ায় গিয়ে দাঁড়াল। দেখলে, সেই হাতিটা আবার দুলতে দুলতে তাদের ঘরের দিকেই আসছে, আর—তার মাথার উপরে দুই হাতে হাতির দুই কান চেপে ধরে সকৌতুকে হেসে হেসে উঠছে টুনু।

পার্বতী ভয়ে ভয়ে পিছিয়ে আবার ঘরের ভিতরে গিয়ে দাঁড়াল। হাতি দাওয়ার সামনে শুঁড় তুলে টুনুকে ধরে আবার মাটির উপরে নামিয়ে দিলে। তারপর ফিরে চলল বনের দিকে।

টুনু চেঁচিয়ে বললে, 'রুনু, রুনু!'

হাতি দাঁড়িয়ে পড়ে তার দিকে তাকালে। টুনু বললে, 'রুনু! কাল আবার এসো, আমাকে বেড়াতে নিয়ে যাবে।' হাতি চলে গেল।

পার্বতী তখন ছুটে এসে টুনুকে কোলে তুলে নিয়ে বললে, 'তুমি কোথায় গিয়েছিলে টুনু?'

টুনু গম্ভীর ভাবে বললে, 'বেড়াতে।'

'ওই হাতিটার নাম কি রুনু?'

'হ্যাঁ।'

'তুমি কেমন করে জানলে?'

টুনু বললে, 'বা রে, আমি আবার জানব না? আমি তো আজকেই ওর নাম রেখেছি রুনু।'

'ও! তাই নাকি? কিন্তু টুনু, অত বড়ো একটা পাগলা হাতির সঙ্গে যেতে তোমার ভয় করল না?'

'কে বললে আমার রুনু পাগলা? রুনু ভারী লক্ষ্মী। ওর সঙ্গে যেতে আমার ভয় করবে কেন? ও যে আমাকে ভালোবাসে। আমি এখন রোজ ওর সঙ্গে বেড়াতে যাব।'

পার্বতী বললে, 'ওর সঙ্গে রোজ বেড়াতে যাবে? বাপ-মার কাছে যাবে না?'

টুনু ভুরু কুঁচকে বললে, 'হ্যাট, তুমি ভারী বোকা, কিচ্ছু বোঝো না। আমি মায়ের কাছে গেলে, রুনুও তো আমার সঙ্গে সঙ্গে যাবে। আমার মা তাকে কত আদর করবেন, কত খাবার খেতে দেবেন! রুনুকে আমি সেসব কথা বলেছি।'

'সে তোমার কথা বুঝতে পারলে?'

'কেন পারবে না? তুমি আমার কথা বুঝতে পারছ, আর আমার রুনু পারবে না?'

পার্বতী হাসতে হাসতে টুনুর গালে একটি চুমু খেলে।

টুনু বললে, 'খিদে পেয়েছে, খাবার দাও!'

পার্বতী হাঁড়ির ভিতর থেকে দু-মুঠো মুড়কি বার করে টুনুকে খেতে দিয়ে বললে, 'এখন এই খাও, একটু পরে ভাত খেতে দেব।'

॥ তৃতীয় ॥

রুনু আর টুনু

টুনুর দেখাদেখি হস্তিনীকে আমরাও এবার থেকে রুনু বলেই ডাকব। অমন মস্ত জীবের এমন ছোট্ট নাম যদিও মানায় না, তবু কী আর করি বলো, ওকে অন্য নামে ডাকলে হয়তো খুব রাগ করবে টুনু।

তারপর থেকে দিনে অন্তত একবার করেও টুনুকে না দেখলে রুনুর চলত না। টুনুকে পেয়ে সে বোধহয় নিজের হারিয়ে-যাওয়া বাচ্চার দুঃখ কতকটা ভুলতে পারলে।

টুনু এখন হাতির মাথায় চড়তে খুব ওস্তাদ হয়ে পড়েছে। রুনু যখন শুঁড় দিয়ে তাকে টেনে তোলে, তার মনে ভয় হয় না একটুও। ঘোড়সওয়ার লাগাম ধরে ঘোড়াকে যেমন চালনা করে, টুনুও যেন তেমনি ভাবেই হাতির কান ধরে তাকে এদিকে-ওদিকে চালিয়ে নিয়ে বেড়াত। রুনু যেদিকে যাচ্ছে টুনুর সেদিকে যাবার ইচ্ছে না হলে সে দুই কানে জোরে টান মেরে চেঁচিয়ে উঠত, 'এই দুষ্টু রুনু, কে তোমাকে ওদিকে যেতে বলেছে? এইদিকে চলো।' রুনুও অমনি পরম শান্ত ভাবেই অন্য দিকে ফিরে টুনুর মন রাখবার চেষ্টা করত।

যাঁরা হাতি পুষেছেন তাঁরাই জানেন, হাতিদের মতো বুদ্ধিমান জীব জানোয়ারদের ভিতরে খুব কম আছে। এমনকি, মানুষের অনেক কথাই তারা বেশ বুঝতে পারে। যাঁরা কুকুর ভালোবাসেন, তাঁরা জানেন যে মানুষের ভাষা কুকুরের পক্ষে খুব দুর্বোধ নয়। মানুষের ছোটো ছোটো অনেক কথার মানে তারা অনায়াসেই বুঝতে পারে। হাতি আবার কুকুরের চেয়েও বুদ্ধিমান জীব। আগেই বলেছি, রুনু কিছুকাল মনুষ্যসমাজে বন্দি জীবন যাপন করেছিল। সেই সময়েই মানুষের ভাষা ও আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে হয়েছিল তার অল্প-স্বল্প অভিজ্ঞতা।

বনের স্থানে স্থানে নানা ফলের গাছে ফলে থাকত রকমারি ফল। টুনু যখন কোনও পছন্দসই ফল খাবার আবদার ধরত রুনুর তা বুঝতে বিলম্ব হত না একটুও। সে তখনই শুঁড় দিয়ে ফল পেড়ে এগিয়ে দিত টুনুর কাছে।

একদিন একটা বেলগাছের তলা দিয়ে যেতে যেতে টুনুর বেল খাবার সাধ হল। কিন্তু রুনু জানত, বেলের উপরে থাকে শক্ত আবরণ, বেল পেড়ে দিলেই টুনু খেতে পারবে না। তাই সে বেলটা পেড়ে শুঁড় দিয়েই মাটির উপরে আছাড় মেরে আগে ভেঙে ফেললে, তারপর তুলে দিলে টুনুর হাতে।

কেবল ফল নয়, টুনুর জন্যে তাকে রোজ নিয়মিত ভাবেই ফুল পর্যন্ত সংগ্রহ করতে হত। এইসব ফরমাস যে সে খুব খুশি মনেই খাটত, তার শান্ত ও উজ্জ্বল চোখদুটো দেখলেই সেটা অনায়াসে উপলব্ধি করা যেত। সবাই জানে, জানোয়ারেরা হাসতে পারে না। কিন্তু জানোয়ারেরা যে খুশি হলে মনে মনে হাসে না, জোর করে বলা যায় না এমন কথাও। হয়তো তারা হাসে অন্য রকম উপায়ে। ওই যে খুশি হলে কুকুরেরা ল্যাজ নাড়ে, হয়তো ওইটেই তাদের হাসবার ধরন। হাতিদের হাসবার ধরনটা কী রকম, আমরা তা জানি না।

কিন্তু টুনুর নানান রকম ছেলেমানুষি দেখে রুনু যে খুব হাসত, এটুকু আমরা অনুমান করে নিতে পারি।

রুনুর সঙ্গে বেড়াতে যেতে টুনুর ভারী ভালো লাগত। ভালো লাগবারই কথা। এখানকার দৃশ্য যে চমৎকার! পাহাড়, উপত্যকা, ঝরনা, নদী, সরোবর, তেপান্তরের মাঠ ও ফুল-ফোটা সবুজ বন—এখানে কিছুরই অভাব নেই।

একদিন পাহাড়ের কাছ দিয়ে যেতে যেতে টুনুর শখ হল, সে পাহাড়ে চড়বে। বললে, 'রুনু, আমি পাহাড়ের উপরে উঠব।'

প্রথমটা রুনু তার কথা বুঝতে পারলে না; যেমন চলছিল, মাঠ দিয়ে তেমনি ভাবেই চলতে লাগল।

টুনু তখন রাগ করে তার ছোট্ট ডান হাতখানি দিয়ে রুনুর মাথায় একটি চড় মেরে বললে, 'তুমি হচ্ছ ভারী হাঁদারাম! বুঝতে পারছ না, আমি ওই পাহাড়টার উপরে উঠব?' বলেই সে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে আঙুল দিয়ে পাহাড়টাকে দেখিয়ে দিলে।

তখন রুনু তার মনের ভাবটা ধরতে পারলে। কিন্তু বুঝেও সে এমন ভাব দেখালে যেন কিছুই বুঝতে পারেনি। কারণ সে জানে, টুনুকে নিয়ে ওই পাহাড়ে ওঠা নিরাপদ নয়। অতএব টুনুর রাগ আর অভিমানের কোনওই ফল হল না, রুনু নিজের মনেই চলতে লাগল মাঠের উপর দিয়ে।

টুনুকে নিয়ে রুনু একদিন হাজির হল আবার সেই সরোবরের ধারে। সেদিনও সরোবরের হাতিরা প্রথমটা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল, তারপর কয়েকটি হাতি ডাঙার উপরে উঠে আসল,—রহস্যটা কী, বোধহয় সেই তদারকই করতে এল।

তাদের দেখে আজ কিন্তু টুনুর একটুও ভয় হল না। বোধহয় তার ধারণা হয়েছে, সব হাতিই রুনুর মতই শান্ত।

দু-তিনটে ফচকে বাচ্চা-হাতি ছুটে এসে রুনুর চারিদিক বেড়ে দৌড়োদৌড়ি করতে লাগল। তাদের ভাব দেখলে মনে হয়, তারাও যেন টুনুর সঙ্গে খেলা করতে চায়।

টুনুও সকৌতুকে বলে উঠল, 'ও রুনু, আমাকে একটু নামিয়ে দাও না!'

রুনু কিন্তু তার কথা শুনলে না। উলটে এমন চিৎকার করে উঠল যে, বাচ্চা হাতিগুলো ভয় পেয়ে আবার নিজের নিজের মায়ের গা ঘেঁষে গিয়ে দাঁড়াল। বোধহয় সে তাদের ধমক দিলে।

বড়ো বড়ো যে হাতিগুলো তাদের কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল তারাও বুঝতে পারলে, রুনুর ইচ্ছে নয় আর কেউ তাদের কাছে যায়। তখন তারাও ফিরে গিয়ে আস্তে আস্তে আবার জলের ভিতরে নামতে লাগল।

কাঠুরেদের গ্রামে এখন আর সকলেও রুনুকে দেখে একটুও ভয় পায় না; সে যেন তাদেরও পোষ-মানা জীব হয়ে পড়েছে। রোজই কেউ না কেউ তাকে এটা-ওটা-সেটা খেতে দেয়। বিশেষ করে পার্বতী। রুনুর জন্যে প্রতিদিনই রেখে দিত কিছু না কিছু খাবার। টুনুর হুকুমে রুনুও প্রায়ই তাদের সংসারের জন্যে নানান রকম ফলমূল সংগ্রহ করে আনত।

আর রুনুর দেখা পেলে গাঁয়ের শিশুমহলে উঠত আনন্দের কলকোলাহল। তারাও সবাই কাছে ছুটে এসে আনন্দে খুব লাফালাফি আর চ্যাঁচামেচি শুরু করে দিত। এবং টুনুর মন রাখবার জন্যে তাদের অনেককে মাথায় নিয়ে রুনুকে খানিকটা ঘোরাঘুরি করে আসতে হত।

এইভাবে কেটে যাচ্ছে দিনের পর দিন। পার্বতীর মনে সর্বদাই দুশ্চিন্তা, কখন টুনুর বাপ-মা খবর পেয়ে এসে তাদের কাছ থেকে তাকে কেড়ে নিয়ে যায়। টুনুকে দেখতে পাবে না, এ কথা মনে হতেও পার্বতীর বুকটা ধড়াস করে ওঠে। সে যেন একেবারে তাদেরই মেয়ে হয়ে পড়েছে।

কিন্তু পার্বতীর সৌভাগ্যক্রমে টুনুর বাপ-মায়ের কোনও খোঁজই পাওয়া গেল না।

॥ চতুর্থ ॥

হস্তী-কাহিনি

দিনর পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর। পার্বতীর সকল দুশ্চিন্তা অমূলক, কারণ টুনুর বাপ-মা কেউ এল না তাকে নিজের মেয়ে বলে দাবি করতে। তাদের ঘরেই টুনু বেড়ে উঠতে লাগল দিনে দিনে। সে-ও দেখতে লাগল দুখিরাম ও পার্বতীকে বাপ-মায়ের মতোই। নিজের বাপ-মায়ের কথাও মাঝে মাঝে তার স্মরণ হয়, কিন্তু সে যেন অনেকদিন আগে দেখা স্বপ্নের মতো।

রুনুরও নিয়মিত আনাগোনা বন্ধ হল না।

রুনু আর টুনু, দুখিরাম আর পার্বতী, নিজেদের সুখ-দুখ নিয়ে বাস করতে থাকুক এই বনগ্রামে, ইতিমধ্যে আমি তোমাদের কাছে হাতিদের কয়েকটি গল্প বলে নিই। কিন্তু মনে রেখো, এগুলি বানানো গল্প নয়, এর প্রত্যেকটি হচ্ছে একেবারে সত্য কাহিনি। এগুলি শুনলে হাতিদের সূক্ষ্ম বুদ্ধি সম্বন্ধে তোমরা একটা ধারণা করতে পারবে।

সিংহকে সবাই আমরা পশুরাজ বলে ডাকি বটে, কিন্তু সত্য কথা বলতে কী, ওই উপাধিটি হাতিরই প্রাপ্য হওয়া উচিত। বনের আর সব পশুর চেয়ে হাতিরা আকারে ঢের বেশি বড়ো বলেই আমি এ কথা বলছি না; তার চাল-চলন সবই রাজকীয়। এবং এইজন্যেই বোধহয় স্মরণাতীত কাল থেকে ভারতীয় রাজা-রাজড়ারা হাতির সঙ্গে সম্পর্ক অবিচ্ছিন্ন রেখে এসেছেন। হাতি কেবল হিন্দুদের স্বর্গেই দেবরাজ ইন্দ্রের বাহন হয়নি, মর্তেও আজ পর্যন্ত প্রত্যেক রাজাই হাতিকে রাজৈশ্বর্যের একটি প্রধান সম্পদ বলেই মনে করেন। হাতি বুদ্ধিমান জীব বলেই গণেশ-ঠাকুরের মুখের আকার হয়েছে হাতির মতো। হাতিরা মানুষের ভাষা (অর্থাৎ মানুষ তাদের জন্যে যে-ভাষা সৃষ্টি করেছে) বেশ বুঝতে পারে। অবশ্য সেই ভাষার শব্দসংখ্যা বেশি নয়—আঠারো-উনিশটি মাত্র।

ভারতে, ব্রহ্মদেশে ও সিংহলে বড়ো বড়ো কাঠের গুঁড়ি তোলবার জন্যে হাতিদের

নিযুক্ত করা হয়। সে-সব জায়গায় হাতিদের কার্যকলাপ লক্ষ করলেই বোঝা যায় তাদের বুদ্ধি অতিশয় তীক্ষ্ণ। মাহুত না থাকলেও খুব ভারী ভারী কাঠের গুঁড়ি তোলবার সময় তারা নিজেদের স্বাধীন বুদ্ধির যথেষ্ট পরিচয় দিতে পারে। কোনও গাছের গুঁড়ি যদি খুব বেশি ভারী হয়, তাহলে একসঙ্গে তিন-চারটে হাতি মিলে সেই গুঁড়ি তুলে বহন করে যথাস্থানে গিয়ে রেখে আসে।

গভীর অরণ্যে দেখা গিয়েছে, দরকার হলে অশিক্ষিত বন্য হস্তীরাও এই রকম মিলে মিশে কাজ করতে পারে। হয়তো একটা গাছের কচি ডালপালা দেখে তাদের লোভ হল। কিন্তু সে-গাছটা এত বড়ো আর উঁচু যে, তাকে উপরে ফেলা একটা হাতির কর্ম নয়। তখন সেই গাছ উৎপাটন করবার জন্যে একসঙ্গে কাজ করে কয়েকটা হাতি। তাদের কেউ কেউ শুঁড় দিয়ে গুঁড়ির ডাল জড়িয়ে ধরে টানাটানি করতে থাকে এবং কেউ কেউ বড়ো বড়ো দাঁত দিয়ে মাটি খুঁড়ে গাছের মূলদেশে আঘাত করতে থাকে।

দক্ষিণ ভারতের মাদুরার বিখ্যাত মন্দির দেখবার জন্যে গিয়েছিলেন এক সাহেব। সেখানে মন্দিরের নিজস্ব কতকগুলি হাতি আছে, তাদের শেখানো হয়েছে ভিক্ষা করতে। সাহেবকে দেখেই তারা একসঙ্গে হাঁটু গেড়ে মাটির উপরে বসে পড়ে শুঁড় তুলে সেলাম করলে।

সাহেব কারণ বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে গেলেন।

মাহুত কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল। সে বললে, 'হুজুর, হাতিরা আপনাকে সেলাম করছে। ওরা কিছু বকশিশ চায়।'

সাহেব হাসতে হাসতে হাতিদের সামনে একটা দু-আনি ফেলে দিলেন।

কী! এতগুলো হাতির জন্যে এই তুচ্ছ একটা দু-আনি? হাতিরা গেল খেপে। তারা তখনই সাহেবের মাথার উপরে শুণ্ড আস্ফালন করতে করতে একসঙ্গে চিৎকার করতে লাগল।

বিপদ দেখে সাহেব তাড়াতাড়ি সেখানে আরও কয়েকটা দু-আনি ছড়িয়ে দিয়ে তবেই মুক্তিলাভ করেন।

রেঙ্গুনে খুব প্রকাণ্ড একটি কাঠের গোলায় আর একটি হাতির অদ্ভুত তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। সেখানেও একটি মাহুতের অধীনে হাতিরা বড়ো বড়ো গাছের গুঁড়ি গোলার ভিতরে এনে রাখছিল। সব গুঁড়ি তোলা হয়ে গিয়েছে, বাকি আছে কেবল একটি। একটি হাতি সেই গুঁড়িটা তোলবার জন্যে এগিয়ে গেল। ঠিক সেই সময় ঘণ্টা বেজে উঠল, এটা হচ্ছে ছুটির ঘণ্টা। এই ঘণ্টাধ্বনি হবার পরেই গোলার কাজ শেষ হয়ে যায়। মাহুত শেষ যে গাছের গুঁড়িটা পড়ে ছিল, সেটা তাড়াতাড়ি তুলে আনবার জন্যে হাতিকে ইঙ্গিত করলে। কিন্তু হাতির ভাব দেখে মনে হল, গুঁড়িটা অত্যন্ত ভারী বলে সে অনেক চেষ্টা করেও সেটা তুলতে পারছে না। মাহুত তখন বাধ্য হয়ে তাকে নিয়ে গোলার বাইরে চলে গেল।

পরদিন যথাসময়ে আবার গোলার কাজ আরম্ভ হল। মাহুত সেই হাতিটাকে ভিতরে

নিয়ে এসে আবার কালকের ফেলে যাওয়া গুঁড়িটা তুলে নিয়ে যেতে বললে। হাতি এগিয়ে গিয়ে খুব সহজেই দুই দন্তের সাহায্যে গাছের গুড়িটা মাটি থেকে তুলে অনায়াসেই যথাস্থানে গিয়ে রেখে এল।

এখন ব্যাপার হচ্ছে এই। হাতি কালকে ইচ্ছা করেই গুঁড়িটা তোলেনি, কারণ তখন বেজে গিয়েছে ছুটির ঘণ্টা। তবু সে যে বার বার গুঁড়িটা তোলবার চেষ্টা করেও অক্ষম হয়েছিল, আসলে তা হচ্ছে লোক দেখানো অভিনয় মাত্র।

চার্লস মেয়ার সাহেব একটি হাতির গল্প বলেছেন

মালয় দেশে সাহেবের একটি পশুশালা ছিল। সেই পশুশালার একটা হাতি একদিন গেল খেপে। হাতিরা মাঝে মাঝে এই রকম খ্যাপামি অসুখে ভোগে। সাত-আট দিন বাদে আবার তাদের মাথা ঠান্ডা হয়।

মেয়ার সাহেব তাকে শায়েস্তা করবার জন্যে তখনই একটা লম্বা হুক নিয়ে তার কাছে ছুটে গেলেন। তারপর হুক দিয়ে বার বার তার পেটের এক জায়গায় মারতে লাগলেন খোঁচা। বেগতিক দেখে হাতিটা তার ক্ষতস্থানটা ঢেকে ফেলবার জন্যে তাড়াতাড়ি মাটির উপরে পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল। সে আর কোনও গোলমাল করলে না। তারই কিছুদিন পরে অস্ট্রেলিয়ার এক পশুশালার অধ্যক্ষ সেই হাতিটাকে কিনে নিয়ে গেলেন।

কয়েক বৎসর পরে মেয়ার সাহেবও অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে হাজির হন। তাঁর সেই হাতিটা সিডনি শহরের পশুশালায় আছে শুনে একদিন কৌতূহলী হয়ে তিনি তাকে দেখতে গেলেন।

হাতির ভাবভঙ্গি দেখে মনে হল না সে তাঁকে চিনতে পেরেছে। কিন্তু তার পেটের উপরে সেই পুরাতন ক্ষতের শুষ্ক চিহ্নটা তখনও বর্তমান ছিল। মেয়ার সাহেব আস্তে আস্তে সেই চিহ্নটার উপরে হাত দিলেন। হাতিটা অমনি একটা গম্ভীর শব্দ করে সেই জায়গাটা তাড়াতাড়ি ঢেকে ফেলবার জন্যে ধপাস করে মাটির উপরে শুয়ে পড়ল। সাহেবকে সে চিনতে পেরেছিল। তিনি তার পেটে হাত দিতেই তার ভয় হয়েছিল, আবার বুঝি সেখানে হুকের নতুন খোঁচা খেতে হয়।

মেয়ার সাহেব তারপর তাকে মিষ্টি খাইয়ে গায়ে হাত বুলিয়ে অনেক আদর করলেন। তখন সে আশ্বস্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল।

সার্কাসে হাতিরা কতরকম মজার খেলা দেখায়, সেটা তোমরা সকলেই জানো। কিন্তু বিলাতে হাতির দ্বারা গৃহস্থালির অনেক কাজও করিয়ে নেওয়া হয়। একটা হাতি শুঁড় দিয়ে ঝাঁটা ধরে বাড়ির নানান জায়গা প্রতিদিন সাফ করে দিত। আফ্রিকার এক জায়গায় একরকম বামন হাতি পাওয়া যায়। সেখানে কেউ কেউ ঘোড়ার বদলে ঘোড়ার গাড়িতে বামন হাতিদের ব্যবহার করে থাকে।

লন্ডনের পশুশালার একটা হাতির গল্প শোনো।

একদিন সে নিজের রেলিং-ঘেরা জায়গাটির ভিতরে দাঁড়িয়ে আছে, এমন সময় এল দুইজন সৈনিক। পশুশালার অনেক দর্শক জীবদের খাবার খেতে দেয়, এই সৈনিকদুটিরও হাতে ছিল খাবার। তারা রেলিঙের ভিতর দিয়ে হাত গলিয়ে খাবার ধরলে হাতির সামনে।

কিন্তু হাতি যেই মুখ বাড়িয়ে খাবার খেতে গেল, অমনি তারা চট করে হাত সরিয়ে নিলে। এই ব্যাপার চলল কয়েক মিনিট ধরে।

হাতি তখন বুঝলে, তাকে বোকা বানাবার চেষ্টা হচ্ছে। সে তখন সৈনিকদের দিকে পিছন ফিরে চলে গেল, যেখানে তার পানীয় জল থাকে সেইখানে। তারপর শুঁড় দিয়ে অনেকটা জল শোষণ করে আবার সে ফিরে রেলিঙের কাছে এসে দাঁড়াল। সৈনিকরা তখনও অপেক্ষা করছিল, হাতি কাছে আসতেই আবার তাকে খাবারের লোভ দেখালে। হঠাৎ হাতির শুঁড়টা উঠল উপর দিকে, এবং পরমুহূর্তেই শুঁড়ের ভিতর থেকে হুড় হুড় করে জল বেরিয়ে এসে সৈনিকদের মাথা থেকে পা পর্যন্ত একেবারে ভিজিয়ে দিলে।

সেখানে আরও যেসব দর্শক দাঁড়িয়ে ছিল, তারা সকলেই বিদ্রুপের হাসি হেসে উঠল এবং সৈনিকরাও চম্পট দিতে দেরি করলে না। সেই সময় হাতিটার ভাব দেখে বেশ বোঝা যাচ্ছিল, প্রতিশোধ নিয়ে সে হয়েছে বেজায় খুশি।

বেঙ্গল নাগপুর রেলপথ দিয়ে আমি একবার দাঁতন স্টেশনে নেমে আমার এক ধনী বন্ধুর অতিথি হয়েছিলুম। তারও একটি হাতি ছিল, সে পুকুরের জলে নেমে অনেকক্ষণ ধরে গা-ভাসিয়ে থাকতে ভালোবাসত। সে-সময়টায় সে কারুরই তোয়াক্কা রাখতে চাইত না, এমনকি সে থোড়াই কেয়ার করত তার মাহুতকেও। সে হয়তো মাঝ-পুকুরে গিয়ে আপন মনে অবগাহন-সুখ উপভোগ করছে, এমন সময় ঘাটে দাঁড়িয়ে মাহুত করতে লাগল ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি। প্রথমটা সে কিছু বলত না, কিন্তু বারংবার ডেকে তাকে বেশি বিরক্ত করলেই সে হঠাৎ শুঁড় তুলে পিচকিরির মতো জল ছুড়ে মাহুতকেও একেবারে স্নান করিয়ে দিত। ছোটো ছোটো ছেলেরা যেমন দুষ্টুমি করে অন্য ছেলের গায়ে কুলকুচো করে জল দেয়, এও ঠিক তেমনি। হাতিটার লক্ষ্যও ছিল অব্যর্থ, মাহুত পালাবার পথ খুঁজে পেত না।

একাধিক শিকারি বন্য হস্তীদের একটি আশ্চর্য স্বভাবের কথা উল্লেখ করেছেন। শিকারির গুলিতে আহত হয়ে যদি কোনও হাতি মাটিতে পড়ে গিয়ে আর উঠতে না পারে, তখন আরও তিন-চারটে হাতি নানা দিক থেকে তার কাছে ছুটে এসে দাঁড়ায়। তারপরে সকলে মিলে তাকে টেনে দাঁড় করিয়ে দেয় এবং দু-দিক থেকে নিজেদের গা দিয়ে সেই আহত জীবটিকে এমন ভাবে চেপে দাঁড়ায় যে, সে আর অবশ হয়ে মাটির উপরে পড়ে যেতে পারে না। তারপর সেই অবস্থায় তারা তাকে ঠেলতে ঠেলতে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে নিরাপদ জায়গায় উপস্থিত হয়।

মস্ত দেহের তুলনায় হাতিদের চোখ খুব ছোটো এবং তাদের দৃষ্টিশক্তিও বেশ দুর্বল। বেশিদূর পর্যন্ত তাদের নজর চলে না। কিন্তু এই অভাবটা তারা পূরণ করে নিয়েছে আপন আপন ঘ্রাণশক্তি ও শ্রবণশক্তির দ্বারা। যেদিক দিয়ে বাতাস আসছে সেইদিকে অনেক দূরেও যদি কোনও মানুষ দাঁড়ায়, হাতিরা তার গায়ের গন্ধ পায়। পরমুহূর্তেই তারা হয় সেখান থেকে সরে পড়ে, নয় তেড়ে এসে মানুষকে করে আক্রমণ।

বনের ভিতরে জলাশয়ে রাত্রেও তারা জলপান করতে যায়। কাছাকাছি কোথাও মানুষ আছে সন্দেহ হলে হাতিরাও হয়ে ওঠে অত্যন্ত সাবধানী। হাতির দল তখন জঙ্গলের ভিতর

লুকিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে এবং তাদের অগ্রদূতের মতো এগিয়ে আসে একটা হাতি। অন্ধকারে নীরবে ঠিক ছায়ার মতো সেই হাতিটা খানিকটা এগিয়ে এসে চুপ করে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে। আস্তে আস্তে এদিকে-ওদিকে শুঁড়ের ডগা ফিরিয়ে সে পরীক্ষা করে, বাতাসে কোনও মানুষের গন্ধ পাওয়া যায় কি না। তারপর নিকটে কোথাও মানুষ নেই এটা বুঝতে পারলেই নিজের শুঁড়টাকে সে ভেঁপুতে পরিণত করে আওয়াজ করতে থাকে। সেই আওয়াজ শুনলেই দূর থেকে অন্যান্য আওয়াজ করে উত্তর দেয়। প্রথম হাতিটা আবার আওয়াজ করে, যেন জানিয়ে দেয় যে মা ভৈঃ! তখন দলের অন্যান্য হাতিরা নিশ্চিন্ত হয়ে এগিয়ে এসে জলপান করে, বা জলের ভিতরে লাফিয়ে পড়ে খেলা করতে থাকে। হাতির এই শুঁড়ের আওয়াজের আরও অনেক অর্থ আছে। দল থেকে বিচ্ছিন্ন কোনও হাতি বনের ভিতরে হারিয়ে গেলেও তারা বিশেষ এক সুরে এই শুঁড়ের ভেঁপুই বাজাতে থাকে। হারা হাতিটাও দূর থেকে সেই আহ্বান-ধ্বনি বুঝতে পেরে তেমনি করেই উত্তর দেয় এবং ঠিক নির্দিষ্ট স্থানে দলের ভিতরে ফিরে আসতে ভুল করে না।

একবার একটি হাতির বাচ্চাকে বালতি করে ইঁদারা থেকে জল তুলে আনতে শেখানো হয়েছিল। ইঁদারাটা আকারে খুব বড়ো। বাচ্চা হাতিটা শুঁড় দিয়ে বালতি ধরে ইঁদারার ধারে গিয়ে জল তুলে আনত।

একদিন একটা বড়ো হাতি তার সঙ্গেই ইঁদারার কাছে গিয়ে হাজির হয়। বড়ো হাতিটা তার জল তোলা দেখে বোধহয় ভাবলে,—বাঃ, জল তোলার এই উপায়টা তো ভারী সহজ! তারপর বাচ্চা হাতিটা যেই একটু অন্যমনস্ক হয়েছে সে অমনি তার বালতিটাকে চুরি করে ইঁদারার ভিতরে নামিয়ে দিলে।

বাচ্চা হাতিটা মনে মনে রীতিমতো খেপে গেল, কিন্তু বাইরে প্রকাশ করলে না মনের ভাব। সে করলে কী জানো? বড়ো হাতিটা যখন ইঁদারার ভিতর হুমড়ি খেয়ে জল তুলছে, সে তখন আস্তে আস্তে তার পিছনে গিয়ে দাঁড়াল এবং মারলে তাকে প্রচণ্ড একটা ধাক্কা। বড়ো হাতিটা নীচের দিকে মুখ করে ঝপাং করে গিয়ে পড়ল ইঁদারার ভিতরে।

চারিদিক থেকে হই-চই করে মানুষরা সব ছুটে এল। কিন্তু কী করবে তারা! ইঁদারার ভিতর থেকে একটা প্রকাণ্ড হাতিকে উপরে টেনে তোলা বড়ো যে সে ব্যাপার নয়। অনেক ভেবে-চিন্তে সকলে মিলে ইঁদারার ভিতরে কতগুলো গাছের গুঁড়ি ফেলে দিলে।

তখন হাতিটা করলে কী, কতকগুলো গাছের গুড়ি নিয়ে শুঁড় দিয়ে নিজের দেহের তলায় পাঠিয়ে দিয়ে তৈরি করে ফেললে একটা পাটাতন এবং আরও কতগুলো গুঁড়ি নিয়ে সাজিয়ে ফেললে নিজের চারপাশে। তারপর বেশ সহজেই সে আবার পৃথিবীর উপরে উঠে এসে দাঁড়াল।

অবশ্য এটি হচ্ছে মানুষের দ্বারা শিক্ষিত হস্তীর গল্প। কিন্তু একেবারে বুনো হাতিও বুদ্ধিতে কম যায় না। সে সম্বন্ধেও একটা গল্প শোনো।

সিংহল দ্বীপে স্যর এডওয়ার্ড টেনান্ট দলবল নিয়ে বনের ভিতরে শিকার করতে গিয়েছিলেন। সেই সময় একটা খ্যাপা হাতি তাঁর পিছনে তাড়া করে। স্যর এডওয়ার্ড এবং

তাঁর দলের অন্যান্য লোকেরা প্রাণ বাঁচাবার জন্যে তাড়াতাড়ি একটা বড়ো গাছের উপরে উঠে পড়লেন। শিকার হাত ফসকায় দেখে হাতিটা তখন গাছের গুঁড়িতে শুঁড় জড়িয়ে গোটা গাছটাকেই উপড়ে ফেলবার চেষ্টা করলে। কিন্তু মস্ত গাছ, কিছুতেই ওপড়াতে পারলে না।

সেইখানে মাটির উপরে পড়ে ছিল অনেকগুলো কাটা গাছের গুঁড়ি। হাতিটা সেইখানে গিয়ে একে একে গাছের গুঁড়িগুলোকে সেই বড়ো গাছটার তলায় এনে স্তূপাকারে সাজিয়ে ফেলল। তারপর সে গুঁড়িগুলোর উপরে উঠে পিছনের দুই পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে শুঁড়ের সাহায্যে স্যর এডওয়ার্ড ও তাঁর লোকজনকে মাটির উপরে পেড়ে ফেলবার চেষ্টা করতে লাগল। হয়তো তার চেষ্টা সফলও হত, কিন্তু গাছের উপর থেকে ক্রমাগত গুলি-বৃষ্টি হওয়াতে হাতিটা বিরক্ত হয়ে গুঁড়ির স্তূপ থেকে নেমে বনের ভিতরে চলে গেল।

শুঁড় দিয়ে হাতির মা বাচ্চাকে আদর করে, শাসন করে এবং তার জন্যে ভালোমন্দ ব্যবস্থাও করে। একবার একটা পোষা হাতির বাচ্চা কেমন করে অত্যন্ত আহত হয়। তখনই ডাক্তার ডেকে আনা হল। উনি তার ক্ষতের উপরে ব্যান্ডেজ বেঁধে নিতে গেলেন, কিন্তু বাচ্চাটি কিছুতেই রাজি হল না। এমন একটা মূল্যবান জন্তু বিনা চিকিৎসায় মারা যাবে ভেবে ডাক্তার হতাশ ভাবে তার মায়ের দিকে চেয়ে ব্যাপারটা তাকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন।

হাতির মা বুঝতে একটুও দেরি করলে না। শুঁড় দিয়ে সে তখনই বাচ্চাটিকে জড়িয়ে ফেললে এবং নিজের দুই পা দিয়ে চেপে ধরলে তাকে মাটির উপরে। ডাক্তার তখন ক্ষতস্থান পরিষ্কার করে ওষুধ দিয়ে অনায়াসেই ব্যান্ডেজ বাঁধতে পারলেন। কেবল সেই এক দিন নয়, তারপর যতদিন না তার ঘা সারল, ততদিন পর্যন্ত হাতির মা ডাক্তারকে এইভাবে সাহায্য করতে নারাজ হল না।

হাতিদের স্নেহ ও ভালোবাসা অত্যন্ত গভীর। মানুষকেও তারা প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতে পারে। ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দের কথা। বিলাতের চিড়িয়াখানায় একটা হাতি ছিল, তার নাম জিঙ্গো। সে তার রক্ষী বা মাহুতকে অত্যন্ত পছন্দ করত। তাকে বিলাত থেকে পরে আমেরিকার চিড়িয়াখানায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। বিলাত থেকে সমুদ্র পার হয়ে আমেরিকায় যেতে তখন বেশ কিছুদিন লাগত। জিঙ্গো কিন্তু আমেরিকা পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছল না। মাহুতকে দেখতে না পেয়ে, মনের দুঃখে সে পানাহার ছেড়ে দিলে। তারপর ভগ্নপ্রাণে মারা গেল সমুদ্রপথেই।

হাতি হচ্ছে বর্তমান পৃথিবীতে ডাঙার সবচেয়ে প্রকাণ্ড জীব। তোমরা ভারতের হাতি দেখেছ, কিন্তু আফ্রিকার হাতি তার চেয়েও আকারে বড়ো। আবার ওই আফ্রিকাতেই আর এক জাতের বামন হাতি আছে, মাথায় তারা ছ-ফুটের চেয়ে উঁচু হয় না।

পৃথিবীতে মানুষরা যখন একটু একটু করে সবে সভ্য হয়ে উঠছে, সবচেয়ে বড়ো হাতি পাওয়া যেত সেই সময়ে। তার নাম হচ্ছে ম্যামথ। তারা ছিল রোমশ।

॥ পঞ্চম ॥

শিকার ও শিকারি

ইতিমধ্যে কেটে গিয়েছে দশ বৎসর।

দশ বৎসর বড়ো অল্প কাল নয়। এই সময়টুকুর মধ্যে সারা পৃথিবীতে ঘটেছে অনেক বড়ো বড়ো ঘটনা। কিন্তু এই দশ বৎসরের মধ্যে বনের ভিতরে কোনওই অসাধারণ ঘটনা ঘটেনি। প্রতিবৎসরই এক ঋতুর পর এসেছে আর এক ঋতু এবং ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে বনভূমিকেও দেখতে হয়েছে নিয়মিতভাবেই এক এক রকম। কিন্তু এসব কথা গল্পে উল্লেখ করবার মতো বিষয় নয়। কাজেই, ঠিক দশ বৎসর পরেই আমরা আবার অবলম্বন করব আমাদের গল্পের সূত্র।

এই দশ বৎসরে টুনুর চেহারা যে একেবারেই বদলে গিয়েছে, এটুকু তোমরা নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারবে। সে ছিল পাঁচ বৎসরের শিশু, এখন হয়েছে পনেরো বৎসরের বালিকা। তার সর্বাঙ্গ দিয়ে রূপ যেন ফেটে পড়ছে। তাকে দেখলেই মনে হয়, বনবাসিনী রাজকন্যা।

সে বড়ো হয়েছে বন রাজ্যের অবাধ স্বাধীনতার ভিতর দিয়ে। এখানে সমাজের কোনওই বন্ধন নেই। সমাজে যে-আচরণে নিন্দা হয়, এখানে কেউ তা আমলেই আনে না। শহরে পনেরো বৎসরের মেয়ে থাকে গুরুজনদের চোখে চোখে, কিন্তু এখানে টুনু সেই শিশুর মতোই চপল আনন্দে বনে বনে ছুটে বেড়ায় চঞ্চল হরিণীর মতো, কখনও গাছ-কোমর বেঁধে বালকদের মতোই অসঙ্কোচে গাছে গিয়ে ওঠে, ফল পাড়ে, ফুল তোলে, ডাল ধরে ঝুলে দোল খায় এবং দুলতে দুলতে হঠাৎ রুনুর পিঠের উপর লাফিয়ে পড়ে উচ্ছলিত হয়ে ওঠে তরল কৌতুক-হাস্যে।

দূর থেকে দুখিরাম ও পার্বতী তার এমনি সব লীলাখেলা দেখে মুখ টিপে হাসতে থাকে, কিন্তু টুনুকে মানা করবার কথা কোনওদিন তাদের মনেও ওঠে না। বনবাসী তারা, শহরের আদপ-কায়দার কী ধার ধারে? আর টুনু তো তাদেরই মেয়ে!

টুনু যে সত্য সত্যই তাদের নিজের মেয়ে নয়, এ কথা তারাও যেন আজ ভুলে গিয়েছে। টুনুর বাপ-মা যে আর মেয়ের খোঁজ নিতে আসবে না, এ বিষয়ে আর তাদের কোনওই সন্দেহ নেই। আজকে টুনুকে তাদের সামনে নিয়ে গেলেও তারা নিশ্চয় তাকে চিনতে পারবে না। সুতরাং পার্বতী এখন টুনুকে নিজের মেয়ে বলে অনায়াসেই দাবি করতে পারে।

কিন্তু টুনু ভোলেনি। আজও অবোধ শৈশবের আনন্দ-স্বপ্ন তার মনের মধ্যে রঙিন ছবির মতো জেগে ওঠে মাঝে মাঝে। আজও কোনও কোনও দিন রাত্রে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্নে সে দেখে বাপের মুখ, মায়ের মুখ। টুনু কেমন করে ভুলবে? রক্তের টান ভোলা যায় না।

বাপ-মায়ের একটিমাত্র স্মৃতিচিহ্ন এখনও সে সযত্নে রক্ষা করে। দশ বৎসর আগে যে পোশাক পরে সে বাড়ির বাইরে এসেছিল প্রজাপতি ধরতে, আজ আর তা বর্তমান নেই

বটে, কিন্তু তার গলায় ঝুলত যে সোনার পদকখানি, এখনও সেখানিকে গলায় পরে থাকে সে সর্বদাই। পদকের উপরে লেখা একটি নাম, রেণুকা। টুনু জানে, এইটিই তার আসল নাম।

পার্বতী এক-একদিন স্বামীকে ডেকে বলে, 'হ্যাঁ গো, একটা কথা ভেবে দেখেছ কি?'

দুখিরাম উবু হয়ে মাটির উপরে বসে থেলো হুঁকোয় তামাক টানতে টানতে বলে, 'কী?'

'টুনু বড়ো হয়েছে, সে আর ছোট্টটি নেই।'

হুস করে একমুখ ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে দুখিরাম বলে, 'তুই তো ভারী আশ্চর্য কথা বললি রে পার্বতী! টুনু যে আর ছোট্টটি নেই, সেটা কি আমি চোখে দেখতে পাচ্ছি না?'

পার্বতী বলে, 'দেখতে তো পাচ্ছ, কিন্তু মেয়ের উপায় করছ কী?'

'উপায় মানে?'

'এইবারে টুনুর জন্যে একটি বর খুঁজতে হবে তো?'

দাওয়ার কোণে হুঁকোটা রেখে দুখিরাম অবহেলা-ভরে বলে, 'যা যা, বাজে বকিসনি! টুনু এখন এত বড়ো হয়নি যে এখুনি ওর বর খোঁজবার জন্যে আমাকে ছুটোছুটি করতে হবে।'

ফিক করে হেসে ফেলে পার্বতী বলে, 'হ্যাঁ গো, তোমার সঙ্গে আমার যখন বিয়ে হয়েছিল, তখন আমার বয়স ছিল কত? আমি কি টুনুরও চেয়ে ছোটো ছিলুম না?'

দুখিরাম চটে গিয়ে বলে ওঠে, 'তুই আর টুনু কি এক কথা? তুই হলি একটা জংলি কাঠুরের বেটি, আর আমার টুনু হচ্ছে হয়তো কোনও রাজার মেয়ে। তোর সঙ্গে টুনুর তুলনা! বলেই সে থুঃ করে মাটির উপরে থুথু ফেললে।

পার্বতী বলে, 'ও আমার বুদ্ধিমান কাঠুরেমশাই, তুমি কি ভাবছ টুনুকে এখন বিয়ে করতে আসবে কোনও রাজার ছেলে? সবাই তো জানে, ও হচ্ছে আমাদেরই মেয়ে।'

দুখিরাম বলে, 'রাজার ছেলে আসুক আর না আসুক, টুনুকে আমি কোনও কাঠুরে ছেলের হাতে সঁপে দিতে পারব না। ফুল দিতে হয় দেবতার পায়ে, কেউ কি তা নর্দমায় ফেলে দেয় রে? দেখ দেখি আমাদের ওই টুনুর দিকে তাকিয়ে, ও কি ঠিক ফুলের মতোই সোন্দর নয়?'

তারা দুজনেই বাইরের দিকে দৃষ্টিপাত করলে।

সবুজ ঘাসে ঢাকা, বনফুল-ফোটা খানিকটা জমি, তারই উপরে কানামাছি খেলছে টুনু আর তার সমবয়সি সাত-আটটি কাঠুরেদের মেয়ে। ওখানকার আকাশ-বাতাস থেকে থেকে ছন্দিত হয়ে উঠছে তাদের কৌতুক-হাস্যরোলে। আরও খানিক তফাতে একটি গাছতলায় চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রুনু খুশি মনে দেখছে টুনু আর তার বন্ধুদের লীলাখেলা।

স্নেহমমতায় বিগলিত প্রাণে সেইদিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে পার্বতী ধীরে ধীরে বললে, 'টুনু আমার ছোট্ট খুকিটির মতন এখনও খেলা বই আর কিচ্ছু জানে না। আহা, খেলাই করুক, যতদিন পারে খেলাই করুক!'

ওদিকে টুনুদের তখন শেষ হয়ে গিয়েছে কানামাছি খেলা। তারা সবাই মিলে গোল হয়ে হাত ধরাধরি করে শুরু করে দিয়েছে নাচ আর গান। কাঠুরেদের মেয়েগুলির রং কালো

হলেও গড়ন খুব চমৎকার। খোলা হাওয়ায়, মুক্ত আকাশের তলায়, দিনে দিনে গড়ে উঠেছে তাদের স্বাধীন জীবন। যেন বনদেবীর বরে তারা পেয়েছে অটুট স্বাস্থ্যের আশীর্বাদ। তাদের প্রত্যেকেরই খোঁপায় গোঁজা বনফুল, তাদের গলাতেও ফুলের মালা, আর দুই হাতেও ফুলের গয়না। তাদের কালো কালো গায়ে রঙিন ফুলগুলিকে দেখাচ্ছিল বড়ো সুন্দর। এবং তাদের মাঝখানে টুনুকেও দেখাচ্ছিল যেন কোনও গোলাপকুঞ্জের মূর্তিমতী ফুলকন্যার মতো।

তারপর নাচ-গান থামিয়ে টুনু বলে উঠল, 'চল ভাই, আর এখানে নয়। এইবার পাহাড়তলির সেই পুকুরে গিয়ে সাঁতার কাটি গে চল!'

বাতাসে আঁচল উড়িয়ে নাচের ভঙ্গিতে লাফাতে লাফাতে টুনু ছুটল একদিকে, এবং অন্য মেয়েরাও ছুটল তার পিছনে পিছনে। রুনুও গজেন্দ্রগমনে চলল তাদের সঙ্গে সঙ্গে।

* * *

বনের এইখান থেকে মাইল-দশেক তফাতে আছে একটি বড়ো গ্রাম। তাকে ছোটো একটি শহর বললেও বলা যায়। সেই গ্রামে বাস করে জমিদার নরেন্দ্রনারায়ণ, উপাধি তার কুমার।

নরেন্দ্রনারায়ণের পিতা ভূপেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যু হয়েছে গত বৎসরে। কুমার নরেন্দ্রনারায়ণ এখনও সাবালক হয়নি, বয়স তার বিশ বৎসরের বেশি নয়। জমিদারির তদারক করে দেওয়ান, আর নরেন্দ্রনারায়ণ বনে বনে ঘুরে বেড়ায় শিকারের সন্ধানে। এটা হচ্ছে তার একটি বাতিকের মতো।

আজকেও নরেন্দ্র শিকার করতে বেরিয়েছে, সঙ্গে আছে তার জনকয়েক বন্ধু।

আজ কিন্তু ভাগ্য তাদের প্রতি বিরূপ। সকাল থেকে তারা এ-বনে ও-বনে তল্লাশ করে বেড়াচ্ছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনও দয়ালু পশুই প্রাণ দিয়ে তাদের কৃতার্থ করতে এল না। সূর্য প্রায় মাথার উপরে, রোদের তাপ ক্রমেই বেড়ে উঠছে, এবং তাদের উৎসাহ ক্রমেই শান্ত হয়ে আসছে।

হঠাৎ নরেন্দ্র দেখলে, ডান পাশের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এল একটি হরিণ, তারপরেই চকিত দৃষ্টিতে শিকারিদের দিকে একবার তাকিয়েই আবার ঝোপের ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল যেন বিদ্যুতের মতো।

নরেন্দ্র উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠল, 'এতক্ষণ পরে শিকারের যখন দেখা পেয়েছি, তখন আর ওকে ছাড়া নয়। আমি এইদিক দিয়ে একলা ওর পিছনে ছুটি, আর তোমরা সকলেও চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে ওই জঙ্গলে ভিতরে গিয়ে ঢোক। দ্যাখো, কোনও দিক দিয়েই ও যেন পালাতে না পারে।'

নরেন্দ্র নিজের বন্দুকটা একবার পরীক্ষা করে বেগে জঙ্গলের ভিতরে ছুটে গেল। খানিক তফাতে একটা ঝোপ তখনও দুলছিল। বোঝা গেল, হরিণটা ওই দিকে গিয়েছে। নরেন্দ্র সেই ঝোপ ভেদ করে অগ্রসর হল দ্রুতপদে। এইভাবে শিকার খুঁজতে খুঁজতে সে অনেকখানি পথ এগিয়ে গেল, কিন্তু হরিণের আর কোনও সন্ধানই পাওয়া গেল না।

বনের এক জায়গায় খোলা জমির উপরে হতাশভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নরেন্দ্র ভাবছে, শিকার দেখা দিয়েও ধরা দিলে না, আজকের দিনটা বোধহয় বৃথাই গেল।

হঠাৎ দূরে একটা বন্দুকের শব্দ শুনে সে আবার চাঙ্গা হয়ে উঠল। হরিণটা নিশ্চয়ই তার সঙ্গীদের কারুর পাল্লায় গিয়ে পড়েছে! সে খুশিও হল এবং সঙ্গে সঙ্গে একটু ক্ষুণ্ণও হল এই ভেবে, আজকের শিকারের বাহাদুরিটা তাহলে গ্রহণ করবে অন্য কেউ।

সঙ্গীদের অপেক্ষায় নরেন্দ্র সেইখানেই দাঁড়িয়ে আছে, এমন সময় একটু তফাতে একটা ঝোপ দুলে দুলে উঠল। তারপরেই ঝোপের ভিতর থেকে টলতে টলতে বেরিয়ে এল একটা হরিণ। তার ভাব দেখেই বোঝা গেল, সে আহত হয়েছে এবং আর বেশি দূর অগ্রসর হতেও পারবে না।

হরিণটাকে একেবারে শেষ করে দেবার জন্যে নরেন্দ্র বন্দুকটা তুলে ধরল।

কিন্তু বন্দুকের ঘোড়া টিপতে আর হল না। আচম্বিতে কোথা থেকে একটি মেয়ে বেগে ছুটে এসে হরিণটার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং দুই হাতে তার গলা জড়িয়ে ধরে চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'খবরদার বলছি, আর এখানে বন্দুক ছুড়ো না!'

সেইভাবেই আড়ষ্ট হাতে বন্দুক ধরে নরেন্দ্র থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

তার দুই চক্ষু বিস্ফারিত। এই গভীর অরণ্যে এমন সুন্দরীর আকস্মিক আবির্ভাব একেবারেই অপ্রত্যাশিত। স্বচক্ষে দেখেও বিশ্বাস হয় না। এ কি বনদেবী, না চোখের মায়া?

আহত হরিণটা তখন টুনুর আলিঙ্গনের ভিতরে একেবারে এলিয়ে পড়েছে, পালাবার চেষ্টাটুকু করবার শক্তিটুকুও তার নেই।

মেয়েটি করুণ স্বরে বললে, 'ওরে আমার হরিণ রে, কোন নিষ্ঠুর তোকে মেরেছে? আহা হা, তোর গা দিয়ে যে রক্ত ঝরে পড়ছে!'

বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কাটা সামলে নিয়ে নরেন্দ্র পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল মেয়েটির কাছে। মেয়েটি হঠাৎ চোখ তুলে ক্রুদ্ধস্বরে বললে, 'কে তুমি? কেন আমার হরিণকে মেরেছ?'

নরেন্দ্র বিস্মিত স্বরে বললে, 'তোমার হরিণ!'

মেয়েটি বললে, 'হ্যাঁ, আমার হরিণ। এ বনে যত হরিণ আছে সব আমার। কেন তুমি এর গায়ে গুলি মেরেছ?'

নরেন্দ্র অপরাধীর মতো আস্তে আস্তে বললে, 'আমি তো একে মারিনি!'

'তবে কে একে মারলে?'

'বোধহয় আমার কোনও বন্ধু।'

পিছন থেকে কর্কশ হেঁড়ে গলায় কে বললে, 'আমি মেরেছি এই হরিণটাকে।'

দুজনেই সচমকে ফিরে দেখলে, একটা নতুন লোক সেখানে এসে দাঁড়িয়েছে। ভীষণ তার চেহারা। প্রকাণ্ড, সুদীর্ঘ ও বলিষ্ঠ দেহ, গায়ের রং কালো কুচকুচে। আদুড় গা, কোমর বেঁধে মালকোঁচা মেরে কাপড় পরা, ডান হাতে একটা বন্দুক।

এই পরমা সুন্দরী কন্যাটির মতো এখানে ওই বীভৎস ও বিভীষণ মূর্তিটার আবির্ভাবও অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত। মেয়েটি তাকে দেখে ভয় পেয়ে নরেন্দ্রের মুখের পানে তাকিয়ে বললে, 'এই কি তোমার বন্ধু?'

নরেন্দ্র মাথা নেড়ে বললে, 'না, আমার কোনও বন্ধুরই চেহারা এমন উলটো-কার্তিকের মতো নয়।'

লোকটা হুমকি দিয়ে বলে উঠল, 'মুখ সামলে কথা কও হে ছোকরা, সাক্ষাৎ যমকে ঠাট্টা করবার চেষ্টা কোরো না! জানো, আমি কে?'

নরেন্দ্র বললে, 'জানি না। জানবার ইচ্ছেও নেই।'

লোকটা শুকনো হাসি হেসে বললে, 'আমারও গায়ে পড়ে পরিচয় দেবার ইচ্ছে নেই। এখন বাজে কথা থাক। এই ছুঁড়ি, দে, হরিণটাকে ছেড়ে দে!'

হরিণটাকে আরও ভালো করে জড়িয়ে ধরে মেয়েটি বললে, 'না, একে আমি কিছুতেই ছাড়ব না।'

লোকটা বললে, 'কিছুতেই ছাড়বি না? আচ্ছা, ছাড়িস কি না দেখা যাক! আমার শিকার, আমি নিয়ে যাবই।' বলতে বলতে সে এগিয়ে এল।

মেয়েটি প্রাণপণে চিৎকার করলে, 'রুনু! রুনু! শিগগির এসো, এই যমদূতটাকে তুলে আছাড় মারো! রুনু! রুনু!'

লোকটা থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

নরেন্দ্র অবাক হয়ে ভাবতে লাগল, রুনু আবার কে? নামটি তো মেয়েলি, তার গায়ে এমন কী শক্তি আছে যে তুলে আছাড় মারবে এই যমদূতটাকে!

প্রশ্নের উত্তর পেতে বিলম্ব হল না। দেখা গেল, বন ভেঙে, মাটি কাঁপিয়ে, শুঁড় তুলে ধেয়ে আসছে প্রকাণ্ড এক ক্রুদ্ধ মাতঙ্গ।

ষণ্ডা লোকটার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে টুনু হুকুম দিলে, 'রুনু! এই লোকটা আমাকে ভয় দেখাচ্ছে! ওকে তুমি শাস্তি দাও!'

সক্রোধে গর্জন করে উঠল রুনু।

নরেন্দ্র সভয়ে নিজের হাতের বন্দুকটার দিকে তাকালে। এ হাতি-মারা বন্দুক নয়, এর গুলিতে ওই মত্ত মাতঙ্গের কিছুই হবে না। সে তখনই বুদ্ধিমানের মতো সেখান থেকে দৌড় মেরে সরে পড়ল।

ষণ্ডা লোকটাও ত্রস্তভাবে বেগে পাশের জঙ্গলের ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল এবং রুনুও ছুটল তার পিছনে পিছনে।

টুনু দুই হাতে হরিণটাকে ধরে দাঁড়িয়ে উঠল। ছোট্ট হরিণ, তাকে তুলতে তার কিছুই কষ্ট হল না। তারপর সে তার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে মৃদুস্বরে বললে, 'চল তো ভাই হরিণ, এইবারে আমরা দুজনে বাড়ি ফিরে যাই।'

॥ ষষ্ঠ ॥

বনদেবীর ঠিকানা

জমিদারবাড়িখানি বেশ বড়োসড়ো। চারিদিকে ঘেরা জমির ভিতরে সাজানো ফল-ফুলের বাগান, তারপর একটি বড়ো পুষ্করিণী, তার চারধারের চারটি ঘাট মার্বেল পাথরে বাঁধানো। সেই পুষ্করিণীর উত্তর দিকে দাঁড়িয়ে টুকটুকে লাল রঙের প্রাসাদখানি যেন কালো জলের ভিতরে নিজের ছায়া দেখবার চেষ্টা করছে। বাগানের ফটকে বন্দুকধারী দ্বারী এবং বাড়ির প্রধান দরজার পাশে একখানি টুলের উপরে বসে একটা ভোজপুরী দ্বারবান বাঁ হাতের চেটোতে ডান হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে খৈনি পিষতে পিষতে ভোরের ভজন ভাঁজছে—

'মনোয়া, ভজ লে সীতারাম!
ভজ লে সীতারাম, মনোয়া,
কাহে না জপতে নাম।'

গাড়ি-বারান্দার উপরে একখানি চেয়ারের উপরে বসে নরেন্দ্র নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে আছে পুষ্করিণীর দিকে।

পুকুরে বাতাসে দোলানো ও ছোটো ছোটো ঢেউ-খেলানো স্নিগ্ধ জলের উপরে এসে পড়েছে প্রাতঃসূর্যের সোনালি আলোর ছায়া। ওখানে পদ্মকুঞ্জের উপরে গুঞ্জন করে উড়ছে মধুকরপুঞ্জ। এখানে সন্তরণ-পুলকে মেতে উঠেছে মরাল আর মরালীরা। কোথাও বা টুপটুপ করে জলের ভিতরে ডুব দিচ্ছে ডাহুক পাখিরা।

কিন্তু পুকুরের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেও নরেন্দ্র এসব কিছুই লক্ষ করছিল না। তার দৃষ্টি চলে গিয়েছে তখন গহন বনের অন্তপুরে।

সেই অপূর্ব রূপবতী মেয়ে! কে সে? বনের আনাচে-কানাচে কয়েক ঘর বাসিন্দা আছে বটে, কিন্তু তারা তো, আমরা যাকে বলি ছোটোলোক! তাদের ঘরে অমন অদ্ভুত রূপের জন্ম হওয়া কি সম্ভব? না, কখনওই নয়। কিন্তু—

কিন্তু ও যে বনের মেয়ে, তাতেও কোনও সন্দেহ নেই। তার ভাবভঙ্গি, তার কথাবার্তা ও তার সাজ-পোশাকে কোথাও নেই নাগরিকতার ছাপ। এ এক আশ্চর্য সমস্যা!

বলে কিনা, বনে যত হরিণ আছে সব আমার! আবার ও ডাক দিলে সাহায্য করতে ছুটে আসে মত্ত মাতঙ্গ! এমন ব্যাপার কেউ কখনও দেখেছে, না এসব কথা বললে কেউ বিশ্বাস করবে? হয়তো বনের বাঘগুলো পর্যন্ত ওই মায়াবিনীর পোষ মেনেছে!

হোক মায়াবিনী, হোক কুহকিনী, কিন্তু কী সুন্দরী!

যেমন করে হোক, তার সঙ্গে পরিচয় করতেই হবে। আজকেই আবার যাব আমি বনের ভিতরে।

সংকল্প স্থির করে নরেন্দ্র চেয়ার ছেড়ে বাড়ির ভিতরে গেল এবং কিছুক্ষণ পরে পোশাক

বদলে বেরিয়ে এল আবার বাড়ির ভিতর থেকে। সেদিন আর কোনও বন্ধু-বান্ধবকে সঙ্গে নিলে না সে।

আজ নরেন্দ্র একখানি সাইকেলের আরোহী। মাইল-দশেক পথ পায়ে হেঁটে পার হতে কম সময় লাগে না। তাড়াতাড়ি কালকের ঘটনাস্থলে গিয়ে পৌঁছবার জন্যে আজ সে সাইকেলের সাহায্য গ্রহণ করেছে। অবশ্য আজও সে নিরস্ত্র নয়, তার পিঠে বাঁধা একটি বন্দুক।

ঘণ্টা দুই পরে সে বনের প্রান্তদেশে এসে পড়ল। আরও খানিকটা এগুবার পর পায়ে-চলা পথের রেখাটি হয়ে গেল লুপ্ত এবং অত্যন্ত ঘন হয়ে উঠল বনজঙ্গল। নরেন্দ্র তখন বাধ্য হয়ে নেমে পড়ে সাইকেলখানি একটা ঝোপের ভিতরে রেখে দিয়ে পদযুগলেরই সাহায্য গ্রহণ করলে।

প্রায় আধঘণ্টা খোঁজাখুঁজির পর পাওয়া গেল আবার সেই কালকের ঘটনাস্থলটি। কিন্তু আজ সেখানে জনপ্রাণী নেই। নরেন্দ্র অনেকক্ষণ ধরে এদিকে-ওদিকে ঘোরাঘুরি করলে, কিন্তু কোথায় সেই আশ্চর্য মেয়ে?

এক জায়গা দিয়ে ঘোঁতঘোঁত করতে করতে ছুটে চলে গেল একপাল বন্য বরাহ। মাঝে মাঝে দু-একটা শৃগাল জঙ্গলের ভিতর থেকে একবার দেখা দিয়ে উঁকি মেরেই আবার মিলিয়ে গেল অন্ধকারেই। শুকনো পাতার ভিতরে এক জায়গায় কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে ছিল মস্ত একটা কাল সাপ, নরেন্দ্রের পায়ের শব্দে চমকে উঠে ফণা তুলে তীব্র দুই চক্ষে জ্বলন্ত ঘৃণা বৃষ্টি করে সাঁৎ করে ঢুকে গেল কোনও অন্তরালে। এক জায়গায় গাছের উপরে মুখ খিঁচিয়ে কিচির-মিচির করে গালাগাল দিয়ে উঠল একদল বাঁদর, এখানে নরেন্দ্রের মতো চেহারা দেখতে তারা অভ্যস্ত নয়।

একটা গাছের গোড়ায় পা ছড়িয়ে বসে পড়ে নরেন্দ্র শুনতে লাগল এখানে-ওখানে বুনো কপোতদের ক্লান্ত-কাতর ঘু ঘু ঘু ঘু সুর। গাছের তলায় ঝিলমিল করছে আলো আর ছায়া। ওদিকের স্নিগ্ধ-সবুজ মাঠটির উপরে সচল ছবির মতো পট-পরিবর্তন করছে আলো আর ছায়া, ছায়া আর আলো। চারিদিকে বেশ একটি নিশ্চিন্ত শান্তির ভাব। নরেন্দ্রের দুই চোখে লাগল ঘুমের আমেজ। কিন্তু হিংস্র জন্তুদের এই স্বদেশে ঘুমিয়ে পড়বার ভরসা হল না তার। জোর করে দাঁড়িয়ে উঠে দুই হাত তুলে আলস্যি ভেঙে নরেন্দ্র নিজের মনেই বললে, নাঃ, বনদেবী দেখছি আজ আমার উপরে সদয় হবেন না! বেলাও হয়েছে, খিদেও পেয়েছে। আজকের মতো এইখানেই বনবাসের ইতি করা যাক......

তার পরদিন, আবার তার পরদিন, আবার তার পরদিন নরেন্দ্র আবার এল বনভ্রমণে। এই বন তাকে যেন একেবারে পেয়ে বসেছে। দূর থেকে কোনও এক অজানা টানে বন যেন তাকে এখানে টেনে আনে। সে আশায় এখানে আসে তা সফল হয় না, তবু কোনও এক সম্ভাবনার ইঙ্গিতে রোজ তাকে এখানে ছুটে আসতে হয়। ছুটে আসে অসীম আগ্রহে, কিন্তু ফিরে যায় নিস্তেজ দেহে, ম্রিয়মাণের মতো। কেবল সেই ঘটনাস্থলে নয়, বনের নানা জায়গায় সে ঘুরে বেড়িয়েছে।

চতুর্থ দিন বনের ভিতরে এসে নরেন্দ্র দূর থেকে দেখলে একটা হাতিকে। সে বাঁশঝাড়ের তলায় দাঁড়িয়ে শুঁড় দিয়ে কচি কচি বাঁশপাতা ছিঁড়ে ভক্ষণ করছিল। নরেন্দ্র তাকে দেখেই চিনলে। এ হচ্ছে সেই হাতি—বনদেবীর যে প্রহরী, নাম যার রুনু।

নরেন্দ্র আন্দাজ করতে পারলে, হাতির দেখা যখন পাওয়া গিয়েছে, মেয়েটিও নিশ্চয় আছে কাছাকাছি কোনও জায়গায়। কিন্তু মেয়েটি সত্যি-সত্যিই যদি এখানে আসে, তাহলে তাকে কেমন করে অভ্যর্থনা করবে তা আগে থাকতে বলা যায় না। কে জানে, আজকেও সে আবার এই হাতিটাকে তার পিছনে লেলিয়ে দেবে কি না!

হাতির কাছ থেকে নিজেকে নিরাপদ ব্যবধানে রাখবার জন্যে নরেন্দ্র একটা প্রকাণ্ড বনস্পতির উপরে আরোহণ করলে। তারপর ডালপালার আড়ালে বসে অপেক্ষা করতে লাগল।

যা ভেবেছে তাই! বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না, মেয়েটি বোধহয় কোঁচড়-ভরা ফুল নিয়ে চঞ্চল পায়ে ছুটতে ছুটতে হাতিটার কাছে দাঁড়াল। তারপর বললে, 'রুনু, আমার ফুল তোলা শেষ হয়েছে, এইবারে আমাকে বাড়িতে নিয়ে চলো।'

নরেন্দ্র অবাক হয়ে দেখলে, হাতিটা তার শুঁড় খানিকটা নীচে নামিয়ে দিলে, আর মেয়েটি সেই শুঁড় ধরে অনায়াসেই হাতির মাথার উপরে উঠে এসে বসল। তারপর হাতিও ধীরে ধীরে তাকে নিয়ে এগিয়ে চলল।

নরেন্দ্র নিজের মনেই বললে, 'হুঁ, তাহলে এই বনেই মেয়েটির বাড়ি আছে। আচ্ছা, চুপিচুপি ওদের পিছনে গিয়ে বাড়িটা দেখে আসা যাক।'

নরেন্দ্র গাছের উপর হতে আবার হল ভূমিষ্ঠ। তারপর হাতিকে অনুসরণ করলে অত্যন্ত সন্তর্পণে।

প্রায় মাইল দুই পথ অতিক্রম করে হাতি যেখানে এসে থামল, তার কাছেই রয়েছে কতকগুলো কুঁড়েঘর। হাতি আস্তে আস্তে মাটির উপরে থেবড়ি খেয়ে বসে পড়ল, এবং মেয়েটিও লাফিয়ে পড়ল তার দেহের উপর থেকে। হাতির দিকে ফিরে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে খুব নরম গলায় বললে, 'রুনু ভাই, আজ তবে আসি!' বলেই ছুটতে ছুটতে সে কুঁড়েঘরগুলোর দিকে চলে গেল। কোনও ঘরে সে ঢোকে, সেটাও দেখবার ইচ্ছা ছিল নরেন্দ্রের। কিন্তু হাতিটা আবার এই পথেই ফিরে আসছে দেখে তার সে ইচ্ছা পূর্ণ হল না। সে তাড়াতাড়ি সরে পড়ল সেখান থেকে।

সেদিনের ব্যাপার এই পর্যন্ত। কিন্তু এইটুকুতেই তার মনে মনে নেচে বেড়াতে লাগল হাসিখুশি। বনদেবীকে আবার আবিষ্কার করতে পেরেছে, এ হচ্ছে মস্ত সৌভাগ্যের কথা। নরেন্দ্র সেদিন পরিপূর্ণ প্রাণ নিয়ে বন ছেড়ে নিজের বাড়ির দিকে চলল।

তার পরদিন বনের ভিতরে নরেন্দ্রর দেখা পাওয়া গেল খুব সকাল সকাল। আজ ভোরের পাখি ডাকবার আগেই সে করেছে গৃহত্যাগ এবং যথাস্থানে গিয়ে যখন পৌঁছল তার হাতঘড়িতে বেজেছে তখন বেলা সাতটা। বনের পাখিদের কণ্ঠে তখনও স্তব্ধ হয়নি প্রভাত-সংগীত। নরেন্দ্র একটা ঝোপের ভিতরে গা-ঢাকা দিয়ে চুপ করে বসে রইল।

একটু পরেই একটি ছোটো ডালা হাতে করে সেই মেয়েটি একখানি কুঁড়েঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল।

দুখিরাম তখন বনে যাবার আগে পান্তা ভাত খেয়ে দাওয়ায় বসে হুঁকোয় দিচ্ছিল শেষ টান। টুনুকে দেখে বললে, 'কী গো টুনটুনি, এত সকালে কোথায় চলেছ?'

টুনু বললে, 'বাবা, পুণ্যিপুকুর ব্রত নিয়েছি কিনা, তাই বন থেকে গোটাকয় ফুল আর বেলপাতা তুলে আনতে যাচ্ছি।'

এ-গাছ ও-গাছ থেকে ফুল তুলতে তুলতে টুনু এগিয়ে চলল তারপর একটি বেলগাছের তলায় দাঁড়িয়ে উপর দিকে তাকিয়ে বললে, 'পাতাগুলো যে বড্ড উঁচুতে রয়েছে, কেমন করে পাড়ি? বাব্বাঃ, বেলগাছে যা কাঁটা! ও গাছে কে চড়বে! দুষ্টু রুনু তো আজ এখনও এল না, আমায় বেলপাতা পেড়ে দেবে কে!'

পাশের ঝোপের ভিতর থেকে কে বললে, 'বনদেবী, আমি যদি তোমার রুনুর হয়ে বেলপাতা পেড়ে দি, তাহলে কি তুমি রাগ করবে?'

টুনু চমকে উঠে পাশের ঝোপটার দিকে তাকালে। তারপর ধীরে ধীরে বললে, 'তুমি আবার কে? তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে তুমি এখানকার কেউ নও। ওই ঝোপে বসে কী করছ তুমি?'

'তোমার কথাই ভাবছি।' এই বলতে বলতে ঝোপের ভিতর থেকে আত্মপ্রকাশ করলে নরেন্দ্র।

টুনু সবিস্ময়ে দুই পা পিছিয়ে গেল। তারপর নীরবে অবাক হয়ে খানিকক্ষণ নরেন্দ্রের মুখের পানে তাকিয়ে রইল।

নরেন্দ্র হেসে বললে, 'আমাকে দেখে কি তোমার ভয় হচ্ছে?'

টুনু বললে, 'ভয়? ভয় আমি কারুকেই করি না। তুমি তো দেখছি সেদিনকার সেই শিকারি!'

নরেন্দ্র বললে, 'আমাকে তাহলে চিনতে পেরেছ?'

টুনু বললে, 'চিনতে পারব না কেন? কিন্তু আজও দেখছি তোমার পিঠে বাঁধা বন্দুক। এখানে আবার কী করতে এসেছ?'

'শিকার করতে নয়।'

'তবে?'

'তোমার সঙ্গে আলাপ করতে।'

টুনু খিলখিল করে হেসে উঠল। এবং হাসতে হাসতেই দুই চোখ নাচিয়ে বললে, 'ওহো, কী মজার কথা! আমার সঙ্গে আবার কেউ আলাপ করতে আসে নাকি? আমি কি খুব একটা মস্ত লোক?'

'তুমি বনদেবী।'

টুনু প্রাণপণে আরও জোরে হেসে নিলে খুব খানিকটা। তারপর বললে, 'না গো শিকারি মশাই, আমি বনদেবী-টেবি কিচ্ছু নই। আমি হচ্ছি টুনু।'

'টুনু? বাঃ, দিব্যি নামটি তো! আমিও শিকারি নই।'

'তবে তুমি কী?'

'আমার নাম নরেন।'

'তোমার নামটিও ভালো লাগল। তোমার বাড়ি কোথায়?'

'এই বনের বাইরে।'

'সেখানে তুমি কী করো?'

'খাই দাই, আর ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখি।'

'বটে? তবে তো তুমি খুব কাজের মানুষ! এত কাজ করো কী করে, কষ্ট হয় না?'

'কষ্ট হয় বই কি! বড়ো একঘেয়ে লাগে। তাই তো সে সব কাজ ছেড়ে আজকাল আমি বনের ভিতরে বেড়াতে আসি।'

টুনু মুখ গম্ভীর করে বললে, 'বেড়াতে আসো, না হরিণ মারতে আসো?'

নরেন্দ্র কাঁচুমাচু মুখে বললে, 'তুমি তো জানো টুনু, সেদিনকার সেই হরিণটাকে আমি মারিনি।'

'মারোনি, মারতে পারতে তো?'

'তা হয়তো পারতুম।'

'তোমার মতো নিষ্ঠুর লোকের সঙ্গে আমার আর কথা কইতে ইচ্ছে হচ্ছে না।' টুনু সেখান থেকে চলে যেতে উদ্যত হল।

নরেন্দ্র কাতর ভাবে তাড়াতাড়ি বললে, 'না টুনু, যেয়ো না। তুমি যখন মানা করেছ, আমি আর কখনও হরিণ মারব না।'

'হরিণ মারবে না, কিন্তু পাখিটাখি মারবে তো?'

'বেশ, তাও মারব না।'

'সত্যি বলছ?'

'সত্যি বলছি।'

'তবে তিন-সত্যি গালো!'

মনে মনে হাসতে হাসতে নরেন্দ্রকে তিন-সত্যি গালতে হল গম্ভীর মুখে।

টুনু এগিয়ে এসে অসঙ্কোচে নরেন্দ্রের একখানা হাত ধরে বললে, 'তাহলে নরেন, আজ থেকে তোমার সঙ্গে আমার ভাব হয়ে গেল।'

'তাহলে রোজ আমি এখানে আসব?'

'এসো।'

'তোমার সেই হরিণটি বেঁচে আছে?'

'অনেক কষ্টে তাকে বাঁচিয়েছি। কিন্তু এখনও সে উঠতে পারে না। ঘাসের বিছানা পেতে আমি তাকে শুইয়ে রেখেছি।'

'তোমার মা-বাবা কোথায়?'

হাত দিয়ে নিজেদের কুঁড়েঘরটা দেখিয়ে টুনু বললে, 'ওইখানে।'

'তোমার বাবা কী করেন?'

'বনে বনে কাঠ কাটেন।'

'বনে বনে কাঠ কাটেন!'

'হ্যাঁ। তিনি কাঠুরে।'

বিস্মিত ভাবে নরেন্দ্র একটুখানি চুপ করে রইল। তারপর একটি নিশ্বাস ফেলে বললে, 'টুনু, কথায় কথায় আমরা আসল কথাই ভুলে গিয়েছি। একটু দাঁড়াও, তোমার জন্যে বেলপাতা পেড়ে দিই।'

টুনু বললে, 'না নরেন, আর তোমাকে গাছে চড়তে হবে না। বেলপাতা যে পেড়ে দেবে, ওই দ্যাখো সে আসছে।'

টুনুর দৃষ্টি অনুসরণ করে নরেন ফিরে দেখলে, ধীরে ধীরে তাদের দিকেই এগিয়ে আসছে সেই প্রকাণ্ড হাতিটা।

সঙ্কুচিত ভাবে সে বললে, 'ওই হাতিটা আমাকে দেখে রেগে যাবে না তো?'

'না, না, আমার রুনু ভারী ভালো মানুষ। আমার যাকে ভালো লাগে তাকে সে কিছুই বলে না।'

রুনু তাদের কাছে এসে দাঁড়াল। নরেন্দ্র সন্দিগ্ধ ভাবে আড়ষ্ট হয়ে রইল। রুনু শুঁড়টা নরেন্দ্রের দেহের কাছে নিয়ে গিয়ে একবার আঘ্রাণ নিলে, পরীক্ষার ফল বোধহয় হল সন্তোষজনক। রুনু বুঝতে পারলে, এই নতুন মানুষটা তার টুনুরই বন্ধু।

টুনু বললে, 'নরেন, আমার পুজোর সময় হল। আজ তুমি বাড়ি যাও।'

'কিন্তু কাল আবার আসব তো?'

টুনু হাসতে হাসতে বললে, 'বলেছি তো, এসো। রুনু! আমার পুজোর বেলপাতা পেড়ে দাও।' সে বেলগাছের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করল।

॥ সপ্তম ॥

খাসা বন্দুক, লক্ষ্মী বন্দুক

তারপর থেকে বনের ভিতরে নরেন্দ্রর আগমন হতে লাগল প্রতিদিনই।

রোজ সকালে সে বেলগাছের পাশে সেই ঝোপের কাছে এসে দাঁড়িয়ে থাকত, এবং টুনুও তাকে দেখলেই এলোচুল উড়িয়ে ছুটে আসত হাসতে হাসতে।

সেইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বা নরম ঘাস-বিছানায় বসে তারা দুজনে গল্প করত। টুনু বলত বনের গল্প, আর শহরের গল্প সে শুনত নরেন্দ্রর মুখে। নরেন্দ্র টুনুর মতো বনকে ভালো করে চেনে না, আর টুনু তো জানে না শহরের কোনও কথাই। কাজেই দুজনেরই গল্প দুজনেরই খুব ভালো লাগত।

নরেন্দ্র কলকাতা শহর দেখেছে, এবং যখন সেখানকার গল্প বলত, তখন টুনুর দুই চক্ষু বিস্ফারিত হয়ে উঠত উচ্ছ্বসিত বিস্ময়ে।

নরেন্দ্র বলত, 'কলকাতা শহরটি তোমাদের এই বনের মতোই প্রকাণ্ড। এই বনে যেমন বড়ো বড়ো গাছ গুনে ওঠা যায় না, তেমনি কলকাতা শহরে এত বড়ো বড়ো বাড়ি আছে যে তার হিসাব কেউ রাখতে পারে না। তোমাদের এই কাঠুরে গ্রামটাকে কলকাতার এক একটি মাঝারি বাড়ির ভিতরে পুরে ফেলা যায়।'

টুনু বলত, 'বলো কী নরেন!'

নরেন্দ্র বলত, 'হ্যাঁ। আর সেখানে এমন সব বড়ো বড়ো বাড়িও আছে, তোমাদের এই বনের সবচেয়ে বড়ো গাছগুলোকেও তাদের তলায় পুঁতে দিলেও দেখাবে যেন ছোটো ছোটো ফুলগাছের চারা।'

টুনুর মুখে বিস্ময়ে আর কথা ফোটে না।

নরেন্দ্র বলে, 'কলকাতার এক একটা বড়ো রাস্তা তোমাদের এই বনের ছোটো ছোটো মাঠের মতো চওড়া। সেসব রাস্তা আগাগোড়া পাথর দিয়ে বাঁধানো। আর তার উপর দিয়ে রোজ চলাফেরা করে লক্ষ লক্ষ লোক।'

টুনু রুদ্ধশ্বাসে অস্ফুটস্বরে বলে, 'লক্ষ লক্ষ লোক! সে কত, নরেন? আমি হাজার পর্যন্ত গুনতে পারি।'

নরেন হেসে বলে, 'একশো হাজারে হয় এক লক্ষ। কলকাতায় চল্লিশ লক্ষ লোক আছে। কলকাতার রাস্তায় খালি লক্ষ লক্ষ লোক নয়, তার উপরে তিরের মতো ছোটাছুটি করে ট্যাক্সি, বাস, ট্রাম!'

'সে আবার কী?'

'ওগুলো হচ্ছে এক এক রকম গাড়ির নাম।'

'আমি একবার ঘোড়ার গাড়ি দেখেছি। ওগুলো কি সেই রকম দেখতে?'

'না। কলকাতায় ঘোড়ার গাড়ি আছে, মানুষে-টানা রিকশা গাড়ি আছে, আবার গোরুর গাড়িও আছে বটে, কিন্তু ট্যাক্সি বাস আর ট্রাম, মানুষ বা জন্তু টানে না। ওগুলো কলের গাড়ি, আপনিই চলে। আর এত জোরে ছোটে যে, প্রতিদিনই দলে দলে লোক তার তলায় পড়ে মারা যায়।'

টুনু শিউরে উঠে বলে, 'ওগো মা গো, আমি কোনওদিন কলকাতায় যাব না! তার চেয়ে আমার এই বনই ভালো!'

'তোমাদের এই বনেও তো মানুষখেকো জন্তু আছে!'

'তা আছে। কিন্তু তারা তো রোজ মানুষ মারে না! আমাদের এই গাঁয়ের কেউ কোনওদিন তাদের খপ্পরে পড়ে মারা যায়নি।'

তারা এমনি সব গল্প করে, আর ইতিমধ্যে রুনু তাদের কাছটিতে এসে চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শোনে। প্রথম প্রথম রুনুর খুব হিংসে হয়েছিল। সে ছাড়া টুনুর সঙ্গে আর কেউ যে এত বেশি মেলামেশা করে, এটা তার ভালো লাগেনি। তখন মাঝে মাঝে বোধহয় তার

মনে হত, লোকটার পিঠে শুঁড়ের বাড়ি এক ঘা দেব নাকি? কিন্তু তারপর সে যখন দেখলে, টুনু এই ছেলেটিকে খুব পছন্দ করে আর ভালোও বাসে, তখন তার মনের রাগ ধীরে ধীরে মুছে ফেললে, মনে মনেই।

একদিল সকালে এসে টুনু বললে, 'হ্যাঁ নরেন, তুমি তো খালি খালি শহরের গল্পই বলো। কিন্তু এই বনের ভিতরটা কোনওদিন ভালো করে দেখেছ কি?'

নরেন্দ্র বললে, 'না।'

'তাহলে চলো, আজ আমরা রুনুর সঙ্গে বনের চারদিকটা একবার ঘুরে আসি।'

নরেন্দ্র বললে, 'রুনুর সঙ্গে মানে?'

'রুনু আমাদের পিঠে করে বেড়িয়ে নিয়ে আসবে।'

নরেন্দ্র সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বললে, 'তোমার রুনু কি আমাকে তার পিঠে চড়তে দেবে?'

'কেন দেবে না? আমি বললেই দেবে।' এই বলে টুনু গেল রুনুর কাছে। তারপর বাঁ হাত দিয়ে তার শুঁড়ের উপর হাত বুলোতে বুলোতে ডান হাত দিয়ে নরেন্দ্রকে দেখিয়ে বললে, 'হ্যাঁ রুনু, আমার সঙ্গে নরেনকেও তোমার পিঠে করে বেড়িয়ে আনবে কি?'

রুনু মুখ ফিরিয়ে নরেন্দ্রের দিকে একবার তাকিয়ে দেখলে। তারপর চার পা মুড়ে মাটির উপরে বসে পড়ল। টুনু তার মাথার কাছে নিজের জায়গায় গিয়ে বসল এবং নরেন্দ্র উঠে বসল তার পিঠের উপরে। তারপর রুনু আবার উঠে দাঁড়াল এবং হেলে-দুলে বনের ভিতর দিকে অগ্রসর হল।

দুই হাতে রুনুর দুই কান চেপে ধরে টুনু বসে ছিল দিব্যি জাঁকিয়ে। নরেনেরও হাতিতে চড়ার অভ্যাস আছে, কিন্তু সে হাওদাতে বসে। হাওদা-ছাড়া হাতির এই তেলা পিঠের উপরে বসে ধরবার কোনও অবলম্বন না পেয়ে নরেন্দ্র পড়ল বড়োই অসুবিধায়। প্রতিক্ষণেই তার মনে হতে লাগল, এই বুঝি গড়গড়িয়ে গড়িয়ে হাতির পিঠের উপর থেকে হয় পপাত ধরণীতলে!

তার অসুবিধা বুঝে টুনু খিলখিল করে হেসে উঠল। বললে, 'ও নরেন, যদি আছাড় খেতে না চাও তাহলে পিছন থেকে দু-হাতে আমার দু-কাঁধ চেপে ধরো।'

চলল রুনু গজেন্দ্রগমনে। কখনও বনে বনে, কখনও মাঠে মাঠে, কখনও নদীর তীরে তীরে—চারিদিককার নিবিড় ও তরুণ শ্যামল উৎসবের মাঝখান দিয়ে। দূরে দূরে নীল পাহাড়গুলো যেন তাদের মুখের পানেই তাকিয়ে আছে অবাক বিস্ময়ে। বনের ভিতরে ঘন পাতার আড়ালে লুকিয়ে পাখিরা সব ডেকে ডেকে ওঠে—তাদের মুখে মুখে ফোটে কত রাগ রাগিনী, কত রকম সুর ও ছন্দ! পাহাড়ের বুক থেকে সূর্যকিরণে বিদ্যুৎবালিকার মতো ঝরনা নাচতে নাচতে আসে পৃথিবীর সবুজ প্রাণের উপরে আসর পাতবে বলে।

নরেন্দ্রের হৃদয় পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। এতদিন সে বনের এখানে-ওখানে আসত শিকারির হিংস্র চক্ষু নিয়ে। অরণ্যের অন্তঃপুরে এমন বিপুল সৌন্দর্যের ভাণ্ডার আছে, এটা দেখবারও অবকাশ কোনওদিনই তার হয়নি। রুনুর পিঠের উপরে টুনুর কাঁধ ধরে বসে আজ সে প্রথম উপলব্ধি করতে পারলে, প্রকৃতি কত সুন্দরী!

টুনু বললে, ‘দেখছ নরেন, তোমাদের কলকাতার রাস্তার মতো এখানে বিপদের কোনও ভয় নেই?’

এদিকে ওদিকে তৃপ্ত চোখে তাকাতে তাকাতে নরেন্দ্র অভিভূত কণ্ঠে বললে, ‘দেখছি! তোমার মতো আমারও এই বনের ভিতরেই বাসা বাঁধতে সাধ হচ্ছে।’

ঠিক তার দিন-তিনেক পরের ঘটনা।

রুনুর পিঠে চেপে সেদিনও বনের ভিতরে গিয়েছিল তারা দুজনে। সেদিন একটু বেশি দূরেই গিয়ে পড়েছিল। সেখানটা এত নির্জন যে, দুনিয়ায় পাখি ছাড়া আর কোনও জীব আছে বলে সন্দেহ হয় না।

খানিকটা তফাতে রয়েছে একটি ঝরনা তলা। নির্ঝরের স্বচ্ছ শুভ্র জল সেখানে পাথরের উপর দিয়ে লাফাতে লাফাতে মাটির উপর এসে সৃষ্টি করেছে ছোট্ট একটি নদী।

টুনু হঠাৎ বললে, ‘রুনু, আমাকে নামিয়ে দাও। আমার জলতেষ্টা পেয়েছে।’

রুনু মাটির উপরে বসে পড়ল।

নরেন্দ্র বললে, ‘আমারও তেষ্টা পেয়েছে।’

রুনুর পিঠ ছেড়ে দুজনে নীচে নেমে ঝরনা-তলায় গিয়ে অঞ্জলি ভরে জলপান করতে লাগল।

রুনু আসতে আসতেই দেখে নিয়েছিল, একটা গাছে ফলে আছে অনেকগুলো পাকা ফল। এই অবসরে সে-ও চলল ফলাহার করতে।

জলপানের পর টুনু দাঁড়িয়ে উঠে উপর দিকে মুখ তুলে সশব্দে ঘ্রাণ নিতে নিতে বললে, ‘নরেন, কী চমৎকার ফুলের গন্ধ আসছে! তুমি এইখানে বোসো, ফুলগুলো কোথায় ফুটেছে দেখে আসি।’ বলেই নরেনকে জবাব দেবার কোনও ফাঁক না দিয়েই একদিকে চলে গেল সে চুল আর আঁচল উড়িয়ে।

নরেন্দ্র জানে, বনের ভিতরে টুনুর খবরদারি করে রুনু। কাজেই সে আর কোনও মাথা না ঘামিয়ে একখানা পাথরের উপরে বসে বসে একমনে দেখতে লাগল ঝরনার নাচ। খালি নাচ নয়, শুনতে লাগল তার গানও।

খানিক পরেই সে সচমকে শুনতে পেলে বনের ভিতর থেকে টুনুর আর্তস্বর।

এক লাফে দাঁড়িয়ে উঠে সে টুনু যেদিকে গিয়েছিল সেইদিকে বেগে দৌড়তে লাগল।

টুনু সকাতরে চিৎকার করে বলছে, ‘নরেন! নরেন! রুনু, রুনু, রুনু!’

ফল-খাওয়া ফেলে রুনুও দুই কান উপর দিকে তুলে দ্রুতপদে উত্তেজিত ভাবে ছুটে এল।

পাগলের মতন বনের ভিতর থেকে দৌড়তে দৌড়তে বেরিয়ে এল টুনু, তার দুই চক্ষে বিষম আতঙ্কের ভাব! আরও কয়েক পা এগিয়েই হঠাৎ সে হোঁচট খেয়ে মাটির উপরে পড়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, তার কাছ থেকে হাত দশেক দূরে একখানা উঁচু বড়ো পাথরের

উপরে জঙ্গল ভেদ করে আবির্ভূত হল মস্ত একটা বাঘ! পাথরের উপরে এসে লাঙ্গুল আছড়াতে লাগল সশব্দে। তার পরেই নীচে টুনুর উপরে লাফ মারবার জন্যে হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

রুনু শূন্যে শুঁড় তুলে বন কাঁপানো ভীষণ গর্জন করে উঠল—কিন্তু টুনুর কাছ থেকে সে এখনও খানিকটা দূরে রয়েছে, টুনুর কাছে যাবার আগেই বাঘ লাফিয়ে পড়ে শিকার নিয়ে আবার বনের ভিতরে পালিয়ে যাবে। রুনু তার গতি আরও বাড়িয়ে দিল বটে, কিন্তু বেশ বুঝতে পারলে, আর সে তার টুনুকে বাঁচাতে পারবে না।

হঠাৎ গুড়ুম করে গর্জে উঠল নরেন্দ্রের হাতের বন্দুক এবং পরমুহূর্তেই বাঘটা ধপাস করে নীচেকার মাটির উপরে পড়ে চিত হয়ে চার পা তুলে যেন শূন্যকেই থাবা মারতে লাগল।

টুনু তাড়াতাড়ি মাটির উপর থেকে উঠে পড়ে আবার এদিকে ছুটে এল।

কিন্তু বাঘটা তখনও মরেনি। মুখের শিকার পালায় দেখে সে আবার চার পায়ে ভর দিয়ে উঠে গর্জন করে উঠল দুর্জয় আক্রোশে। আবার সে সামনের দিকে লাফ মারবার চেষ্টা করছে, কিন্তু রুনু এবারে আর তাকে কোনও সুযোগই দিলে না। সে লাফ মারবার আগেই রুনু তার কাছে গিয়ে পড়ল এবং তারপর চোখের নিমেষে নিজের অজগরের মতো মোটা শুঁড় দিয়ে বাঘের দেহকে জড়িয়ে ধরে মাটির উপরে সক্রোধে আছাড় মারতে লাগল বারংবার। যতক্ষণ না বাঘের দেহটা রক্তাক্ত মাংসপিণ্ডে পরিণত হল ততক্ষণ তাকে ছাড়লে না।

টুনু ছুটতে ছুটতে এসে নরেন্দ্রর পায়ের কাছে বসে পড়ে সভয়ে দুই চক্ষু দুই হাতে ঢেকে ফেলে কাঁদতে লাগল আকুল ভাবে। নরেন্দ্র তার পাশে বসে পড়ে সস্নেহে বললে, 'না টুনু, কেঁদো না। আর কোনও ভয় নেই, বাঘকে রুনু একেবারে মেরে ফেলেছে।'

টুনু দুটি সজল চোখ তুলে বললে, 'বাঘটাকে রুনু মেরেছে, না তুমি মেরেছ? তুমি না থাকলে আজ কি আমি বাঁচতুম?'

নরেন্দ্র বললে, 'দেখছ তো টুনু, তুমি আমাকে বন্দুক আনতে মানা করেছিলে! এই বন্দুকটা সঙ্গে না থাকলে আজ তোমার কী হত বলো দেখি?'

আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছতে মুছতে টুনু হঠাৎ ফিক করে হেসে বললে, 'খাসা বন্দুক, লক্ষ্মী বন্দুক বন্ধু! এবার থেকে রোজ বন্দুক সঙ্গে এনো! কিন্তু দেখো, যেন হরিণ আর পাখি মেরো না।'

নরেন্দ্র অবাক হয়ে ভাবতে লাগল। বনের মেয়ে টুনু, তাই এত শীঘ্র এত বড়ো বন্য বিপদটাকে ভুলে হাসতে পারলে।

ইতিমধ্যে রুনুও তাদের কাছে এসে দাঁড়াল—তার শুঁড়টা তখনও রক্তমাখা। একবার নরেন্দ্রের দিকে তাকালে, সে দৃষ্টিতে মাখানো ছিল যেন কৃতজ্ঞতার ভাব। হয়তো সে বুঝতে পেরেছে, নরেন্দ্র না থাকলে তার টুনু আজ কিছুতেই বাঁচত না।

রুনু আর সেখানে থাকতে রাজি নয়। মাটির উপরে তাড়াতাড়ি বসে পড়ে সে তাকালে

টুনুর মুখের দিকে। তার মনের ভাবটা এই, 'ওহে টুনু, এই সাঙ্ঘাতিক জায়গায় আর থাকা উচিত নয়। চটপট আমার পিঠে উঠে পড়ো!'

॥ অষ্টম ॥

বন্ধুদের মাথাব্যথা

এদিকে কাঠুরেপাড়ায় পড়ে গেছে সাড়া।

টুনুর বনের সঙ্গিনীরা খেলা করতে এসে তাকে খুঁজে না পেয়ে প্রথম দিন-কয়েক ভারী অবাক হয়ে গেল। তারা আসবার আগেই টুনু রোজ সকালে খেলা করবার জন্যে তাদের অপেক্ষায় দাওয়ায় বসে থাকত। কিন্তু এখন সেই টুনুর টিকি দেখবার জো নেই! ব্যাপার কী?

তাদের জিজ্ঞাসার উত্তরে পার্বতী বলে, 'টুনু কোথায় গেছে, জানি না তো! বোধহয় রুনুর সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছে।'

তারা বলে, 'বা রে, আমাদের সঙ্গে দেখা না করেই?'

পার্বতী বলে, 'টুনু এখন ধেড়ে মেয়ে হল, আর কতদিন তোদের সঙ্গে খেলা করবে রে? যা, পালা!'

কিন্তু টুনুর ঠিকানা আবিষ্কার করতে সঙ্গিনীদের বেশি দেরি লাগেনি। একদিন তারা দূর থেকে উঁকি মেরে দেখে নিলে, টুনু গল্প করছে একটি চমৎকার-দেখতে ছেলের সঙ্গে।

সেদিন যখন টুনু ফিরে এল, তার কাছে তার সঙ্গিনীরা ধরনা দিয়ে পড়ল। কেউ বললে, 'ও টুনু, ওই সোনার ছেলেটি কে ভাই?'

[illegible] তুই কি ওরই সঙ্গে খেলা করবি?'

কেউ বললে, 'ও কি তোর বর, টুনু, ভাই?'

শেষ কথাটা যে বললে, টুনু উঠে তার গালে বসিয়ে দিলে এক চড়।

সে গালে হাত বুলোতে বুলোতে বললে, 'মারলি কেন ভাই?'

টুনু চোখে রাগ ফুটিয়ে বললে, 'তুই নরেনকে আমার বর বললি কেন? ও তো আমার বন্ধু।'

'তোর বন্ধুর নাম বুঝি নরেন?'

'হ্যাঁ।'

'তা বন্ধু যখন হয়েছে বর হতে আর কতক্ষণ!'

টুনু আবার রেগে চড় তুললে, কিন্তু সে চড় কারুর গালে পড়বার আগেই তার সঙ্গিনীরা দৌড় মেরে খিলখিল করে হাসতে হাসতে সরে পড়ল।

কথাটা পার্বতীরও কানে উঠল। সে-ও একদিন কৌতূহলী হয়ে দূর থেকে উঁকি মেরে দেখে এল নরেনকে। মনে মনে বললে, বাঃ, কী মিষ্টি ছেলেটি!

শহরের ব্যাপার নয়, বনের ব্যাপার। টুনু শহুরে মেয়ে হলে, পরের ছেলের সঙ্গে ভাব করেছে বলে আজ তাকে মায়ের কাছ থেকে অনেক বকুনি খেতে হত। কিন্তু পার্বতী টুনুকে কিছু না বলে সন্ধ্যার সময় স্বামীর কাছে সব কথা জানালে। সঙ্গে সঙ্গে টীকা করলে, 'ওই রকম একটি ছেলের সঙ্গে যদি টুনুর বিয়ে হয়, তাহলে দেখতে-শুনতে কেমন চমৎকার হয় বলো দেখি?'

দুখিরাম খানিকক্ষণ গম্ভীর হয়ে রইল। তারপর বললে, 'ও ছেলেটির সঙ্গে টুনুর ভাব হল কেমন করে?'

পার্বতী বললে, 'সে কথা আমি জানিনে, তোমার মেয়েই জানে। তাকে জিজ্ঞেস করব নাকি?'

দুখিরাম বললে, 'না, আজ আর কিছু জিজ্ঞেস করতে হবে না। কাল সকালে আগে আমি ছেলেটিকে দেখি।'

পরদিন সকালে দুখিরামও দূর থেকে লুকিয়ে দেখে নিলে নরেন্দ্রকে দেখেই তার দুই চোখ উঠল চমকে। সে একরকম ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতেই এসে ডাকলে, 'পার্বতী, অ-পার্বতী!'

পার্বতী ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে বললে, 'কী গা?'

দুই চোখ কপালে তুলে দুখিরাম বললে, 'ওরে পার্বতী, ও রাজার ছেলে যে রে!'

পার্বতী প্রথমটা বুঝতে না পেরে বললে, 'কে রাজার ছেলে?'

'আমাদের টুনুর সঙ্গে যার ভাব হয়েছে!'

'বলো কী?'

'হ্যাঁ রে, হ্যাঁ! ওরা এখানকার মস্ত বড়ো জমিদার। ওর বাপের নাম রাজা ভূপেননারান! রাজা যখন বেঁচে ছিল, তখন তার নামে বাঘে-গোরুতে একঘাটে জল খেত। কী রে পার্বতী, আমি তোকে বলেছিলুম না, যার-তার সঙ্গে কোনওদিনই টুনুর বিয়ে হবে না? দেখলি, আমার কথা ফলল কি না?'

পার্বতী হেসে ফেলে বললে, 'যাও যাও, বাজে বক বক কোরো না! কোথায় বিয়ে তার ঠিক নেই, উনি এখনই ধেই ধেই করে নাচতে শুরু করেছেন! তোমার ভীমরতি ধরেছে গো, ভীমরতি ধরেছে!'

ওদিকে নরেন্দ্রের বন্ধু-বান্ধবেরা রোজ সকালে জমিদারবাড়িতে এসে দেখে, বাসা ছেড়ে উড়ে গেছে পাখি।

দ্বারবানের মুখে খবর পায়, নরেন্দ্র বন্দুক নিয়ে শিকারির সাজ পরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়।

তারা মাথা চুলকোতে চুলকোতে ভাবে, ব্যাপারটা তো কিছুই বোঝা যাচ্ছে না! কুমার বাহাদুর বন্দুক নিয়ে রোজ শিকার করতে বেরিয়ে যান একলা? কেন? আগে তো তাদের সঙ্গে না হলে তাঁর চলত না! আজকাল আবার হঠাৎ এই একলা শিকারে যাবার বেয়াড়া শখ হল কেন?

কেউ কেউ মাথা নেড়ে বলে, 'এ যেন কেমন কেমন লাগছে, না?'

কেউ সায় দিয়ে বলে, 'একেবারে অভিনব আর কী!'

কেউ বা বলে, 'কুমার বাহাদুর কি হঠাৎ কোনও কারণে আমাদের উপরে চটে গেলেন?'

অন্য সকলে বলে, 'চটবেন কেন? আমরা তো কেউ কোনও দোষ করিনি!'

অবশেষে একদিন সন্ধ্যাবেলায় তারা সকলে মিলে নরেন্দ্রকে গিয়ে গ্রেপ্তার করলে। মুখের পর মুখ থেকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন বৃষ্টি হতে লাগল।

'হ্যাঁ কুমার বাহাদুর, রোজ সকালে আপনি কোথায় যান বলুন দেখি?'

'শিকার করতে।'

'তা, আমাদের সঙ্গে নিয়ে যান না কেন?'

বন্ধুরা সবাই জানত, নরেন্দ্রের কবিতা রচনা করবার বাতিক আছে। সে সেই বাতিকের আশ্রয় গ্রহণ করলে। বললে, 'বনের ভিতরে যাই কেন জানো? কবিতা লিখতে।'

'জঙ্গল আবার কবিতা লেখবার জায়গা নাকি!'

'না হে অসীম, বন হচ্ছে অতি নির্জন স্থান। সেকালের মুনি-ঋষিরা সাধনার জন্যে বনে যেতেন, তা কি শোনোনি? কবিতাও হচ্ছে দস্তুরমতো সাধনার জিনিস। বেশ নিরিবিলি জায়গা না হলে কি কবিতা লেখা যায় হে?'

উত্তরটা কারুরই মনের মতো হয় না।

অসীম বলে, 'কবিতা লেখার জন্যে তো দরকার হয় কলম। রোজ তুমি বন্দুক নিয়ে যাও কেন?'

নরেন্দ্র বলে, 'বনের বাঘ যদি হালুম করে তেড়ে আসে, তখন কি আমি কবিতা পাঠ করে তার মাথা ঠান্ডা করব? তখন যে মসির বদলে দরকার হয় অসির। আমি না হয় অসির আর এক ধাপ উপরে উঠে ব্যবহার করি বন্দুক। তা, এজন্যে তোমাদের এত মাথাব্যথা কেন বাপু?'

কিন্তু নরেন্দ্রের এত কথা শুনেও বন্ধুদের মাথাব্যথা একটুও কমল না। নরেন্দ্রের অজ্ঞাতসারে তার পিছু পিছু গিয়ে বনের রহস্য ভেদ করবার সাধ তাদের হয়, কিন্তু সাধ্য হয় না। কারণ শেষরাত্রে কাকপক্ষী ডাকবার আগেই নরেন্দ্র যখন বনে গমন করে, তখন তার প্রত্যেক বন্ধুই থাকে গভীর নিদ্রায় অচেতন।

॥ নবম ॥

টুনুর পদক আর ভৈরবীর আঁশবটি

বাহন রুনু সেদিনও তাদের নিয়ে গিয়েছে বনের ভিতরে। একটি মস্ত কণ্টকিত কুলের ঝোপের সামনে নরেন্দ্র দাঁড়িয়ে ছিল এবং টুনু খুব খুশিমুখে কোঁচড় ভরে পাড়ছিল টোপা কুল। রুনু একটু দূরে দাঁড়িয়ে যেন কিঞ্চিৎ চিন্তিতভাবেই দেখছিল টুনুর কুল পাড়া। সে ওই

কুলগাছের গুণ জানে। শুঁড়ের ডগায় কাঁটা ফুটলে যে কত আরাম হয়, সেটাও তার অজানা নয়। তাই মোটেই তার কুল খাবার লোভ হয় না।

রুনু যা ভয় করছিল তাই হল। হঠাৎ 'উঃ' বলে মৃদু আর্তনাদ করে টুনু মাটির উপরে বসে পড়ল, তার হাতের আঙুলে বিঁধেছে কুলের কাঁটা। আঙুল দিয়ে রক্তও পড়ছে।

'দেখি, দেখি, কী হল!' বলে নরেন্দ্র তার কাছে ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে এল।

টুনু হাসিমুখ উপর দিক তুলে বললে, 'কিচ্ছু হয়নি। একটা কাঁটা বিঁধেছিল। তুলে ফেলেছি।'

হঠাৎ টুনুর গলার কাছে নরেন্দ্রের নজর পড়ল। খুব সরু একগাছা সোনার হারে গাঁথা একটি পদক কেমন করে জামার ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়েছে।

নরেন্দ্র কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'তোমার গলায় ঝুলছে ওটা কী, টুনু? আরে, ওতে যে আবার কী একটা নাম লেখা রয়েছে! কই, দেখি, দেখি!'

তাকে না বলে জামার ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়েছে বলে টুনু পদকখানাকে গালাগাল দিতে লাগল। এটা আর কারুকে দেখাবার ইচ্ছা তার ছিল না। তবে, নরেন্দ্র যখন নেহাত দেখেই ফেলেছে, তখন লুকোবার আর কোনওই উপায় নেই।

নরেন্দ্র হেঁট হয়ে পড়ে সেই সোনার হার আর পদকখানা বেশ খানিকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করলে। তারপর ধীরে ধীরে বললে, 'এই গহন বনে এরকম হার আর সোনার পদক গড়ে এরকম স্যাকরা তো কেউ নেই! কাঠুরেদের কোনও মেয়ের গায়েই কখনও আমি এক টুকরো সোনার গয়নাও দেখিনি।'

ধরা পড়ে গিয়েছে বুঝে টুনু চুপটি করে রইল।

নরেন্দ্র আবার বললে, 'পদকের উপরে একটি নাম লেখা দেখছি—'রেণুকা'। তোমার নাম তো টুনু। তোমার পোশাকি নাম কি রেণুকা?'

মৃদুস্বরে টুনু শুধু বললে, 'হুঁ।'

নরেন্দ্র বললে, 'রেণুকা খুব পুরোনো নাম, আবার খুব আধুনিকও। নামটি ভারী মিষ্টি। ও নাম তোমার কে রাখলে?'

'আমার মা-বাবা।'

'দুখিরাম আর পার্বতী?'

'উঁহু!'

'তবে?'

'আমার সত্যিকার মা-বাবা।'

নরেন্দ্র মহা বিস্ময়ে বললে, 'তোমার সত্যিকার মা-বাবা! সে আবার কারা?'

'আমি তাঁদের নাম জানি না।'

'নিজের মা-বাবার নাম জানো না!'

'খুব ছোটোবেলায় আমি বনের ভিতর হারিয়ে গিয়েছিলুম। সেই সময় রুনু আমাকে দেখতে পেয়ে ওই কাঠুরেপাড়ায় গিয়ে দিয়ে আসে। তারপর থেকে ওইখানেই আমি মানুষ হয়েছি।

কতদিন পরে নরেন্দ্রর একটা মস্ত সমস্যার পূরণ হল। টুনুকে সে কোনওদিনই কাঠুরেদের মেয়ে বলে বিশ্বাস করতে পারেনি। কাঠুরেদের ঘরে মানুষ হলেও তার সর্বাঙ্গে রয়েছে আভিজাত্যের ছাপ।

আজ টুনুর মুখে আসল রহস্য জানতে পেরে নরেন্দ্রর সারা মন ভরে উঠল আনন্দে। টুনুর সত্যিকার পিতামাতারা নিশ্চয়ই ভদ্রসমাজের লোক!

সে আবার জিজ্ঞাসা করলে, 'মা আর বাবার কথা তোমার মনে পড়ে?'

'একটু একটু পড়ে বই কি!'

'দেখতে তাঁরা কীরকম ছিলেন?'

'খুব ফরসা।'

'তাঁরা কীরকম পোশাক পরতেন?'

'পোশাক আবার কীরকম পরতেন! মা পরতেন মেয়েদের মতো কাপড়। আর বাবাকে সব সময়েই দেখতুম, সায়েবদের মতন পোশাক পরে আছেন।'

'তুমি সাহেব দেখেছ?'

'হুঁ, এই বনে মাঝে মাঝে শিকার করতে আসে।'

'তোমার বাবা সেইরকম পোশাক পরতেন?'

'হ্যাঁ। বাবাকে মাঝে মাঝে তোমার মতো পোশাক পরতেও দেখতুম।'

নরেন্দ্র বুঝলে, টুনু বলছে তার বাবা পরতেন তারই মতন খাকি রঙের প্যান্ট শার্ট। তাহলে বেশ বোঝা যাচ্ছে, টুনুর বাবা সাধারণ হেটো লোকের মতো নয়।

সে জিজ্ঞাসা করলে, 'তুমি যখন হারিয়ে গিয়েছিলে, তখন তোমার বয়স কত?'

'এই, পাঁচ-ছ-বছর হবে আর কী!'

'তাহলে তোমার বাড়ির ঠিকানাও নিশ্চয়ই তুমি জানো না?'

'না। তবে এইটুকু আমার মনে আছে, এই বনের ধারেই কোথাও আমাদের বাড়ি। কারণ, আমি তো তখন খুব ছোট্টটি, হারিয়ে গেলেও বাড়ি থেকে নিশ্চয়ই খুব বেশি দূরে হেঁটে যেতে পারিনি।'

নরেন্দ্র ভাবতে ভাবতে বললে, 'তোমরা কি পাকাবাড়িতে থাকতে?'

'হ্যাঁ, সেটা আমার মনে আছে। আরও মনে আছে যে, আমাদের বাড়ির চারিধারে ছিল চমৎকার একটি বেড়া দেওয়া বাগান। সেই বাগানটিতে রোজ আমি খেলা করতুম। আর খেলা করতে করতে একদিন প্রজাপতি ধরতে গিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেই তো আমার এই সর্বনাশ! আমাকে হারিয়ে ফেলে আমার মা-বাবা নিশ্চয় কতদিন ধরে কত কেঁদেছেন।' বলতে বলতে টুনুর দুটি ডাগর ডাগর চোখ ভরে উঠল অশ্রুজলে।

নরেন্দ্র তাকে সান্ত্বনা দিয়ে তার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললে, 'কেঁদো না টুনু। এই বনের ধারে ধারে চারিদিকে আমি খুঁজে দেখব। আমি নিশ্চয়ই তোমার আসল বাপ-মায়ের সন্ধান পাব।'

টুনু বললে, 'তখনও হবে আমার আর এক জ্বালা! এই বনের মা-বাপকেও আমি যে

ভালোবেসে ফেলেছি গো! এদের ছেড়ে যেতে দুঃখে আমারও বুক ফেটে যাবে, আর আমাকে ছেড়ে এরাও প্রাণে বাঁচবে না। কী করি বলো তো নরেন?'

নরেন বললে, 'তোমার বাপ-মায়ের যেটুকু বর্ণনা শুনলুম, তাতে বোধ হয় তাঁরা গরিব নন। দুখিরাম গরিব মানুষ, বনের কাঠ কেটে খায়। ওকে আর পার্বতীকে তুমি তো অনায়াসেই সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারো। তোমাকে ফিরে পেলে খুশি হয়ে তোমার বাপ-মা নিশ্চয়ই ওদের আশ্রয় দেবেন।'

এত সহজে এত বড়ো সমস্যার সমাধান হয়ে গেল দেখে টুনু দাঁড়িয়ে উঠে নাচতে নাচতে বললে, 'ওহো, কী মজা, কী মজা! ওরে রুনু, কী মজা! নরেন আমাকে বাবা-মার কাছে নিয়ে যাবে রে!'

হঠাৎ নরেন মুখ তুলে দেখলে, কুল-ঝোপের ওপাশ থেকে সাঁৎ করে একদিকে সরে গেল একখানা কালো মুখ, আর চকচকে দুটো চোখ। ভালো করে মুখখানা দেখা গেল না বটে, কিন্তু সেটা যে মানুষেরই মুখ, তাতে আর কোনওই সন্দেহ নেই। নিশ্চয়ই লোকটার অভিপ্রায় ভালো নয়, নইলে অমন করে চোরের মতো গা-ঢাকা দেবে কেন? সে তখনই পিঠ থেকে বন্দুক নামিয়ে দ্রুতপদে সেইদিকে ছুটে গেল। কারুকেই দেখতে পেলে না। কেবল লক্ষ করলে, খানিক তফাতে একটা ঝোপ দুলতে দুলতে আবার স্থির হয়ে গেল। তাকে ভয় দেখাবার জন্যে সে একবার বন্দুক ছুড়লে। তারপর আবার টুনুর কাছে ফিরে এল।

টুনু বিস্ময়-ভরে বললে, 'নরেন, ওদিকে তুমি ছুটে গেলে কেন? আর বন্দুকই বা ছুড়লে কেন?'

নরেন্দ্র বললে, 'কে একটা লোক এখানে লুকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। আমাকে দেখেই পালিয়ে গেল।'

যে পালিয়ে গেল সে আর কেউ নয়, সে হচ্ছে রাঘব সর্দার। সে একজন বিখ্যাত ডাকাত। বনের বাইরে চারিদিকে ডাকাতি করে আবার সে ডুব মারে বনের ভিতরে। এই বনেই তার আস্তানা, পুলিশ এখানে এসে কোনওমতেই তাকে খুঁজে বার করতে পারে না। রাঘব আজ পর্যন্ত কত লোককে যে খুন-জখম করেছে, তার আর কোনও হিসাব নেই। তার নাম শুনলেই এ-অঞ্চলে সকলেরই বুক মহা ভয়ে কেঁপে ওঠে। তোমরাও রাঘবকে দেখেছ—সেই যেদিন নরেন্দ্র এসেছিল হরিণ শিকার করতে। টুনুর হুকুমে রুনু করেছিল তারই পিছনে তাড়া।

বনের ভিতর দিয়ে এ-পথ সে-পথ মাড়িয়ে রাঘব সর্দার এগিয়ে চলেছে হন হন করে। হিংস্র জন্তু-সংকুল এই বন্য দৃশ্যের মাঝখানে তার বন্য ও হিংস্র মূর্তিও মানিয়ে গিয়েছিল দস্তুরমতো। প্রায় আধ ঘন্টা ধরে হাঁটবার পর সে অরণ্যের একটা অতিশয় নিবিড় ও অন্ধকারে আচ্ছন্ন অংশের ভিতরে প্রবেশ করলে। বাহির থেকে এখানে প্রবেশ করবার পথ আবিষ্কার করা অসম্ভব। এখান দিয়ে আনাগোনা করবার গুপ্ত পথ জানে কেবল রাঘব সর্দার ও তার চেলা-চামুণ্ডারা।

খানিকক্ষণ পরে বন আবার পাতলা হয়ে এল এবং সামনে দেখা গেল গাছ আর

আগাছায় ভরা খানিকটা খোলা জমি। সেই জমির উপরে দাঁড়িয়ে রয়েছে তিনতলা বাড়ির সমান উঁচু ছোটো একটা পাহাড় বা টিপি। তারই তলায় কতকগুলো গোলপাতার ছাউনি দেওয়া ঘর। সেইখানেই বাস করে দলবল নিয়ে রাঘব সর্দার।

একখানা বড়ো ঘরের দাওয়ার উপরে গিয়ে বসে পড়ে রাঘব তার হেঁড়ে গলায় ডাক দিলে, 'ওরে ভৈরবী!'

ভিতর থেকে ঠিক ভাঙা কাঁশির মতো খনখনে ও নাকি আওয়াজ বেরিয়ে এল, 'কী বলছিস রে কর্তা?'

রাঘব বললে, 'একছিলিম তামুক সেজে আন রে!'

ভিতর থেকে আবার সেই আওয়াজ এল, 'আমার এখন হাত জোড়া। তামুক খেতে সাধ যায় তো নিজের হাতে সেজে খা!'

রাঘব হুঙ্কার দিয়ে বলে উঠল, 'তবে রে গতরখাকি মুটকি! দেখবি একবার মজাটা? জোড়া হাত খালাস করে এক্ষুনি তামুক সেজে নিয়ে আয়!'

ভিতর থেকে আর কোনও সাড়া পাওয়া গেল না। রাঘব নিজের কোমর থেকে রাঙা গামছাখানা খুলে মুখের সামনে ঘোরাতে ঘোরাতে বাতাস সৃষ্টি করবার চেষ্টা করতে লাগল। এবং তার গলা পেয়ে এদিক-ওদিক থেকে আরও কয়েকজন গুণ্ডার মতন দেখতে লোক একে একে এসে দাওয়ার উপরে আসন গ্রহণ করলে।

একটা মাথায় খুব খাটো কিন্তু আড়ে খুব চওড়া লোক জিজ্ঞাসা করলে, 'কী খবর, সর্দার?'

রাঘব গামছা ঘোরানো বন্ধ করে হলদে হলদে দাঁতগুলো বার করে বললে, 'বেঁটকু, খবর ভালো। কিন্তু আমাদের আর বোধহয় সবুর করা চলবে না।'

বেঁটকু বললে, 'কেন?'

'আজ বনের ভিতরে দেখলুম, রাজা ভূপেনের ছেলে সেই নরেন ছোকরা আর দুখিরামের মেয়ে টুনুকে। তাদের ভাবগতিক দেখে মনে হল নরেনের সঙ্গে টুনুর বোধহয় বিয়ে হতে আর দেরি নেই।'

আর একটা লোক বললে, 'কাঠুরের মেয়ের সঙ্গে রাজার ছেলের কখনও বিয়ে হয়? তাহলে নরেন কি সমাজে আর কল্কে পাবে?'

রাঘব বললে, 'মটকু, যা জানিসনে তা নিয়ে আর তুই মাথা ঘামাসনে। আজকালকার সমাজের কী খবর রাখিস তুই? কখনও কলকেতায় গিয়েছিস? সেখানে আর কোনও জাত-বিচার নেই। বামুন বাবুসায়েবরা হাড়ি-বিবিসায়েবদের বিয়ে করলেও এখন সেখানে একঘরে হয় না। নরেন তো কলকেতার কলেজে পড়া ছেলে! তার টাকার ভাবনা নেই। সে যদি টুনুকে বিয়ে করে কলকেতায় চলে যায়, তাহলে এখানকার কেউ কিছুই করতে পারবে না।'

বেঁটকু মাথা নাড়তে নাড়তে সায় দিয়ে বললে, 'হ্যাঁ সর্দার, এ কথা জজে মানে বটে।'

মটকু বললে, 'তুমি এখন কী করতে চাও সর্দার?'

'দুখিরামের বেটি টুনটুনিকে ধরে আনতে চাই।'

'ধরতে চাও তো তাকে আজকেই ধরে আনলে না কেন?'

'তুই ব্যাটা হচ্ছিস হস্তীমুখ্যু! তার সঙ্গে নরেন ছিল বললুম না।'

'আরে, কী যে বলো সর্দার! নরেন কি আবার একটা মানুষ? তোমার এক চড়ে তার ঘাড় থেকে মাথা যাবে উড়ে!'

'কিন্তু আমি চড় মারবার আগেই সে যদি বন্দুক ছুড়ত!'

দুই চক্ষু রসগোল্লার মতো গোল করে মটকু বললে, 'ও বাবা! তার হাতে আবার বন্দুক ছিল নাকি!'

'ছিল বলে ছিল! একটা গুলি চালিয়েও ছিল!'

'ছোঁড়া ভারী ধড়িবাজ তো!'

'কিন্তু কেবল কি বন্দুক? সেখানে ছিল সেই মস্ত হাতিটাও, টুনুর কথায় যেটা ওঠে বসে। বন্দুক এড়ালেও আমি সেই হাতিটাকে এড়াতে পারতুম না। তার সামনে টুনুকে ধরতে যাওয়া আর সোজা যমের বাড়ি যাওয়া একই কথা।'

বেঁটকু বললে, 'তবেই আর তুমি টুনুকে ধরেছ!'

'আলবত ধরব! আমি ক-দিন ধরে তাদের উপর নজর রেখে দেখেছি, টুনু আর নরেন হাতিটাকে নিয়ে বনে বেড়াতে আসে কেবল সকালবেলাতে। তারপর হাতি, নরেন আর টুনু, যে যার নিজের বাসায় ফিরে যায়। আজই সাঁঝেরবেলাতে কাঠুরেদের গাঁয়ে গিয়ে আমি টুনুকে ধরে আনব।'

ঘরের দরজার পাশে দাঁড়িয়ে কলকের আগুনে ফুঁ দিতে দিতে এই কথা শুনছিল আর এক বীভৎস মূর্তি। সে হচ্ছে রাঘবের বউ ভৈরবী। অত মোটা স্ত্রীলোক চোখে পড়ে না বললেও চলে। ঠিক যেন একটা বটগাছের গুঁড়ির মতো তার দেহ। গায়ের রং অমাবস্যার ঘুটঘুটে রাত্রিকেও হার মানায়। বাঁদরের মতো থ্যাবড়া নাক, কাফ্রিদের মতো পুরু ঠোঁট, একটা ঠোঁট আবার কাটা। আর সেই কাটার ফাঁক দিয়ে গজদন্তের মতো বাইরে বেরিয়ে পড়েছে একটা বিবর্ণ দাঁত। সেই কালো মুখের থেকে খুব কুতকুতে চোখদুটো তার জ্বলে জ্বলে উঠছে সাপের চোখের মতো। যেমন দ্যাবা, তেমনি দেবী!

বাইরে বেরিয়ে এসেই সেই পেত্নির মতো নাকি খনখনে গলায় ভৈরবী বলে উঠল, 'দুখিরামের মেয়েকে নিয়ে তুই কী করবি রে কর্তা?'

হলদে দাঁতের পাটি বার করে রাঘব করল একটা বিকট মুখভঙ্গি। এখানকার সকলে সেই ভঙ্গিটাকে হাসি বলেই ধরে নেয়। অতএব আমরাও তাকে হাস্য বলেই গ্রহণ করব।

হাসতে হাসতে চোখ মটকে রাঘব বললে, 'বিয়ে করব।'

যাঁহাতক এই কথা বলা, ভৈরবী অমনি হুঁকোর উপর থেকে আগুন-ভরা কলকেটা তুলে নিয়ে সজোরে প্রেরণ করলে রাঘবের মস্তকদেশের দিকে। তার ব্যাঘ্রবাঘিনী গৃহিণীর কাছ থেকে এই রকম ব্যবহারের প্রত্যাশা করত সর্বদাই রাঘব। কাজেই আজও সে প্রস্তুত হয়েই ছিল, ধাঁ করে মাথা নামিয়ে ফেলে কলকেটাকে সে কোনওমতে এড়ালে। কিন্তু জ্বলন্ত

টিকেগুলোর প্রত্যেকটিকে সে এড়াতে পারলে না; কোনও-কোনওটা গিয়ে পড়ল তার গায়ের উপরে। আঁতকে গা আর কাপড় ঝাড়তে ঝাড়তে দাঁড়িয়ে উঠে মারমুখো হয়ে সে বললে, 'কী করলি রে হতচ্ছাড়ি!'

ডান হাতে হুঁকোর নলচেটা ধরে নীচের দিকটা গদার মতন উপর দিকে তুলে রাঘবের মুখের সামনে গোদা বাঁ হাতখানা নাড়তে নাড়তে হুমকি দিয়ে ভৈরবী বললে, 'বেশি কথা কয়েছিস কী, এই হুঁকোটা ভেঙেছি তোর মাথার ওপর!'

গিন্নিকে আরও ঘাঁটিয়ে এই হুঁকোটা থেকে বঞ্চিত হবার ইচ্ছা রাঘবের হল না। মনের আক্রোশ মনেই চেপে সে বললে, 'তোর এতটা রাগের কারণ কী রে হতভাগী?'

'কারণ নেই? কেন তুই বললি, দুখিরামের বেটিকে বিয়ে করবি?'

'কেন, বিয়ে করতে দোষটা কী!'

'তোর জলজ্যান্ত বউ আমি না এখনও বেঁচে আছি!'

রাঘব অট্টাহাস্য করে বললে, 'আমাকেও তুই হাসালি ভৈরবী!'

'তা, হাস না, একটু হাস না! ও পোড়ার মুখে একটু তবু হাসি দেখলেও এই বেঁটকু আর মটকুদের মনটা কিছু ঠান্ডা হবে।'

রাঘব বললে, 'হিঁদুদের শাস্তরে আছে, পুরুষমানুষ যত খুশি বিয়ে করতে পারে। আমি হিঁদু, আমিও একটার ওপরে দুটো বিয়ে কেনই বা করব না!'

'আমার ঘরে সতীন এনে মজাটা একবার দেখ না!'

রাঘব তখন যুক্তির আশ্রয় নিলে। বললে, 'ভৈরবী, খামকা মাথা গরম করিসনি, যা বলি, মন দিয়ে শোন। তোর মনে আছে কি, নরেনের বাপ রাজা ভূপেন একবার পাইক পাঠিয়ে আমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে পুলিশের হাতে দিয়েছিল, আর আমার জেল খাটবার হুকুম হয়েছিল পনেরো বছর! ভাগ্যে আমি পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে এক বছর জেল খেটেই লম্বা দিতে পেরেছি, নইলে আজও আমাকে সেইখানে পচে মরতে হত। রাজা ব্যাটা পটল তুলেছে, কাজেই আমি ছেলের ওপরেই প্রতিশোধ নিতে চাই। তার ওপরে ওই নরেন ছোকরার সঙ্গে প্রথম যেদিন আমার দেখা হয়েছিল, সেইদিনই আমাকে অপমান করতে ছাড়েনি। তারপর আজকেও সে আমাকে মারবার জন্যে বন্দুক ছুড়েছিল। তবে নরেনকে আমি মাপ করব কেন রে?'

'দুখিরামের বেটিকে বিয়ে করলে নরেনের ওপরে কী প্রতিশোধ তোলা হবে?'

রাঘব বললে, 'মুটকি, তোর কী মোটা বুদ্ধি রে! এটাও বুঝতে পারছিস না, নরেন ওই মেয়েটিকে বিয়ে করতে চায়! কিন্তু আমি যদি তাকে ছিনিয়ে এনে বিয়ে করে ফেলি, তাহলে নরেন কী জব্দটাই না হবে!'

কিন্তু ভৈরবী বোঝ মানবার পাত্রী নয়। সে এই বলে গজরাতে গজরাতে ঘরে ঢুকল—'সতীন আনবি? আন না দেখি! ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দেব না!'

* * *

সেই সন্ধ্যায়।

সূর্যদেব অস্তচলে নেমে গিয়েছেন বটে, কিন্তু তাঁর পরিত্যক্ত কিরণ-তিরের অগ্রভাগগুলি যেন ভেঙে তখনো আবছায়ায়-ঝাপসা দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে এখনও জাগিয়ে রাখবার চেষ্টা করছে দিবসের সমুজ্জ্বল স্মৃতিটুকু। আকাশের অন্তরালে তারকাবালারা বোধহয় সাজসজ্জায় ব্যস্ত ছিল, কারণ এখনও তারা ঘোমটা খুলে দেয়নি। বিহঙ্গেরা সব কুলায়ে ফিরে গিয়ে সভয়ে স্তব্ধ হয়ে আছে, কারণ রাত্রি এখন যাত্রী হয়েছে এই গহন অরণ্যে। শৃগাল-সভায় শোনা গেল একবার হুক্কাহুয়ার লেকচার। তখনও দুয়েকটা পথ-ভোলা বাছুর হাম্বা হাম্বা চিৎকার করে অদৃশ্য মাতাদের সন্ধানে জানাচ্ছে কাতর প্রার্থনা।

দুখিরাম বললে, 'পার্বতী, আমাদের বাছুরটা পাশের মাঠে এখনও বাঁধা রয়েছে।'

পার্বতী তখন সবে সন্ধ্যাদীপ জ্বেলে তুলসীগাছের তলায় গলবস্ত্র হয়ে প্রণাম করে উঠেছে। সে ব্যস্ত হয়ে বললে, 'একটু পরেই তো হুমড়োরা বেরিয়ে পড়বে! দাঁড়াও তাকে আমি নিয়ে আসি।'

টুনু বললে, 'না মা, তুমি রান্নাঘরে যাও, উনুন জ্বলে যাচ্ছে। বাছুরটাকে আমিই নিয়ে আসি।'

বনের মেয়ে টুনু, ধীরে ধীরে চলতে শেখেনি। ছোট্ট বালিকার মতো সকৌতুকে ছুটতে ছুটতে ঘর থেকে বেরিয়ে দাওয়ায় এবং দাওয়া থেকে লাফিয়ে মাঠের উপরে গিয়ে পড়ল। তারপর তেমনি ছুটতে ছুটতেই সন্ধ্যার অন্ধকারে সে মিলিয়ে গেল একদিকে।

বাড়ির পিছনকার মাঠে একটা গাছের গোড়ায় বাছুরটা ছিল বাঁধা। সে মায়ের কাছে গিয়ে আশ্রয় নেবার জন্যে কাতর স্বরে ডেকে উঠছিল ঘন ঘন।

বাছুরটার নাম ছিল মধু। গাছের গোড়া থেকে দড়ির বাঁধন খুলতে খুলতে আদর-মাখা মিষ্টি গলায় টুনু বললে, 'হ্যাঁরে মধু, মায়ের কাছে গিয়ে দুধ খেতে চাস বুঝি?'

মধু তার হেঁড়ে গলায় চিৎকার করে যা বলতে চাইলে টুনু তার কিছুই বুঝতে পারলে না। সে বললে, 'বাবারে বাবা, একফোঁটা বাছুর, তার গলার আওয়াজে কানের পোকা বেরিয়ে যেতে চায় যে! হ্যাঁরে মধু—'

কিন্তু এর বেশি আর সে কিছু বলতে পারলে না। কারণ পিছন দিক থেকে হঠাৎ দু-খানা বলিষ্ঠ ও কর্কশ হাত এসে তার মুখ করে দিলে একেবারে বোবা! অন্ধকারের ভিতর থেকে আরও চার-পাঁচটা যেন অন্ধকার-মাখা মূর্তি আকস্মিক শরীরী বিস্ময়ের মতো তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কেউ চেপে ধরলে তার হাতদুটো, কেউ ধরলে তার দুটো পা। পরমুহূর্তে টুনু অনুভব করলে, সে এখন অবস্থান করছে শূন্যে। তারপর তারা তাকে নিয়ে দৌড়তে দৌড়তে এগিয়ে চলল কোনও একদিকে। সে এখন একান্ত অসহায়, এমনকি, তার চিৎকার করবারও উপায় নেই।

তারা ছুটে চলেছে বন-বাদাড় ভেঙে, অত্যন্ত সহজে অন্ধকারের নিবিড়তা ভেদ করে। টুনু এইটুকু বুঝতে পারলে, অন্ধকারের ভিতরেও যারা অনায়াসে দুর্ভেদ্য বনের মধ্যেও

নিজেদের পথ করে নিতে পারে, তারা নিশ্চয়ই এখানকারই লোক। পথঘাট দেখবার জন্যে তাদের দরকার হয় না চোখ। অবাধে তারা এগিয়ে চলেছে তো এগিয়ে চলেছেই। কিন্তু কে এরা? তাকে এমন নিষ্ঠুর ভাবে বন্দিনী করতে পারে, এই বনে এমন কোনও লোকেরই কথা তার মনে পড়ল না। কিন্তু তাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে কেন তারা?

তারা অনেকখানি পথ পার হয়ে গেল। রাত্রি ক্রমে অগ্রসর হচ্ছে গভীরতার দিকে। অন্ধকার ক্রমে হয়ে উঠছে নীরন্ধ্র। আকাশে উড়ছে ডানার শব্দে চারিদিক শব্দিত করে রাত্রির দূত বাদুড়েরা। গাছে গাছে শোনা যাচ্ছে পেচক ভাষায় কর্কশ আবৃত্তি। বনের সমস্ত গাছপালা যেন নিমগ্ন হয়ে গেছে কালিমার মহাসাগরে। কাছে-দূরে, বনে বনে জাগ্রত হয়ে উঠেছে রক্তলোভী, বুভুক্ষু হিংস্র নিশাচরেরা। চারিদিক ভয় ভয়। চারিদিকে যেন মূর্তি ধারণ করতে চেষ্টা করছে অদৃশ্য ছায়াচরেরা। চারিদিকে বিরাজ করছে একটা থমথমে ভাব। কারা যেন কাদের হত্যা করতে চায়, কারা যেন চায় কাদের অস্তিত্ব লুপ্ত করতে। বাতাসের দীর্ঘশ্বাসে গাছের পাতায় পাতায় জাগছে যেন মৃত্যু-প্রলাপ। টুনুর সর্বাঙ্গ শিউরে শিউরে উঠতে লাগল। ভোরের আলোয় অরণ্যের মধ্যে দিয়ে দেখেছে সে হাস্যময়ী উজ্জ্বলা প্রকৃতিকে। কিন্তু রাত্রে যে অরণ্যের অন্তপুর এমন ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে, বনবাসিনী হয়েও এ ধারণা সে কোনওদিনই করতে পারেনি।

থেকে থেকে এখানে-ওখানে জেগে উঠছে ব্যাঘ্রদের হিংসার হুঙ্কার। খুব কাছেই হঠাৎ একবার ডেকে উঠল ফেউ।

কিন্তু টুনুকে যারা নিয়ে যাচ্ছে তারা যেন এ সব বিভীষিকাকে একেবারে গ্রাহ্যের ভিতরে আনতে চায় না। তারা তবু ছুটছে আর ছুটছে আর ছুটছেই।

কেবল ফেউ ডাকবার পর একজন ছুটতে ছুটতেই বললে, 'কাছেই ফেউ ডাকছে। বোধহয় কোনও ব্যাটা বাঘের নজর পড়েছে আমাদের দিকেই। একসঙ্গে এতগুলো খাবারের লোভ বোধহয় সে সামলাতে পারেনি। 'হ্যাঁরে বেঁটকু, সর্দারের বন্দুকটা সঙ্গে এনেছিস তো?'

আর একজন বললে, 'মটকু তোর চোখদুটো কি কানা? তোর সঙ্গেই এসেছি, আমার হাতে এত বড়ো একটা বন্দুক রয়েছে তাও দেখতে পাসনে? দূর ব্যাটা, বোকারাম কোথাকার।'

মটকু খাপ্পা হয়ে বললে, 'ধরলুম, আমার চোখ না হয় কানা, কিন্তু কানা হলেই কেউ আবার রোকারাম হয় নাকি? তুই রাসকেল হচ্ছিস গাধার চেয়েও মুখ্যু।'

আর একজন কে বললে, 'হ্যাঁরে মটকু, ছুঁড়ির মুখটা এখনও ভালো করে চেপে আছিস তো? সর্দার কী বলে দিয়েছে মনে আছে? যতক্ষণ না আড্ডায় গিয়ে পৌঁছতে পারো, ছুঁড়ি যেন একবারও চেঁচাবার ফাঁক না পায়। এই বনের কোনও বুনো হাতি নাকি একেবারে ওর পোষা কুকুরের মতন হয়েছে। ওর চিৎকার একবার শুনতে পেলেই সে এক্ষুনি ছুটে এসে আমাদের সকলকার ঘাড় মট মট করে মটকে দিতে পারে।'

মটকু রেগে বললে, 'যা যাঃ, ভ্যাবাগঙ্গারাম কোথাকার! তোকে আর শেখাতে হবে না!'

খানিকক্ষণ আর কেউ কোনও কথা কইলে না। ক্রমে ধীরে ধীরে তাদের গতি হয়ে এল মন্থর, তারা হাঁটতে লাগল সাধারণ ভাবেই। অল্পকাল পরেই হঠাৎ তারা একটা ফরসা জায়গার উপর এসে দাঁড়াল। টুনুর চোখ খোলা ছিল, উপর দিকে তাকিয়ে দেখলে, আর সেখানে গাছের ডাল নেই, রয়েছে কেবল হাজার হাজার চুমকি বসানো মুক্ত কালো আকাশ। একটু তফাতে রয়েছে কীসের একটা উঁচু ছায়া, বোধহয় সেটা কোনও ছোটো পাহাড়। এই পাহাড়ের নীচের দিকে টিমটিম করে জ্বলছে গোটা-তিনেক আলো, বোধহয় ওখানে মানুষের ঘর-টর কী আছে।

যারা টুনুকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, তারা সেই আলোর দিকে খানিকটা অগ্রসর হতেই কে বিশ্রী গলায় চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'কী রে মটকু, কেল্লা ফতে তো?'

মটকু উত্তর দিলে, 'সর্দার, শিকার ধরে এনেছি!'

'জয় মা কালী!' বলে রাঘব সর্দার আহ্লাদে চিৎকার করে উঠল—কিন্তু টুনু শুনলে সে যেন একটা হিংস্র জানোয়ারের গর্জন।

একটু পরেই লোকগুলো টুনুকে নামিয়ে একটা ঘরের দাওয়ার উপরে বসিয়ে দিলে। দাওয়ার এক কোণে জ্বলছিল একটা হারিকেনের ম্লান আলো, তার দুর্বল শিখা অন্ধকারকে দূর করতে পারছিল না। টুনু মুখ তুলেই সামনেই যে বিপুল যমদূতের মতো মূর্তিটা দেখলে, সে তার অপরিচিত নয়। তার বুকটা কেঁপে কেঁপে উঠল। তবু সে বাইরে মনের ভাব প্রকাশ না করে স্থিরভাবে বসে রইল মৌন মূর্তির মতো।

রাঘব কড়া গলায় চড়া স্বরে বলল, 'কী গো দুখিরামের মেয়ে, আমাকে চিনতে পেরেছ?'

'পেরেছি।'

'তাহলে সেদিনের কথা তোমার মনে আছে?'

'হ্যাঁ আছে।'

'আমার পিছনে সেদিন তুমি একটা বুনো হাতি লেলিয়ে দিয়েছিলে, তাও ভোলনি তো!'

'এত শিগগির ভুলে যাব কেন? রুনু এখানে থাকলে তোমার পেছনে আজও তাকে লেলিয়ে দিতুম।'

রাঘব হো হো করে অট্টহাস্য করে উঠল। তারপর হাসি না থামিয়েই বললে, 'দিতিস নাকি? তাহলে একবার সেই চেষ্টাই করে দেখ না!'

'রুনু যখন আমাকে এখানে এসে খুঁজে বের করবে তখন নিশ্চয়ই সেই চেষ্টা করব।'

রাঘব চকিত স্বরে বললে, 'সেই হাতিটা এখানে তোকে খুঁজতে আসবে।'

'নিশ্চয়ই আসবে। আমার জন্যে রুনু সারা বন তোলপাড় না করে ছাড়বে না, এ আমি ভালো করেই জানি।'

রাঘব মুখে কিছু বললে না বটে, কিন্তু তার উৎফুল্ল ভাবটা যেন বেশ খানিকটা জখম হল।

তার মনের ভাব বুঝে মটকু বললে, 'সর্দার, মেয়েটার বাজে কথায় তুমি কান দিয়ো

না। হাতিটা আমাদের আড্ডার খোঁজ পাবে কী করে? এদিকে কখনও আমরা কোনও হাতি-টাতি আসতে দেখিনি। হাতিরা এদিকটা চেনেই না।'

রাঘব খানিকটা আশ্বস্ত হয়ে বললে, 'যা বলেছিস। দুখিরামের মেয়েটা আমাকে ভয় দেখাতে চায়। দাঁড়া না, ওর জাঁক আমি ভেঙে দিচ্ছি। বেঁটকু, কালকেই তুই কাছাকাছি কোনও গাঁয়ে গিয়ে একটা পুরুত ডেকে আনিস তো!'

সঙ্গে সঙ্গেই সকলকার কানে ধাক্কা মেরে সেখানে যেন বেজে উঠল একখানা ভাঙা কাঁসি।

টুনু সচকিত চোখ ফিরিয়ে দেখে, ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল যেন দশমহাবিদ্যার মাতঙ্গীর মতো এক চেহারা। মেয়েমানুষের চেহারা যে এমন হয়, সে তা জানত না।

সে এসেই চোখ পাকিয়ে বললে, 'কেন, পুরুত ডেকে এনে হবে কী? তোর শ্রাদ্ধ?'

রাঘব একটু যেন দমে গেল। দুই পা পিছনে হটে গিয়ে কেবল বললে, 'ধর, তাই।'

'তাই নাকি! তাহলে শুনে রাখ, শ্রাদ্ধ যদি হয় তাহলে সে শ্রাদ্ধ অনেক দূর গড়াবে, এ-ও আমি বলে রাখছি কিন্তু, হুঁ!'

রাঘব অবহেলার ভাব দেখিয়ে বললে, 'আচ্ছা আচ্ছা, পরে তা দেখা যাবে।'

ভৈরবী ফিরে হুমকি দিয়ে ডাকলে, 'বেঁটকু!'

বেঁটকু ভয়ে ভয়ে বললে, 'এঁজ্ঞে!'

'তুই যদি পুরুত ডাকতে যাস, তাহলে তোর নাকটা আর মুখের ওপর থাকবে না। আমার আঁশবঁটিতে খুব ধার আছে, তা জানিস তো।'

বেঁটকু চোখ নামিয়ে নিজের নাকের ডগাটা দেখবার চেষ্টা করে বললে, 'এঁজ্ঞে!'

॥ দশম ॥

রাঘব ও রুনু

পরদিনের প্রভাত।

সূর্যের কচি আলো দুখিরামের দাওয়ায় প্রবেশ করে দেখলে, মাটির উপরে লম্বা হয়ে শুয়ে পার্বতী থেকে থেকে ডুকরে কেঁদে উঠছে এবং দাওয়ার এক কোণে দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে দুখিরাম বসে আছে জড়ভরতের মতো।

কাল সারা রাত ধরে কেঁদে কেঁদে কেঁদে পার্বতীর চোখের পাতা উঠেছে ফুলে ও চোখদুটো হয়ে উঠেছে রাঙা টকটকে। দুখিরাম কাঁদছে না বটে, কিন্তু তার বুকের ভিতরটা যেন অসাড় হয়ে গিয়েছে। বেলা ক্রমে বাড়তে লাগল, কিন্তু তারা দুজনে শুয়ে আর বসে ঠিক সেই একভাবেই। কাল রাত্রেও অন্ন তাদের উদরস্থ হয়নি, আজও যে রান্নাবান্না হবে এমন কোনও লক্ষণ দেখা গেল না।

নির্দিষ্ট সময়ে রুনু এসে দাঁড়াল তাদের ঘরের দাওয়ার সামনে।

তাকে দেখেই ধড়মড় করে উঠে বসে পার্বতী চেঁচিয়ে কেঁদে বলে উঠল, 'ওরে রুনু, ওরে রুনু, তোর টুনু আর নেই রে, তাকে বাঘে নিয়ে গিয়েছে।'

রুনু কী বুঝলে জানি না, কিন্তু পার্বতীর এই কান্না শুনে তার চোখদুটো উঠল চমকে। পার্বতীকে সে কোনওদিন কাঁদতে দেখেনি, আর এখানে টুনুর অনুপস্থিতিও তার কাছে বোধহয় অস্বাভাবিক বলেই বোধ হল। হয়তো সে স্থির করতে পারলে, টুনুর অনুপস্থিতির সঙ্গে পার্বতীর এই কান্নার একটা সম্পর্ক আছে। সে একবার শুঁড় তুলে চিৎকার করে উঠল—সম্ভবত সে ডাকলে টুনুকেই। কিন্তু তবু টুনুর সাড়া বা দেখা পাওয়া গেল না।

পার্বতী আরও জোরে কাঁদতে কাঁদতে বললে, 'কাকে ডাকছিস রুনু! আমার টুনু কি আর এই দুনিয়ায় আছে! ওগো, আমার কী হবে গো! টুনুকে ছেড়ে আমি কেমন করে বেঁচে থাকব গো!'

হঠাৎ ভেঙে গেল দুখিরামেরও স্তব্ধতার বাঁধ। মাটির উপরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে সে-ও ভগ্নস্বরে হাহাকার না করে আর থাকতে পারলে না।

রুনু অধীর ভাবে একবার ওদিকে ছুটে যায়, আবার এদিকে ছুটে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে কী-একরকম চোখে দুখিরাম আর পার্বতীর দিকে তাকিয়ে থাকে।

এমন সময় বেলগাছের পাশের সেই ঝোপটার কাছে হল নরেন্দ্রর আবির্ভাব।

টুনুর বদলে সে কেবল দেখতে পেলে রুনুকে, আর শুনতে পেলে দুখিরাম ও পার্বতীর চিৎকার করে কান্না। সে কেমন থতোমতো খেয়ে গেল, অজানা একটা আতঙ্কে তার বুকের কাছটা ধড়াস ধড়াস করতে লাগল। রুনু একলা কেন। টুনু কোথায় গেল! দুখিরাম আর পার্বতী অমন করে কাঁদছে কেন! তার মনের ভিতরে ক্রমাগত আনাগোনা করতে লাগল এই তিনটে প্রশ্নই। শেষটা কিছুই বুঝতে না পেরে সে পায়ে পায়ে টুনুদের ঘরের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, এমন সময় পিছন থেকে খনখনে গলায় কে ডেকে উঠল, 'ওগো বাবু, শুনছ!'

বিস্মিত হয়ে ফিরে দাঁড়াল নরেন্দ্র। এবং অধিকতর বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে দেখলে, ভয়াল চেহারার একটা স্ত্রীলোক খানিক তফাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

নরেন্দ্র বললে, 'তুমি কি আমাকে ডাকছ?'

মুখে কিছু না বলে স্ত্রীলোকটা তাকে হাতছানি দিয়ে কাছে আসতে বললে।

অবাক হয়ে তাকে দেখতে দেখতে নরেন্দ্র তার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

স্ত্রীলোকটা বললে, 'তুমি কে গা বাবু?'

নরেন্দ্র একটু বিরক্ত হয়ে বললে, 'তা জেনে তোমার দরকার?'

'দরকার আছে বাবু, খুব বেশি দরকার আছে! তা নইলে কি শুধু শুধুই জিজ্ঞেস কচ্ছি?'

'আমার নাম নরেন।'

'ও, তুমিই বুঝি রাজাবাবুর ব্যাটা?'

নরেন খালি ঘাড় নেড়ে সায় দিলে।

'তোমাকেই তো আমার বেশি দরকার!'

অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে নরেন্দ্র বললে, 'তোমার দরকার আমাকে!'

'হ্যাঁ গো, হ্যাঁ, তোমাকেই!'

'কেন?'

স্ত্রীলোকটা অল্প একটু ইতস্তত করলে। তারপর বললে, 'তুমি দুখিরামের বেটিকে দেখতে চাও?'

'টুনুকে!'

'তা হবে, বোধহয় তারা নাম তাই।'

'হ্যাঁ, তার সঙ্গে দেখা করবার জন্যেই তো আমি এখানে এসেছি!'

'কিন্তু তার দেখা তুমি এখানে পাবে না।'

'পাব না মানে?'

'দুখিরাম আর তার বউয়ের মড়াকান্না শুনেও কি তুমি বুঝতে পারছ না যে টুনু এখানে নেই?'

নরেন্দ্র যেন স্তম্ভিত হয়ে গেল। একটু নীরব থেকে বললে, 'টুনুর কোনও অনিষ্ট হয়নি তো?'

'এখনও হয়নি, কিন্তু হতে আর কতক্ষণ?'

'সে আবার কী?'

'টুনু এখন পড়েছে রাঘব-বোয়ালের পাল্লায়।'

নরেন্দ্র হতভম্বের মতো বললে, 'তোমার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। রাঘব-বোয়ালটা কে শুনি?'

'রাঘব সর্দারের নাম শুনেছ?'

'শুনেছি। একদিন বনের ভিতরে তার সঙ্গে দেখাও হয়েছে বলে সন্দেহ হয়। তুমি রাঘব ডাকাতের কথা বলছ তো?'

'হ্যাঁ।'

'সে কী! টুনু রাঘব ডাকাতের পাল্লায় গিয়ে পড়ল কেমন করে?'

'কাল রাতে টুনুকে তারা এখান থেকে ধরে নিয়ে গিয়েছে।'

ব্যস্ত ভাবে নরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করলে, 'কোথায় ধরে নিয়ে গিয়েছে?'

'তাদের নিজেদের আস্তানায়।'

'কোথায় তাদের আস্তানা?'

'এই বনেই।'

'তুমি তার ঠিকানা জানো?'

'জানি।'

'আমাকে এখনই সেখানে নিয়ে যেতে পারবে?'

'পারব। তোমাকে নিয়ে যেতেই তো আমি এসেছি!'

'তাহলে এখনই আমাকে সেখানে নিয়ে চলো।'

স্ত্রীলোকটা নড়ল না। বললে, 'তুমি একলা সেখানে গিয়ে কিছুই করতে পারবে না। রাঘবের দলে আট-দশ জন লোক আছে।'

'বেশ, সে ব্যবস্থাও করছি। কিন্তু তুমি কে? তোমার নাম কী?'

স্ত্রীলোকটা একগাল হেসে বললে, 'আমি? আমি রাঘবের বউ গো! আমার নাম ভৈরবী।'

চমকে উঠে বিস্ফারিত চক্ষে ভৈরবীর মুখের পানে তাকিয়ে নরেন্দ্র স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল দুই মুহূর্ত। তারপর তাড়াতাড়ি বললে, 'তুমি এখানে একটু দাঁড়াও, আমি এখনই আসছি।' বলেই সে দুখিরামের ঘরের দিকে 'রুনু, রুনু, রুনু!' বলে ডাকতে ডাকতে দৌড়ে এগিয়ে গেল। তার ডাক শুনে রুনু তখনই কান খাড়া করে ফিরে দাঁড়াল।

তাকে দেখে দুখিরাম দাঁড়িয়ে উঠে করুণ স্বরে বললে, 'রাজাবাবু, আমাদের সর্বনাশ হয়েছে গো! টুনু আর বেঁচে নেই!'

নরেন্দ্র বললে, 'কোনও সর্বনাশ হয়নি, টুনু বেঁচে আছে। তার খবর আমি পেয়েছি। তোমরা আর কেঁদো না। আমি এখনই টুনুকে আনতে চললুম।'

তারপর সে রুনুর গা চাপড়াতে চাপড়াতে সস্নেহে বললে, 'রুনু, আমি টুনুকে আনতে যাচ্ছি, বুঝেছিস? টুনু রে, তোর টুনু! শিগগির আমার সঙ্গে আয়, তুই না গেলে আমি টুনুকে আনতে পারব না। আয়—'

রুনু ঠিক বুঝতে পারলে। আর কোনও রকম ইতস্তত না করেই সে এগিয়ে চলল নরেন্দ্রর পিছনে পিছনে।

নরেন্দ্রের সঙ্গে অত বড়ো একটা হাতিকে আসতে দেখে ভৈরবী অত্যন্ত ভয় পেয়ে ঝোপের ভিতরে লুকোবার চেষ্টা করলে।

নরেন্দ্র বললে, 'তোমার কোনও ভয় নেই। এ তোমাকে কিছু বলবে না। আমি আর টুনু যা বলি, এই হাতি তা শোনে। তুমি নির্ভয়ে আমাদের আগে আগে এগিয়ে পথ দেখিয়ে চলো।'

ভৈরবী নরেন্দ্রের কথা মতো অগ্রসর হল বটে, কিন্তু যেতে যেতে বারবার সন্দিগ্ধ ও সঙ্কুচিত ভাবে পিছনে মুখ ফিরিয়ে তাকাতে লাগল।

চলল আবার তারা বনের পর বনের ভিতর দিয়ে, মাঠের পর মাঠ পার হয়ে। সূর্যের আলোতে অরণ্য এখন জ্যোতির্ময়, দুঃস্বপ্ন-মাখা রাত্রির কালো অভিশাপ কোনওখানেই আর জেগে নেই। পেচক আর বাদুড়দের কথা পৃথিবী এখন ভুলে গিয়েছে, তাদের বদলে দিকে দিকে বসেছে গানের পাখিদের সভা।

রাত্রে যাদের আনন্দ, দিনে তাদের প্রাণে জাগে আতঙ্ক। কাল রাত্রে বিপুল বিক্রমে যারা গাইছিল মৃত্যুর সংগীত, দিনের আলোয় এখন আর তারা বাইরে মুখ বাড়াবার ভরসা করছে না।

রুনুর মনের ভিতরে এখন কোনও ভাবের প্রভাব তা আমরা জানি না, কিন্তু নরেন্দ্রের মনের মধ্যে ক্রমেই অধিকতর পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছিল ভীষণ আক্রোশ ও দারুণ ক্রোধ।

সে বেশ বুঝলে, টুনু সেদিন রুনুকে রাঘবের পিছনে লেলিয়ে দিয়েছিল বলেই আজ সে তাকে চুরি করে নিয়ে গিয়েছে। ছেলেবেলা থেকেই রাঘবের নাম শুনে আসছে সে লোকের মুখে মুখে। তার অমানুষিক অত্যাচারে এ অঞ্চলের বাসিন্দাদের মনে দুর্ভাবনার অন্ত নেই। সে নাকি একবার জ্বলন্ত আগুনের ভিতরে এক পরিবারের দশজন লোককে জীবন্ত অবস্থায় ফেলে দিয়েছিল। তাদের অপরাধ, তারা গুপ্তধনের সন্ধান দেয়নি। ছেলেবেলা থেকেই নরেন্দ্রের মন বিদ্রোহী হয়ে আছে রাঘবের বিরুদ্ধে। তার উপরে রাঘবের আজকের এই অপরাধ! এর আর মার্জনা নেই। নরেন্দ্র দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করলে, টুনুকে তো উদ্ধার করবেই, সেই সঙ্গে রাঘবকেও সে দিয়ে আসবে চরম শিক্ষা। রাঘবকে আজ হত্যা—অন্তত বন্দি করতে পারলেও এ অঞ্চলের গৃহস্থেরা মস্ত একটা দুঃস্বপ্নের কবল থেকে নিস্তার লাভ করে হাঁপ ছেড়ে বাঁচবে।

অনেকক্ষণ পথ চলবার পর তারা একটা মাঠের উপরে এসে দাঁড়াল। দূরে একটু তফাতে দেখা যাচ্ছে ছোট্ট একটা পাহাড়, আর তার তলায় রয়েছে সারি সারি ছাউনি-বাঁধা ঘর। ভৈরবী হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে বললে, 'বাবু, আমি আর যেতে পারব না।'

'কেন?'

'আমিই যে তোমাকে দুখিরামের মেয়ের কথা বলে দিয়েছি, এটা জানতে পারলে ওরা আমাকেও মেরে ফেলবে।'

'কী মুশকিল। অন্তত রাঘবের আস্তানাটাও দেখিয়ে দেবে তো?'

সামনের দিকে হস্ত বিস্তার করে ভৈরবী বললে, 'ওই ঘরগুলোর ভিতরে ওরা থাকে।'

'আয় রুনু!' বনে নরেন্দ্র আবার এগুতে উদ্যত হল, কিন্তু ভৈরবী হঠাৎ আবার কাতর স্বরে বললে, 'আর একটা কথা, বাবু!'

'কী কথা?'

'আর যা করো বাবু, তাকে প্রাণে মেরো না। হাজার হোক সে তো আমার সোয়ামি। সে মরলে আমার সিঁথের সিঁদুর ঘুচবে, আর হাতের নোয়াও থাকবে না।'

ভৈরবী যে দানবের যোগ্য দানবী সে-বিষয়ে কোনওই সন্দেহ নেই; কিন্তু তারও মনে এখনও যে পতিভক্তির অঙ্কুর আছে, এটুকু বুঝে নরেন্দ্র হল বিস্মিত। কণ্ঠস্বরে স্নিগ্ধতা এনে সে বললে, 'দ্যাখো ভৈরবী, তোমাকে আমি জোর করে এখন কোনও কথা দিতে পারব না। রাঘব যদি টুনুর কোনও অনিষ্ট না করে থাকে আর আমার কাছে ভালো মানুষের মতো ধরা দেয়, তাহলে তার কোনওই প্রাণের ভয় নেই। তাকে বন্দি করব বটে, তবে প্রাণে মারব না। কিন্তু আমার সঙ্গে আজ ও কোনও শয়তানি করলে রাঘবের অদৃষ্টে কী আছে কেবল ভগবানই জানেন।—আয় রুনু!'

পিঠের বন্দুক হাতের উপরে নিয়ে নরেন্দ্র অগ্রসর হতে লাগল দৃঢ়পদে। তার ভাবভঙ্গি দেখেই রুনু বোধহয় বুঝতে পারলে, আজ এখানে তাদের অভিনয় করতে হবে বিশেষ কোনও নাটকীয় দৃশ্যে। হঠাৎ সে খুব জোরে একবার চিৎকার করে উঠল।

তারা তখন মাঠের তিন ভাগ পার হয়ে এসেছে, আর একভাগ মাত্র বাকি। পাহাড়ের

তলাকার ঘরগুলোয় যারা বাস করে, হাতির ডাক শুনেই তারা বাইরে বেরিয়ে এসে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে সেখানে উঠল একটা হই হই রব। কালো কালো কয়েকটা মূর্তি এদিকে-ওদিকে ব্যস্ত হয়ে ছুটোছুটি করে বেড়াতে লাগল। তারপরেই হল একটা বন্দুকের শব্দ।

রুনু বেচারির একটা কান ছ্যাঁদা করে বেরিয়ে গেল একটা তপ্ত গুলি। সে চেঁচিয়ে উঠল রাগে আর যাতনায়। নরেন্দ্রও বন্দুক ছুড়তে দেরি করলে না—উপর উপরি দু-দু-বার। ওদিকে জেগে উঠল মনুষ্য-কণ্ঠস্বরে একটা বিকট আর্তনাদ। পরমুহূর্তেই ঘরের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল কালো মূর্তিগুলো।

তারপরেই শোনা গেল একটা অতি কাতর তীক্ষ্ণ কান্নার শব্দ। রুনু ও নরেন্দ্র দুজনেই বুঝলে, এ কান্নার শব্দ আসছে টুনুর কণ্ঠ থেকে।

রুনু নিজের সমস্ত যন্ত্রণার কথা তৎক্ষণাৎ ভুলে গেল। দুই কর্ণ দুইদিকে বিস্তৃত ও শুণ্ড ঊর্ধ্বে উত্তোলিত করে সে ঝড়ের মতো বেগে মাটি কাঁপিয়ে ছুটে চলল সেই ঘরগুলোর দিকে। তার দিকে তাকালেও প্রাণ এখন শিউরে ওঠে, সে যেন এখন সাক্ষাৎ এক সংহার-মূর্তির মতো! বন্দুকে টোটা ভরে নিয়ে নরেন্দ্রও ছুটতে লাগল প্রাণপণে।

তারা যখন ঘরগুলোর খুব কাছে এসে পড়েছে তখন আবার শোনা গেল টুনুর উচ্চ কণ্ঠস্বর: 'রুনু, রুনু! এরা আবার আমাকে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে, তুমি শিগগির এসো রুনু!' সেইখান থেকেই দেখা গেল, একদল লোক সার বেঁধে উঠে যাচ্ছে পাহাড়ের উপরের দিকে।

নরেন্দ্র আবার দু-বার বন্দুক ছুড়লে। একটা লোক পাহাড়ে উঠতে উঠতে হঠাৎ শূন্যে দুই হাত ছড়িয়ে নীচের দিকে পড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। পাহাড়ের উপর থেকেও বন্দুকের আওয়াজ হল, কিন্তু রুনু বা নরেন্দ্রের গায়ে কোনও গুলিই লাগল না।

রুনু আরও জোরে ছুটে চলল—যাকে বলে উল্কা-বেগে! হাতি যে অত বড়ো দেহ নিয়ে এত বেগে ছুটতে পারে, নরেন কোনও দিনও তা কল্পনা করতে পারেনি। সে খুব তাড়াতাড়ি পা চালাতে লাগল, কিন্তু রুনুর নাগাল ধরতে পারলে না কিছুতেই। তাকে অনেক পিছনে ফেলে বৃংহিতধ্বনি করতে করতে সুমুখের ঘরগুলোর কাছে মোড় ফিরে রুনু চলে গেল চোখের আড়ালে এবং কয়েক মুহূর্ত পরেই দেখা গেল, সে-ও উঠে যাচ্ছে পাহাড়ের উপর দিকে।

পাহাড়ের তলায় এসে পড়ে নরেন মানুষ কি টুনু, কারুকেই আর দেখতে পেলে না। কেবল সামনে পেলে উপরে উঠবার একটা পথ। তাড়াতাড়ি বন্দুকে আবার টোটা ভরে নিয়ে সে-ও অবলম্বন করলে পাহাড়ে পথটা।

আগেই যথা সময়ে বলা হয়েছে, এটা একটা ঢিপির মতো পাহাড়। তিনতলা বাড়ির চেয়ে বেশি উঁচু হবে না। তার উপরে কতকগুলো বড়ো বড়ো ঢ্যাঙা গাছ ছিল বলে দূর থেকে পাহাড়টাকে আরও কিছু বেশি উঁচু দেখায়।

নরেন যখন প্রায় পাহাড়ের টঙে গিয়ে পৌঁছেছে তখন হঠাৎ সে রোমাঞ্চিত দেহে শুনতে পেলে নানা মানুষের কণ্ঠস্বরে আকাশ-ফাটানো চিৎকারের পর চিৎকার, এবং সেইসঙ্গে একবার বন্দুকের গর্জনও। রুদ্ধশ্বাসে সে পাহাড়ের চূড়ার উপরে গিয়ে দাঁড়াল। দৌড়ে সামনে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে দেখলে, পাহাড়ের গা আবার ঢালু হয়ে নীচের দিকে নেমে

গিয়েছে। সেইখানে দাঁড়িয়ে বিস্ময়স্তম্ভিত নেত্রে যা দর্শন করলে তা হচ্ছে এই: তার দিকে পিছন ফিরে পাহাড়ের মাঝ-বরাবর দাঁড়িয়ে আছে রুনুর ক্রোধস্ফীত বিশাল দেহ, এবং তার পিঠের উপরে সুন্দর একটি জীবন্ত পুতুলের মতন বসে আছে টুনু।

রুনুর দেহের এপাশে-ওপাশে পড়ে রয়েছে কয়েকটা রক্তাক্ত মনুষ্যদেহ। কোনও কোনও দেহ তখনও ছটফট করছে, এবং কোনও-কোনওটা একেবারে আড়ষ্ট।

নরেন্দ্র আবার ছুটে নীচের দিকে নেমে গেল। ঘটনাস্থলে উপস্থিত হতে তার আধ মিনিটও লাগল না।

রুনুর কাছে গিয়েই নরেন্দ্র সানন্দে ডাকলে, 'টুনু! আমার টুনু!'

টুনু মুখ ফিরিয়ে মধুর হাসি হেসে বললে, 'কী, নরেন?'

'তোমার গায়ে কোথাও লাগেনি তো?'

'কিচ্ছু লাগেনি। রুনু এসে প্রথমেই আমাকে শুঁড় দিয়ে পিঠের উপরে তুলে নিয়েছিল। তারপর যা কাণ্ড! দেখতেই পাচ্ছ তো!'

নরেন্দ্র কৃতজ্ঞ কণ্ঠে ডাকলে, 'রুনু!'

রুনু ধীরে ধীরে তার দিকে ফিরে দাঁড়াল। টুনুকে পেয়ে তার মূর্তি এখন শান্ত হয়েছে বটে, কিন্তু তার শুঁড়ে জড়ানো কী ওটা? ভালো করে সেদিকে তাকিয়েই ভয়ার্ত বিস্ময়ে নরেন্দ্র তাড়াতাড়ি পিছিয়ে দাঁড়াল।

রুনুর শুঁড়ের কুণ্ডলীর ভিতরে একদিকে দুই বাহু ও আর এক দিকে দুই পা ঝুলিয়ে খুব-বাঁকানো ধনুকের মতো ছটফট ছটফট করছে মস্ত একটা মানুষের দেহ। তার সর্বাঙ্গ রক্তে আরক্ত। তার নাক-মুখ-চোখের ভিতর থেকে ঠিকরে বেরিয়ে আসছে রক্তের ফিনিক। চিনতে বিলম্ব হল না, সে হচ্ছে রাঘব ডাকাত।

রাঘব তখনও দৃষ্টিশক্তি হারায়নি, নরেন্দ্রকে চিনতে পারলে। প্রায় অবরুদ্ধ কণ্ঠে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, 'পায়ে পড়ি, ক্ষমা করো! আমাকে বাঁচাও!'

নরেন্দ্রের মনে পড়ল ভৈরবীর শেষ কাতর মিনতি। বললে, 'রুনু, ও লোকটাকে তুমি দয়া করে ছেড়ে দাও।'

রুনু হয়তো তার কথা বুঝতে পারলে না, কিংবা হয়তো বুঝেও গ্রাহ্যের মধ্যে আনলে না। আচম্বিতে সে শুঁড়ের সঙ্গে রাঘবের দেহ তুলে ফেললে শূন্যে এবং তারপর মারলে তাকে পাহাড়ের উপরে এক আছাড়। রাঘব একবার আর্তনাদ করবার সময় পেলে না, তার দেহ একবার নড়ে উঠেই একেবারে স্থির হয়ে গেল। কিন্তু রুনুর আক্রোশ তখনও কম-জোরি হবার নাম করলে না। সে গর্জন করতে করতে নিজের সামনের দুই পা দিয়ে রাঘবের দেহের উপরে উঠে তাকে ক্রমাগত থেঁতলে ফেলতে লাগল—সে যেন মত্ত মাতঙ্গের তাণ্ডব নৃত্য! দেখতে দেখতে রাঘবের দেহ হয়ে গেল একটা রক্তমাখা মাংসের তাল; তখন সেটাকে দেখলে তা যে মানুষের দেহ, মনে জাগে না এমন সন্দেহও।

সে দৃশ্য টুনু আর দেখতে পারলে না, দুই হাতে দুই চোখ ঢেকে ক্ষীণ কণ্ঠে বললে, 'ওকে ছেড়ে দে রুনু, ওকে ছেড়ে দে! চল, আবার আমার ঘরে ফিরে যাই।'

॥ একাদশ ॥

টুনুর রাজকুমার

তোমরা কেউ আলো-বীণার সুর শুনেছ? এ সুর বাইরের কানে শোনা যায় না, শুনতে হয় প্রাণের কানে। ভোরের আলোর সঙ্গে সঙ্গে বীণা বাজতে থাকে আকাশে আকাশে, বিহঙ্গদের কণ্ঠে নয়, মনের আসরে, বিন্দুর মতো ছোটো তৃণকুসুমের আনন্দের ছন্দে। এই বীণার আহ্বান-তান শুনেই তো বাসা থেকে দলে দলে পুঞ্জে পুঞ্জে বেরিয়ে পড়ে মধুকর আর রঙিন প্রজাপতি। এতটুকু যে শামুক, যার কান নেই, সে-ও এই বীণার রাগিণী নিজের ছোট্ট হৃদয়ের মাঝখানে অনুভব করে অন্ধকার থেকে এসে উপস্থিত হয় মুক্ত অসীমের ছায়ায়। সকালে মানুষ যে ভৈরবী রাগিণী গায় সে তো এই আলো-বীণার ছন্দধ্বনি অনুসরণ করেই।

আজও সকালে বনে বনে স্নিগ্ধঘন শ্যামলতার উপরে যেখানেই ছড়িয়ে পড়েছে কাঁচা সোনামাখা রোদটুকু, সেইখানেই ধ্বনিত হয়ে উঠেছে এই আলো-বীণার সুর, এই আলো-বীণার ছন্দ, এই আলো-বীণার আনন্দ। তারাও মনে-প্রাণে অনুভব করছিল এই অপূর্ব আলোক-বীণার বিচিত্র আশীর্বাদটুকু—টুনু ও নরেন্দ্র।

বেলগাছের পাশের সেই ঝোপ। এই নিরিবিলি জায়গাটি তাদের বড়ো মিষ্টি লাগে। এখান থেকে একদিকে তাকালে দেখা যায় কতকগুলো বড়ো বড়ো গাছের ছায়ায় ঘুমন্ত, শান্ত সেই কাঠুরে পল্লিটি। আর একদিকে দেখা যায়, মস্ত একটা তেপান্তর দিকচক্রবাল রেখা পর্যন্ত করছে ধু-ধু-ধু-ধু,—রূপকথার রাজার ছেলে, মন্ত্রীর ছেলে আর সওদাগরের ছেলে সেখান দিয়েই ঘোড়া ছুটিয়ে কোন সেকালে যাত্রা করত হয়তো কোনও বিপদগ্রস্তা অজানা রাজকন্যাকে উদ্ধার করতে। আর একদিকে দেখি, অনন্তের পূজা-মন্দিরের মতো একটা উচ্চ শৈলশিখর উঠে গিয়েছে নীলাকাশকে চুম্বন করতে। এবং এখান থেকে দেখা না গেলেও কানে শোনা যায় একটি স্রোতস্বিনীর ছন্দসুন্দর নৃত্যসংগীত।

'টুনু!'

'কেন নরেন?'

'আজ আমি তোমাকে একটি আশ্চর্য খবর দেব।'

'আশ্চর্য খবর?'

'হ্যাঁ টুনু।'

'কিন্তু আমি যদি আশ্চর্য না হই?'

'তুমি যদি আশ্চর্য না হও, তাহলে পৃথিবীতে আমার মতন আশ্চর্য আর কেউ হবে না!'

'তুমি এমন কী আশ্চর্য খবর আমাকে দিতে পারো, নরেন?'

'আমি তোমার বাবা আর মায়ের সন্ধান পেয়েছি।'

টুনুর দুই চোখ হয়ে উঠল বিস্ফারিত। সে নিজের কানকে নিজেই যেন বিশ্বাস করতে

পারল না। সচমকে প্রায় অস্ফুট কণ্ঠে সে বললে, 'আমার বাবা আর মায়ের খবর! আমি ভুল শুনছি না তো? তুমি কী বললে নরেন আর-একবার বলো তো?'

'তোমার বাবা আর মায়ের খবর আমি পেয়েছি। তাঁরা কোথায় থাকেন তাও আমি জেনেছি।'

গভীর আবেগে ও উত্তেজনায় ফুলে ফুলে উঠতে লাগল টুনুর বুক। নিজেকে অনেক কষ্টে সামলে সে বললে, 'নরেন, সত্যি করে বলো, তুমি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছ না তো?'

নরেন্দ্র বললে, 'ছি টুনু, এমন কথা নিয়ে কেউ কখনও ঠাট্টা করতে পারে?'

নিজের দুই হাতে নরেন্দ্রের হাত চেপে ধরে টুনু হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, 'আমার মাকে, আমার বাবাকে তাহলে তুমি দেখেছ? আমি কাঠুরের মেয়ে হয়ে বনবাসে আছি, তাঁরা তা জানতে পেরেছেন? তাঁরা আবার আমাকে ফিরিয়ে নেবেন?' বলতে বলতে টুনুর দুই চোখ ভরে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রুজল গাল বেয়ে ঝরতে লাগল।

নরেন্দ্র বললে, 'শান্ত হও টুনু, শান্ত হও। আমি এখনও তাঁদের চোখে দেখিনি। আমি এখনও তাঁদের তোমার খবর দিতে পারিনি। তবে, তাঁরাই যে তোমার মা আর বাবা, সে বিষয়ে আমার কোনওই সন্দেহ নেই।'

টুনু বললে, 'তাহলে তুমি এখুনি আমাকে তাঁদের কাছে নিয়ে চলো।'

'তা হয় না টুনু, সে এখান থেকে অনেক দূর। অন্তত পঁচিশ মাইলের কম নয়।'

টুনু দৃঢ়স্বরে বললে, 'হোক গে পঁচিশ মাইল, আমি ঠিক হেঁটে যেতে পারব। তুমি জানো না নরেন, এখনও আমি রোজই স্বপ্নে আমার বাবাকে আর মাকে দেখতে পাই। দেখি আর কাঁদি, দেখি আর কাঁদি।' তার চোখ দিয়ে বেরিয়ে এল আবার নতুন কান্নার ধারা। কাঁদতে কাঁদতে এবং সেইসঙ্গে আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছতে মুছতে সে আবার বললে, 'নিজের বাবা আর মাকে কখনও কি ভোলা যায় নরেন! কখনও ভোলা যায় না।'

নরেন্দ্র কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। তারপর ধীরে ধীরে বললে, 'তোমাকে আজ আমি আর একটা কথা বলতে এসেছি।'

টুনু বললে, 'এত বড়ো খবরের পর তুমি আবার আরও কী কথা বলতে চাও?'

নরেন্দ্র একটুও ইতস্তত করলে না। সহজ স্বরে, স্পষ্ট ভাষায় বললে, 'টুনু, তুমি আমাকে বিয়ে করবে?'

টুনু সবিস্ময়ে খানিকটা পিছনে সরে গেল। তারপর মৃদুকণ্ঠে বললে, 'এ কী কথা বলছ নরেন?'

নরেন্দ্র বললে, 'আমি তোমাকে সোজা জিজ্ঞাসা করছি, তুমি সোজা জবাব দাও। তুমি আমাকে বিয়ে করতে রাজি আছ?'

'তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে কেমন করে?'

'কেন?'

'তুমি কী জাত আর আমি কী জাত? তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে কেমন করে?'

নরেন্দ্র হেসে ফেলে বললে, 'বনে থাকো কাঠুরের ঘরে। লেখাপড়া নিশ্চয়ই জানো না।

সমাজের কথাও কিছুই শোনোনি। আমি ভাবছি না, তবু তুমি জাতের ভাবনা ভাবছ? শোনো টুনু! ও কথা নিয়েও তোমাকে আর মাথা ঘামাতে হবে না। এটাও আমি জেনেছি যে তোমরা আর আমরা হচ্ছি একই জাতের। তোমরাও বামুন, আমরাও বামুন।'

টুনু কী ভাবতে লাগল নতমুখে। তারপর মুখ তুলে ধীরে ধীরে বললে, 'আমি শুনেছি, তুমি রাজার ছেলে। তুমিও হয়তো একদিন রাজা হবে। তোমার সঙ্গে বিয়ে দিতে আমার মা-বাবাও নিশ্চয়ই নারাজ হবেন না; কিন্তু—'

'আবার একটা কিন্তু কেন টুনু? এখন তুমি রাজি আছ কি না, সেই কথাই বলো।'

টুনুর মুখে ফুটে উঠল লজ্জার রাঙা রং এবং সঙ্গে সঙ্গে অস্ফুট একটি হাসির ভাব। তারপর অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বললে, 'নরেন, তোমাকে কি আমি না বলতে পারি!'

বিপুল আনন্দে নরেন্দ্রে মুখ চোখ আর সর্বাঙ্গ হয়ে উঠল প্রফুল্ল। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে সে বললে, 'টুনু, টুনু! তাহলে এখনই তুমি চলো আমার সঙ্গে আমার বাড়িতে।'

'তোমার বাড়িতে!'

'হ্যাঁ টুনু! তুমি যখন আমার কথায় রাজি হয়েছ, তখন এখানে তোমাকে আর আমি এক মিনিটও থাকতে দেব না। রাঘব ডাকাত মারা গিয়েছে, কিন্তু তার প্রকাণ্ড দলবলের অনেকেই এখনও বেঁচে আছে। তারা যখন তাদের সর্দারের পরিণামের কথা শুনবে, তখন নিশ্চয়ই আবার এসে তোমাদের উপরে হানা দেবে। তখন তাদের প্রতিহিংসা থেকে তুমিও বাঁচবে না, দুখিরাম আর পার্বতীও বাঁচবে না। আমি এখনই তোমাদের এখান থেকে নিয়ে যেতে চাই। ভয় নেই, খালি তোমাকে নয়, দুখিরাম আর পার্বতীকেও। আমি তাদের আশ্রয় দেব। তারা বড়ো ভালো লোক। আমি তাদের সারা জীবনের ভাবনা ভুলিয়ে দেব। এর পরেও তোমার আর কোনও আপত্তি থাকতে পারে টুনু?'

টুনু শোনা যায় কি না-যায় এমন স্বরে বললে, 'না নরেন, আমার আর কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু বিয়ের আগে আমার হারিয়ে যাওয়া মা-বাবাকে কি দেখতে পাব না?'

নরেন্দ্র বললে, 'নিশ্চয়ই! আমার বাড়িতেই তুমি তাঁদের দেখা পাবে। তোমার বাবাই তো তোমাকে সম্প্রদান করবেন।'

ঠিক সেই সময় গদাই-লশকরি চালে রুনু এসে হাজির। সে একবার টুনুর মুখের দিকে তাকালে। তারপর শুঁড় দিয়ে তার একটা হাত ধরে টান মারতে লাগল। তার মনের ভাবটা বোধ হচ্ছে এইরকম: 'কই গো খুকুমণি, আজ তিন-চার দিন তুমি আমার সঙ্গে বেড়াতে যাওনি! আজও বেলা বাড়ছে, তুমি কি আজও বেড়াতে যাবে না?'

টুনু তার মনের ভাব বুঝে হেসে হাতখানা ছাড়িয়ে নিয়ে বললে, 'না রে রুনু, বনের ভিতরে আর আমি বেড়াতে যাব না। বনের ভিতরে বড়ো ভয়! জন্তুর ভয় না, মানুষের ভয়। নরেন আমাকে বেড়াতে যেতে বারণ করেছে।'

রুনু তবু ছাড়ে না, আবার তাকে ধরে টানাটানি করে। বনের ভিতরে টুনুর সঙ্গ তার ভারী ভালো লাগে। যতক্ষণ টুনু তার সঙ্গে থাকে, সারা দিন-রাতের ভিতরে সেই সময়টুকুই সে সবচেয়ে উপভোগ করে।

বেগতিক দেখে শেষটা টুনু ছুটে পালিয়ে গেল নাছোড়বান্দা রুনুর কাছ থেকে।

রুনু ম্রিয়মাণ ভাবে টুনুর পলাতক মূর্তির দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর টুনুকে যখন দেখা গেল না তখন ধীরে ধীরে একলাই ধরলে বনের পথ।

নরেন সকৌতুকে বললে, 'কী রে রুনু, তোর অভিমান হল নাকি রে?'

রুনু তার দিকে ফিরেও তাকালে না। তার কথার মানে বুঝতে পারলে কি না তাও বোঝা গেল না। খানিক এগিয়ে একটা মোড় ফিরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

॥ দ্বাদশ ॥

রুনুর গোয়েন্দাগিরি

সত্যই রুনুর মনে হয়েছিল অভিমান। দারুণ অভিমান। টুনু আর তার সঙ্গে বেড়াতে আসে না, টানাটানি করলেও ছুটে পালিয়ে যায়, এতে গাধারই অভিমান হবার কথা, আর সে হচ্ছে বুদ্ধিমান জীব, হাতি। আমরা মানুষ, আমরা যুক্তি দিয়ে মনকে বোঝাতে পারি। কিন্তু যাকে ভালোবাসি সে কথা না শুনলে আমাদেরও মনে কম অভিমান হয় না। হয়তো তার কথা না শোনার, সে অবাধ্য হওয়ার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকতে পারে, কিন্তু সব সময় আমরাও সেটা বুঝতে পারি না, এবং মনে মনে আহত না হয়েও থাকতে পারি না।

রুনু আজ সাত দিন টুনুকে দেখতে যায়নি। সারাদিন সরোবরের ধারে গিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে, সেই রোজ যেখানে বসে হাতিদের সভা। রুনু কিন্তু তাদের সঙ্গেও মেশে না। অন্য দিকে তাকিয়ে একলাটি মনে মনে কী যে ভাবে তা সেই জানে। যখন বেশি গরম বোধ হয়, মাঝে মাঝে জলে নেমে তিন-চারটি ডুব দিয়ে আবার উপরে উঠে আসে।

রুনুর হাবভাব দেখে অন্য হাতিরা বিস্মিত হয়। বাচ্চা হারালে হস্তিনীরা যে-রকম ব্যবহার করে, রুনুও সেই রকম ব্যবহার করছে দেখে অন্যান্য হাতিরা তার কারণ বুঝতে পারে না।

মাঝে মাঝে এক একটা কমবয়সি হাতি কৌতূহলী হয়ে রুনুর কাছে এসে দাঁড়ায়, বোধহয় তার দুঃখের কারণ জানবার জন্যে। কিন্তু রুনু তাদের মোটেই আমল দেয় না, উলটে খাপ্পা হয়ে তেড়ে মারতে যায়। কমবয়সি হাতিগুলো চটপট সরে পড়ে নিরাপদ ব্যবধানে।

তখন সরোবরের পূর্ব তীরে তার জল-জগতে দেখা যাচ্ছিল উদীয়মান সূর্যের রক্তমুখ। পৃথিবীর মাটির উপরে সূর্য উঠছে যত উপর দিকে, জলের ছায়াসূর্য নেমে যাচ্ছে ততই পাতালের দিকে। সরোবরের দিকে দিকে নানা জাতের জীব একে একে বা দলে দলে দেখা দিতে লাগল। বন্য বরাহ, বন্য মহিষ, ছোটো ও বড়ো জাতের হরিণ, শূকর, কুকুর

এবং হরেক রকম শিকারি ও নিরীহ পাখিরা। তারপর দল বেঁধে হাতিরাও এল খেলা করতে। একদিকে ডাঙার উপরকার ঝোপের ভিতর বসে একটা লোভী চিতাবাঘ উঁকিঝুঁকি মেরে বার বার তাকিয়ে দেখছে, জলপান করতে এসেছে কেমন নধর নধর হরিণগুলি। চিতাবাঘটা তাই দেখছে, আর বার বার জিভ দিয়ে চেটে নিচ্ছে নাক আর উপর-ঠোঁটটা। কিন্তু বাইরে বেরুবার ভরসা তার কিছুতেই হচ্ছে না, কারণ ওখানে দলে দলে চরছে মহিষ আর বরাহের দল। হতভাগাদের শিঙে আর দাঁতে যে কত ধার সেটা তার জানতে বাকি নেই।

আর একদিকের জঙ্গলের ধারে কেবল কান আর চোখ বার করে তাকিয়ে তাকিয়ে এদিকটা দেখছে গোটা-চারেক শেয়াল। তাদের দৃষ্টি চকাচকি ও অন্যান্য হাঁসদের দিকে। কিন্তু তাদেরও বুকের পাটা এত বড়ো নয় যে এমন সব বদমেজাজি জানোয়ারদের এড়িয়ে পেট ভরাবার চেষ্টা করবে।

এখানে মনের আনন্দে নির্বিবাদে শিকার করছে কেবল বক, আর মাছরাঙারা।

আমাদের পূর্বপুরুষদের অনেকগুলি দূরসম্পর্কীয় ভাই নানা গাছের ডালের উপরে এতক্ষণ চুপ করে বসে ছিল। হঠাৎ তারা চিতাবাঘটাকে আবিষ্কার করে ফেললে। তারপরেই গাছে গাছে জাগল সে কী বিষম উত্তেজনা ও দাপাদাপি, লাফালাফি! প্রায় শতাধিক বানরের কিচিরমিচির চিৎকারে পরিপূর্ণ হয়ে গেল সেখানকার আকাশ-বাতাস। সেখানে যত জানোয়ার ছিল সকলেরই দৃষ্টি এই বিশেষ ঝোপটার দিকে আকৃষ্ট হতে বিলম্ব হল না। একটা বাচ্চা হাতি কৌতূহলী হয়ে সেই ঝোপটা তদারক করতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার সাবধানি মা তাড়াতাড়ি জল থেকে উপরে উঠে শুঁড়ের বাড়ি দিয়ে বাচ্চাটাকে দিলে রীতিমতো এক ঘা। বন্য মহিষরা জোট বাঁধতে লাগল ঝোপটার দিকে সদলবলে যাত্রা করবে বলে। ব্যাপারটা মারাত্মক হয়ে উঠবার উপক্রম করছে দেখে চিতাবাঘটা এক লাফ মেরে ঝোপ থেকে বেরিয়ে পড়ে সাঁৎ করে জঙ্গলের ভিতরে মিলিয়ে গেল হলদে একটা বিদ্যুৎ-রেখার মতো। তারপর ধীরে ধীরে সেখানকার স্বাভাবিক অবস্থা আবার ফিরে এল। সেই স্তব্ধ সুনীল আকাশ, সেই শান্ত হরিৎ বনভূমি, সেই ঢলঢলে সরোবরের রোদমাখা সোনার জল।

কিন্তু এইসব শান্তি ও অশান্তির দৃশ্য দেখবার জন্যে রুনু আজ এখানে হাজির ছিল না। রাগ করে সাত দিন সে টুনুর সঙ্গে দেখা করেনি, কিন্তু আজ আর তার মন মানা মানল না কিছুতেই। সেই স্নেহের পুতলি আজ তাকে আবার টেনে নিয়ে চলল কঠিন আকর্ষণের টানে। বিষের মতো লাগছে তার চিরদিনের চেনা এই বনটাকে। কালো রাত্রির নিকষে ভোরের আলোর প্রথম সোনার আঁচল পড়বার আগেই রুনু আবার যাত্রা করলে টুনুদের সেই কাঠুরেপাড়ার দিকে। যেতে যেতে তার মনে হতে লাগল, আজ যেন অতিরিক্ত দীর্ঘ হয়ে উঠেছে এই বনের পথটা, যেন কিছুতেই আর শেষ হতে চায় না। পথে এক জায়গায় একটা বড়ো গাছ ভেঙে পড়ে রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছিল। বাধা দেখে অত্যন্ত অধীরভাবে সেই ভারী গাছটাকে সে শুঁড় দিয়ে জড়িয়ে ধরে তুলে একটানে পথ

থেকে সরিয়ে দিলে। গাছের তলায় নিশ্চিন্ত আরামে নিদ্রা দিচ্ছিল মস্ত একটা গোখরো জাতীয় সাপ। সে তৎক্ষণাৎ ফণা তুলে ক্রুদ্ধ গর্জন করে উঠল, কিন্তু পরমুহূর্তেই শুঁড়ের এক ঘা খেয়ে কোথায় যে ছিটকে গিয়ে পড়ল কিছুই বোঝা গেল না। উপর-উপরি এই দুই বিঘ্নের জন্য রুনুর মন আরও বেশি বিগড়ে গেল। তারপর সে ছুটতে আরম্ভ করল।

ওই দূর থেকে দেখা যাচ্ছে সেই বনটা, যার স্বচ্ছ ছায়ার তলায় আছে সেই ঘুমন্ত কাঠুরে গ্রামটি। বনের উপরে দেখা যাচ্ছে তিন-চারটে ধোঁয়ার রেখা। তারা প্রমাণ দিচ্ছে, রান্নার কাজে নিযুক্ত হয়েছে কাঠুরেদের গিন্নিরা। রুনু ভাবলে, এতক্ষণে টুনুর ঘুম নিশ্চয় ভেঙে গিয়েছে, খুব সম্ভব এখন সে ঘরের দাওয়ায় এসে বসে আমারই জন্যে অপেক্ষা করছে। টুনু হয়তো রাগ করে আজ আমাকে ধমক দেবে। কিংবা সে হয়তো অভিমান করে আমার সঙ্গে আজ কথাই কইবে না। নরেন বোধহয় এখনও আসেনি। এত সকাল সকাল সে এখানে এসে পৌঁছতে পারে না।

বেলগাছের পাশে সেই ঝোপটা। এইখানে বসেই টুনু আর নরেন রোজ গল্পসল্প করে। ঝোপের কাছে দাঁড়িয়ে রুনু কাঠুরেপল্লির দিকে দৃষ্টিপাত করলে। কিন্তু কই, টুনু তো ওখানে নেই! তার মা আর বাবাকেও দেখা যাচ্ছে না। পার্বতী তো এমন সময় রোজ দাওয়ায় বসে দুখিরামকে কাঁচালঙ্কা, তেঁতুল আর নুন দিয়ে পান্তাভাত খেতে দেয়। আরে, টুনুদের ঘরের সব দরজা-জানলা যে একেবারে বন্ধ! এমন ব্যাপার তো সে আর কোনওদিন দেখেনি! এ আবার কী হল?

রুনু তাড়াতাড়ি টুনুদের ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। বার-কয়েক চিৎকারও করলে, কিন্তু কারুর সাড়া পাওয়া গেল না। টুনুরা যদি কাঠুরেপাড়ার অন্য কারুর বাড়িতে গিয়ে থাকে এই আশায় সে একে একে প্রত্যেক ঘরটাই ভালো করে পর্যবেক্ষণ করে এল। তাকে দেখে কাঠুরেপাড়ার কেউ আর ভয় করে না। ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা 'রুনু, রুনু' করে ডেকে তার কাছে ছুটে এল। কাঠুরেদের কোনও কোনও বউ তাকে আদর করে খাবার জন্যে এটা ওটা সেটা এগিয়ে দিলে। কিন্তু আজ আর জাগ্রত হল না রুনুর ক্ষুধা। সকলে তাকে কী সব বলতে লাগল। তাদের কথায় বার বার টুনুর নাম শুনে রুনু বুঝলে, তারা তাকে টুনুর কথাই বলতে চায়। এইটুকু সে বুঝলে বটে, কিন্তু তার বেশি আর কিছুই বুঝতে পারলে না। তবে এই সত্যটা উপলব্ধি করতে তার বাকি রইল না যে টুনুদের কেউ আজ আর এখানে নেই।

কিন্তু নেই তো গেল কোথায়? অনেকক্ষণ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রুনু এই প্রশ্নের উত্তর পাবার চেষ্টা করলে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনওই ফল হল না। আস্তে আস্তে আবার সে ফিরে চলল। ফিরতে নারাজ পা গুলোকে কোনও রকমে টেনে টেনে সে অগ্রসর হতে লাগল। তখন তার শ্রান্ত, ক্লান্ত ও হতাশ মূর্তি দেখলে সত্য-সত্যই দুঃখ হয়।

রুনু বনের ভিতরে খানিকটা এগিয়ে গিয়েছে, এমন সময় পিছনে একটা শব্দ শুনে আবার সে ফিরে দাঁড়াল। দেখলে, বনের পথ ধরে আসছে টুনুর বাবা দুখিরাম। কিন্তু সে

একলা। তবে দুখিরাম যখন এসেছে একটু পরে টুনুও নিশ্চয় এসে দেখা দেবে। দুখিরাম যখন হাসতে হাসতে আসছে, টুনুর তখন বিপদ-আপদ কিছু হয়নি। রুনু হাসতে পারে না বটে, কিন্তু সুখ বা আনন্দ না হলে মানুষ যে হাসে না এ জ্ঞানটুকু তার বেশ আছে।

দুখিরাম রুনুকে দেখতে পেলে না। নিজের মনেই হাসতে হাসতে সে ঘরের দিকে এগিয়ে চলল। রুনু সেইখানে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

ওদিকে দুখিরামকে দেখে কাঠুরেদের এক মোড়ল শুধোলে, 'কী গো দুখিরাম, হঠাৎ তুমি যে ফিরে এলে?'

দুখিরাম হেসে জবাব দিলে, 'ভায়া, পার্বতী ভুলে তার পায়জোড়জোড়া ফেলে গিয়েছে। সেইটে নিয়ে যেতে এলুম আর কী!'

দুখিরাম নিজের ঘরের দরজা খুলে ভিতরে গিয়ে ঢুকল। খানিক পরে বাইরে এসে দরজায় কুলুপ লাগিয়ে আবার অবলম্বন করলে বনের পথ।

দুখিরাম এলই বা কেন, আবার চলেই বা যাচ্ছে কেন? এর কারণ ধরতে না পারলেও একটা কথা রুনু অনুমান করতে পারলে। দুখিরামের পিছনে পিছনে গেলে নিশ্চয়ই সে আবার পাবে টুনুর দেখা। সে-ও তখন তাকে অনুসরণ করতে লাগল। তার মনে জাগল একটা অদ্ভুত সন্দেহ। হয়তো দুখিরাম চায় না যে টুনুকে নিয়ে সে বনে বনে ঘুরে বেড়ায়। হয়তো ইচ্ছা করেই তারা টুনুকে তার কাছ থেকে লুকিয়ে ফেলেছে। পিছনে পিছনে সে যাচ্ছে, হয়তো এটা জানতে পারলে দুখিরামও তাকে ফাঁকি দিয়ে সরে পড়বার চেষ্টা করবে। অতএব, সে যে পিছু নিয়েছে, দুখিরামকে কিছুতেই এটা জানতে দেওয়া হবে না।

॥ ত্রয়োদশ ॥

রুনু-টুনুর শেষ অ্যাডভেঞ্চার

জমিদারবাড়িতে আজ ভারী ধূমধাম।

বাড়ির দিকে দিকে উড়ছে রঙিন নিশান, নহবতখানায় সানাই ধরেছে সাহানা রাগিণী, অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে যাচ্ছে বহুজনের কণ্ঠে আনন্দ-কলরব।

বাড়ির পাশের ময়দানে খাটানো হয়েছে মস্ত বড়ো শামিয়ানা, এবং সর্বাঙ্গে তার পুষ্পপল্লবের অলঙ্কার। শামিয়ানার তলায় ধবধবে সাদা বিছানার উপরে বসে আছে ভালো ভালো পোশাক পরে দলে দলে লোক। লাল রঙে ছোপানো কাপড় পরে চাকর ও দরোয়ানরা ব্যস্তভাবে আনাগোনা করছে এখানে ওখানে সেখানে। ভারে ভারে দই, ক্ষীর এবং খাবারের থালা নিয়ে লোকের পর লোক জমিদারের বাড়ির ভিতরে গিয়ে ঢুকছে। ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা রংচঙে জামা ও ইজের পরে ঘোরাফেরা করছে সগর্বে। খানিক তফাতে আস্তাকুঁড়ের উপরেও পুঞ্জীভূত হয়ে রয়েছে হরেক রকম খাবারের ফেলে-দেওয়া অংশ।

সেখানে বসেছে কুকুরদের ভোজন-সভা। কিন্তু সেখানে কেবল ভোজনই চলছে না, তর্জন-গর্জন ও কামড়া-কামড়িও চলছে দস্তুরমতো। চালাক কাকগুলো কিছু তফাতে বসে আছে রীতিমতো সতর্ক হয়ে, এবং একটু ফাঁক পেলেই টপ টপ করে খাবারের টুকরো তুলে নিয়ে উড়ে গিয়ে বসছে গাছের ডালে। কোনও কোনও কাক খাবার ফাঁক না পেয়ে বিষম চটে যাচ্ছে এবং কম-সতর্ক কুকুরগুলোর ল্যাজ কামড়ে দিয়ে অথবা মাথায় ঠোকর মেরে নিরাপদ ব্যবধানে চলে যাচ্ছে।

কাল রাত্রে নরেনের সঙ্গে টুনুর বিবাহ হয়ে গেছে। আজ তাদের বাসি বিয়ে।

উঠানের উপরে ছাঁদনাতলায় দাঁড়িয়ে রয়েছে চেলির কাপড় পরা ও গাঁট-ছড়া-বাঁধা বর ও বধূ। দুজনকে কী চমৎকারই মানিয়েছে! আর সবচেয়ে দেখতে মিষ্টি লাগছে টুনুর হাসি হাসি মুখে লজ্জার গোলাপি রংটুকু। এয়োরা উলুরব তুলে বর ও বধূকে বেষ্টন করে বরণ করছেন এবং তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে খুশিমুখ হচ্ছে টুনুর গর্ভধারিণী সুরমার। কিছু দূরে দাঁড়িয়ে আছেন আর-একটি ভদ্রলোক। তাঁরও মুখে আনন্দের হাসি থাকলেও তাঁর চোখেও দেখা যাচ্ছে দুয়েক ফোঁটা অশ্রুজল। তিনি আর কেউ নন, টুনুর পিতা অসিত। কত কাল পরে হারা-মেয়েকে ফিরে পেয়েছেন, তাই অতি আনন্দে মনের আবেগে মাঝে মাঝে পাচ্ছে তাঁর কান্না।

আচম্বিতে বাইরে উঠল একটা ভয়ানক গোলমাল। চারিদিকে শোনা গেল ছুটোছুটি হুটোপুটির শব্দ। ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা আতঙ্কগ্রস্ত মুখে বাহির থেকে বাড়ির ভিতরে পালিয়ে আসতে লাগল দলে দলে।

তারপরেই শোনা গেল আরও কতগুলো চিৎকার—

'পালাও, পালাও!'

'খ্যাপা হাতি, খ্যাপা হাতি!'

'ওরে, পালিয়ে আয় রে, পালিয়ে আয়! হাতিটা যে রাজবাড়ির দিকে ছুটে আসছে রে!'

সচমকে নরেন চাইলে টুনুর মুখের পানে, এবং টুনু চাইলে নরেনের মুখের দিকে। ব্যাপারটা বুঝতে তাদের একটুও দেরি হল না। এ নিশ্চয়ই রুনুর কীর্তি! কিন্তু সে রাজবাড়ির ঠিকানা জানলে কেমন করে?

বাইরে হঠাৎ গুড়ুম গুড়ুম করে পাঁচ-পাঁচ বার বন্দুকের আওয়াজ হল।

আর একজন কে চেঁচিয়ে উঠল, 'আর ভয় নেই! পাগলা হাতিটা গুলি খেয়ে মাটির উপরে পড়ে গিয়েছে!'

টুনুর সারা মুখখানা মড়ার মতো সাদা হয়ে গেল এক মুহূর্তে। প্রাণপণে চিৎকার করে সে কেঁদে উঠল। তারপর ক্ষিপ্রহস্তে গাঁটছড়া খুলে ফেলে পাগলের মতো ছুটে বেরিয়ে গেল বাড়ির বাইরের দিকে। এবং তার পিছনে পিছনে ছুটল নরেন্দ্রও। সবাই আড়ষ্ট, বিস্মিত, হতভম্ব!

শামিয়ানার পাশে রক্তাক্ত মাটির উপরে চার পা ছড়িয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে পড়ে আছে রুনু। তার দেহের নানা জায়গা দিয়ে হু হু করে বেরিয়ে আসছে রক্তের ধারা। দেখলে মনে হয়,

দেহে তার প্রাণ নেই। 'রুনু! রুনু! আমার রুনু! ওরে রুনু রে!' কাঁদতে কাঁদতে এই বলে চেঁচিয়ে উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে টুনু ছুটে গিয়ে রুনুর গায়ের উপর আছড়ে লুটিয়ে পড়ল।

কিন্তু তখনও রুনু মরতে পারেনি—বোধহয় টুনুকে একবার শেষ দেখা দেখবার জন্যে।

টুনুর কণ্ঠস্বর পেয়েই তার কানদুটো নড়ে নড়ে উঠল। ধীরে ধীরে একটুখানি মুখ তুলে চোখ খুলে একবার সে টুনুর মুখের পানে তাকিয়ে দেখলে। ধীরে ধীরে শুঁড় তুলে টুনুর কণ্ঠদেশ একবার জড়িয়ে ধরলে। পরমুহূর্তেই তার মাথাটা অবশ হয়ে ধপাস করে মাটির উপর পড়ে গেল। তার দেহ একেবারে আড়ষ্ট। টুনুকে দেখতে দেখতে রুনুর মৃত্যু হল।

সকলে যখন রুনুর রক্তাক্ত মৃতদেহের উপর থেকে টুনুকে টেনে তুললে তখন সে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে।

মানুষের গন্ধ পাই

'মানুষের গন্ধ পাই' গ্রন্থটির প্রথম প্রকাশ ঘটে এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স থেকে।

॥ এক ॥

রেলপথের কাজে কোনও বাধা-বিঘ্ন ছিল না—বেশ শান্তিতে দিন কাটছিল।

কিন্তু এ আরাম বেশিদিন আর ভোগ করতে হল না। হঠাৎ একদিন অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে আমাদের সুখের ঘুম গেল চমকে।

দুটো মানুষখেকো সিংহ এসে আচম্বিতে বিপুল-বিক্রমে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে। এই যুদ্ধ শেষ করতে সুদীর্ঘ নয় মাস কাল কেটে গিয়েছিল। মাঝে তাদের অত্যাচার এমন বেড়ে ওঠে যে, প্রায় তিন হপ্তা ধরে হাজার হাজার লোক রেলপথের কাজ বন্ধ করে অলস ভাবে বসে থাকতে বাধ্য হয়েছিল।

দেখতে দেখতে সিংহরা মানুষ-ধরা কাজে এমনি পাকা হয়ে উঠল যে, কোনও বাধাকেই আর বাধা বলে, কোনও বিপদকেই আর বিপদ বলে মানত না। প্রতি রাত্রেই তাঁবুর ভিতর থেকে মানুষের পর মানুষ অদৃশ্য হতে লাগল—আমাদের সমস্ত সাবধানতাই তাদের অদ্ভুত চালাকির কাছে ব্যর্থ হয়ে গেল।

কুলিরা বলতে লাগল, জঙ্গল থেকে রোজ রাত্রে যারা এখানে হানা দিতে আসে আসলে তারা সাধারণ জানোয়ার নয়, তারা হচ্ছে আফ্রিকার বুনো মানুষদের প্রেতাত্মা, তাদের দেশের বুকে বিলিতি রেলের লাইন বসেছে দেখে তারা চটে গেছে, তাই সিংহের মূর্তি ধারণ করে রোজ আমাদের ঘাড় ভাঙতে আসে। তারা অবধ্য,—বন্দুকের গুলি তাদের গায়ে লাগে না। তারা অমর, গুলি খেয়েও তারা মরে না। ইত্যাদি।

পরে পরে কয়েকজন কুলি অদৃশ্য হল। প্রথম প্রথম আমি ভাবতুম যে, কুলিদের দলে নিশ্চয়ই কোনও দুষ্ট লোক আছে। তারাই টাকার লোভে তাদের খুন করে জঙ্গলের ভিতরে গিয়ে লাশ ফেলে দিয়ে আসে। কিন্তু আমার এ সন্দেহ যে ভুল, শীঘ্রই তার প্রমাণ পেলুম।

সাভোয় পৌঁছোবার প্রায় হপ্তা-তিনেক পরে, একদিন সকালে বিছানা ছেড়ে উঠেই শুনলুম, কাল রাতে সিংহরা এসে তাঁবুর ভিতর থেকে জমাদার অঙ্গন সিংকে ধরে নিয়ে গিয়ে ফলার করেছে।

অঙ্গন সিং হচ্ছে একজন লম্বা-চওড়া জোয়ান শিখ। গতিক তো বড়ো সুবিধের নয়! তাড়াতাড়ি উঠে অঙ্গন সিং-এর তাঁবুর দিকে অগ্রসর হলুম।

তাঁবুর আশেপাশে বালির উপরে রয়েছে স্পষ্ট সিংহের পায়ের দাগ! সে দাগ বরাবর বনের ভিতরে চলে গিয়েছে। বুঝলুম, কুলিরা মিথ্যা বলে না। সিংহরাই তাদের সঙ্গে শয়তানি করছে বটে।

অঙ্গন সিং-এর তাঁবুতে আরও বারোজন কুলি বাস করত। রাত্রের ভীষণ কাণ্ড তারা স্বচক্ষে দেখেছে। তাদেরই মুখে সমস্ত শুনলুম।

জমাদার অঙ্গন সিং তাঁবুর খোলা দরজার কাছেই শুয়ে ঠান্ডা হাওয়ায় খুব আরাম করে ঘুমোচ্ছিল। মাঝ-রাতে হঠাৎ আমরা দেখলুম, একটা মস্ত সিংহ তাঁবুর ভিতরে মুখ বাড়িয়ে জমাদারের গলাটা হাঁ করে দাঁতে চেপে ধরলে।

জমাদার বলে উঠল, 'ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও—' বলেই সে দুই হাতে সিংহের গলা জড়িয়ে ধরলে।

—পরমুহূর্তেই জমাদারকে নিয়ে সিংহটা অন্তর্হিত হল। ভয়ে তখন আমাদের হাত-পা হিম হয়ে গেছে! কাঁপতে কাঁপতে শুনলুম, সিংহের সঙ্গে জমাদারের বিষম লড়াইয়ের ঝটাপটি শব্দ! জমাদার সহজে কাবু হয়নি। কিন্তু কী করবে সে? সিংহের সঙ্গে মানুষ কখনও যুঝতে পারে?'

এই ভয়ানক গল্প শুনে কাপ্তেন হ্যাসলেমকে নিয়ে আমি সিংহের পায়ের দাগ ধরে জঙ্গলের ভিতরে অগ্রসর হলুম। সিংহটা যেখানে যেখানে দাঁড়িয়েছে, সেইখানেই রক্তের স্রোতে জমি তখনও ভিজে রাঙা হয়ে আছে।

তারপরেই বনের ভিতরে এক জায়গায় গিয়ে দেখলুম, সে কী দৃশ্য! দুঃস্বপ্নেও তা কল্পনা করা যায় না! চারিপাশকার জমি রক্তে আরক্ত এবং মাংস আর হাড়ের টুকরোয় ভরা। জমাদারের দেহ আর নেই বটে, কিন্তু হতভাগ্যের দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন মুণ্ডটা তখনও আস্ত অবস্থায় মাটির উপরে বসানো রয়েছে! মুণ্ডের চোখ দুটো বিস্ফারিত—তার মধ্যে সচকিত আতঙ্ক-ভরা দৃষ্টি তখনও স্তম্ভিত হয়ে আছে।

জমির চারিদিকেই ধ্বস্তাধ্বস্তির চিহ্ন দেখলেই বেশ বোঝা যায়, জমাদার-বেচারার দেহ নিয়ে দু-দুটো সিংহ পরস্পরের সঙ্গে কামড়া-কামড়ি ও টানা-হ্যাঁচড়া করেছে।

এমন বীভৎস দৃশ্য আমি আর কখনও দেখিনি।......জমাদারের দেহের টুকরো-টাকরা যা পাওয়া গেল, আমরা তখনই তা সংগ্রহ করে মাটির ভিতরে গোর দিলুম—এবং যতক্ষণ আমরা এই কার্যে নিযুক্ত ছিলুম, ততক্ষণই সেই বুক-চমকানো কাটামুণ্ডটা তার স্থির, ভীত দৃষ্টি দিয়ে যেন আমাদের প্রত্যেক গতিবিধি লক্ষ করতে লাগল। সে-মুণ্ডকে গোর দিতে পারলুম না—কারণ শনাক্ত করবার জন্যে ডাক্তারের কাছে তাকে হাজির করতে আমরা বাধ্য।

মানুষখেকো সিংহের নিষ্ঠুরতার সঙ্গে এই আমার প্রথম পরিচয়। .....এবং সেইখানে দাঁড়িয়ে তখনই আমি প্রতিজ্ঞা করলুম যে, অতঃপর এই শয়তানদের শাস্তি দেওয়াই হবে আমার জীবনের প্রধান কর্তব্য। কিন্তু তখনও আমি জানতুম না যে, আমার কর্তব্য কত কঠিন ও বিপজ্জনক এবং কতবার আমার অবস্থা হবে অভাগা অঙ্গন সিং-এরই মতন ভয়ানক!

জমাদার অঙ্গন সিং-এর তাঁবুর কাছাকাছি একটু গাছের উপর বন্দুক নিয়ে উঠে সেই রাত্রেই আমি বাসা বাঁধলুম। সিংহেরা যে-তাঁবুর ভিতর থেকে খোরাক পেয়েছে, রাতে হয়তো খিদের চোটে আবার সেইখানেই এসে হানা দেবে, এই হচ্ছে আমার আশা। যে-সব কুলি খুব বেশি ভয় পেয়েছে, তারাও আমার সঙ্গে গাছের ডালে বসে রাত কাটাবে বলে কাকুতি-মিনতি করতে লাগল। আমিও সম্মতি দিলুম।......

নিশুতি রাত। আচম্বিতে ঘন ঘন সিংহগর্জনে সমস্ত অরণ্য থর থর করে কাঁপতে লাগল। আমিও বন্দুক নিয়ে প্রস্তুত হয়ে রইলুম—অন্তত আজ ওদের একটারও মানুষ

খাবার সাধ যে চিরদিনের জন্যে মিটিয়ে দিতে পারব, এ-বিষয়ে আমার মনের বিশ্বাস প্রবল হয়ে উঠল।

সিংহের গর্জন ক্রমেই কাছে এগিয়ে আসছে—কাছে, আরও কাছে! তারপর হঠাৎ সব চুপচাপ। ঘণ্টাদুয়েক আর তাদের কোনও সাড়া নেই।

আমার জানা ছিল, সিংহেরা যখন শিকার করতে উদ্যত হয়, তখন তারা আর কোনও শব্দই করে না।

কোথাও কিছু নেই, অকস্মাৎ আধ-মাইল দূর থেকে বিষম এক গোলমাল জেগে উঠে রাতের অন্ধকার আকাশকে যেন অস্থির করে তুললে।...

...সিংহ যে আবার আজ নতুন শিকার সংগ্রহ করেছে সে বিষয়ে আর আমার কোনও সন্দেহই রইল না। আজকের মতো গাছে বসে রাত্রিবাসই ব্যর্থ হল—কারণ শত্রু আমার নাগালের বাইরে!

পরদিন প্রভাতেই খবর এল, আমার আর-একজন কর্মচারীর দেহ সিংহের উদরে সমাধিলাভ করেছে।

কাল সারা রাত ঘুম হয়নি—আজকের রাতটা বিশ্রাম করলুম।

তারপরের রাতে আবার নতুন ঘটনাস্থলের কাছেই আর একটা গাছের উপরে গিয়ে আশ্রয় নিলুম। গাছের তলায় একটা জ্যান্ত ছাগলকে বেঁধে রাখলুম—লোভে পড়ে সিংহটা নিশ্চয়ই তার ঘাড় মটকাতে আসবে।

গাছে চড়ে ভালো করে বসতে না বসতেই টিপ টিপ বৃষ্টি শুরু হল। আমার কাপড়-চোপড় ও দেহ ভিজে ন্যাতনেতে হয়ে গেল, তবু আমি সতর্ক হয়ে রইলুম।

কিন্তু বৃথা! গভীর রাতে দূর থেকে আবার এক মর্মান্তিক আর্তনাদ জেগে উঠল,—আমি বুঝলুম, পশুরাজ আবার আজ নতুন নরবলি দিলে! গাছের ডালে বসে নিরুপায় হয়ে নিজের হাত আমি নিজেই কামড়াতে লাগলুম।

কুলিদের তাঁবুগুলো প্রায় আট মাইল জায়গা জুড়ে ছড়ানো ছিল। কাজেই কবে, কখন, কোথায় যে সিংহেরা এসে হানা দেবে, এটা স্থির করা সম্ভবপর ছিল না। তাদের চালাকি দেখে অবাক মানতে হয়। তারা উপর-উপরি দু-রাত্রি কখনও একই তাঁবুকে আক্রমণ করত না।

প্রথম প্রথম তারা সব-সময়েই যে সফল হত, তাও নয়। এক রাতে একজন ভারতীয় ব্যাপারী কুলিদের তাঁবুতে আসছিল, একটা গাধার পিঠে মোটমাট চাপিয়ে। অন্ধকারের ভিতর থেকে—বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো—হঠাৎ এক সিংহ তাদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল, তার বিপুল দেহের ধাক্কায় গাধা আর মানুষ দুই-ই হল কুপোকাত!

কিন্তু একগাছা মোটা দড়িতে বাঁধা ছিল দুটো টিনের খালি কানাস্তারা এবং সিংহের থাবাতে গেল আটকে সেই দড়িগাছা। খালি কানাস্তারা মাটির উপরে আছড়ালে কী বেজায় আওয়াজ হয়, তোমরা তা শুনেছ বটে, কিন্তু সিংহ তা কখনও শোনেনি। দড়ি থেকে থাবা ছাড়াবার জন্যে সিংহ যতই টানাটানি করে, কানাস্তারা ততই ঝনঝনিয়ে বেজে ওঠে! সিংহ

ভাবলে, বাপরে, এ আবার কী নতুন জানোয়ারের চিৎকার! পেটের খিদে তার মাথায় চড়ে গেল, প্রাণের ভয়ে তখনই ল্যাজ গুটিয়ে সে দিলে চটপট চম্পট! ইতিমধ্যে সেই ব্যাপরী খুব ঢ্যাঙা এক গাছের মগডালে উঠে গিয়ে থর থর করে কাঁপতে লাগল। বলা বাহুল্য, পরের দিন সকালের আগে সে আর মাটির উপরে পা দেয়নি।

এমনি মজার ঘটনা আরও দু-একটা ঘটেছিল। আর একবার সিংহরা একটা তাঁবুতে মানুষ ধরতে এসে ভুল করে চালের একটা বস্তা টেনে নিয়ে গিয়েছিল। আর এক রাতে তারা তোশক-সুদ্ধ একজন গ্রিক কন্ট্রাক্টরকে টেনে নিয়ে যায়। কিন্তু বনের ভিতরে গিয়ে দেখলে, দুষ্টু মানুষটা কোনও ফাঁকে তোষক থেকে উঠে চুপিচুপি লম্বা দিয়েছে।

কিন্তু পরে তারা আর ভুল করত না। তাঁবুর দরজা বন্ধ করে চারিদিকে কাঁটাঝোপ দিয়ে এবং আগুন জ্বালিয়ে—কোনওরকমেই আর তাদের ঠেকিয়ে রাখতে পারা যেত না; শত শত লোক আকাশ-ফাটানো চিৎকার এবং বন্দুকের আওয়াজ করেও বা জ্বলন্ত কাঠ ছুড়েও তাদের আর হটাতে পারত না,—কোনও কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ না করেই তারা আমাদের দল থেকে মানুষের পর মানুষ ধরে নিয়ে যেতে লাগল।

॥ দুই ॥

এই মানুষ-শিকারের সময়ে আমি কিন্তু বিশেষ কোনও সাবধানতা অবলম্বন করিনি। আমার তাঁবু ছিল একেবারে খোলা জায়গায় এবং তার চারদিকে সিংহদের বাধা দিতে পারে, এমন কোনও কাঁটাঝোপের বেড়া পর্যন্ত ছিল না।

ও-অঞ্চলের ডাক্তার রস একদিন আমার আতিথ্য গ্রহণ করলেন। ......রাত্রে ঘুমোতে ঘুমোতে হঠাৎ আমাদের ঘুম ভেঙে গেল। মনে হল, বাইরে তাঁবুর দড়ির সঙ্গে কে যেন ঝটাপটি করছে। কিন্তু লন্ঠন জ্বেলে বাইরে গিয়ে কিছুই দেখতে পেলুম না। ......সকালে উঠে ভালো করে পরীক্ষা করবার সময়ে দেখা গেল, জমির উপরে সিংহের থাবার দাগ। বুঝলুম, ভাগ্যের জোরে কাল রাত্রে এ যাত্রা কোনওরকমে বেঁচে যাওয়া গেছে!

তখনই সেখান থেকে তাঁবু তুলে ফেললুম। এবং নদীর ধারে একখানা কুঁড়েঘর বানিয়ে সেইখানেই আড্ডা গাড়লুম। এবং ঘরের চারিদিকে খুব উঁচু ও পুরু কাঁটাঝোপের বেড়া লাগিয়ে দিলুম। আমার চাকর-বাকররা এই বেড়ার ভিতরে আশ্রয় নিলে। এবং সারারাত যাতে উজ্জ্বল আগুন জ্বলে, সে ব্যবস্থাও করা হল।

সন্ধ্যার সময়ে দিনের কাজ সাঙ্গ করে আমি কুঁড়ের বারান্দায় এসে বসতুম। কিন্তু সেখানে বসে কোনওরকম লেখাপড়া করবার জো ছিল না, কারণ সর্বদাই বুকটা ধুকপুক করত! কী জানি, সিংহমশাই কখন একলাফে পাঁচিল টপকে 'হালুম, তোমায় খেলুম' বলে ভিতরে এসে পড়েন, বলা তো যায় না! কাজে কাজেই বন্দুকটা সর্বদাই রাখতুম কাছে কাছেই। এবং থেকে থেকে ভয়ে ভয়ে বেড়ার ওপারে দৃষ্টিনিক্ষেপ করতুম, যেখানে স্থির ও

স্তব্ধ হয়ে আছে কালির মতো কালো ভয় ভরা ঘন অন্ধকার! এক-একদিন সকালে উঠে দেখতুম, বেড়ার ওপারে মাটির উপরে সিংহরা পদচিহ্ন রেখে গেছে! সৌভাগ্যক্রমে কোনওদিন তারা বেড়া ডিঙোবার চেষ্টা করেনি।

এর মধ্যে কুলিরাও তাদের তাঁবুর চারিদিকে কাঁটাঝোপের বেড়া তৈরি করে ফেলেছিল। কিন্তু তবু প্রতি দুই-তিন দিন অন্তরেই শোনা যেত, অমুক তাঁবু থেকে অমুক কুলিকে সিংহরা ধরে নিয়ে গেছে! দুই-তিন হাজার কুলি অনেকখানি জায়গা জুড়ে বাস করত, কাজেই এই দুর্ঘটনাও তাদের খুব বেশি বিচলিত করতে পারত না। কারণ তারা প্রত্যেকেই মনে করত, এত খোরাকের ভিতর থেকে সিংহের লোভ হয়তো তার উপরে পড়বে না। কিন্তু তারপর অধিকাংশ কুলি যখন অন্যত্র কাজ করতে চলে গেল অবং আমার সঙ্গে রইল মাত্র কয়েক শত কুলি, তখন সিংহের অত্যাচার হয়ে উঠল অত্যন্ত স্পষ্ট। কুলিরা এত ভয় পেলে যে, অনেক কষ্টে আমি তাদের কাজ করাতে পারতুম। তাদের তাঁবুর বেড়া আরও উঁচু করে দিলুম—এবং চারিদিকে আগুন জ্বালিয়ে রাখবারও ব্যবস্থা হল। জনকয়েক লোক বড়ো বড়ো গাছে চড়ে সারা-রাত অনেকগুলো কানাস্তারা নিয়ে এমন জোরে বাজাত যে, কান যেন কালা হয়ে যাবার মতো হত। কিন্তু তবু বেপরোয়া সিংহরা কিছুমাত্র গ্রাহ্য করত না—তাঁবুর ভিতর থেকে লোকের পর লোক অদৃশ্য হতে লাগল!

আমার কুঁড়েঘরের কাছ থেকে খানিক তফাতে ছিল হাসপাতাল-তাঁবু। তার চারিধারের বেড়া ছিল খুবই উঁচু আর মজবুত। কিন্তু তাতেও কোনও ফল হল না, সিংহরা সেই বেড়ার ভিতরেও একটা পথ তৈরি করে ফেললে।...এক রাত্রে সন্দেহজনক শব্দ শুনে হাসপাতালের সহকারী ডাক্তার বাইরে বেরিয়ে এসে দেখেন, মস্ত বড়ো একটা সিংহ তাঁর দিকে কটমট করে তাকিয়ে আছে! তাঁকে দেখেই সিংহ মারলে এক লাফ! ডাক্তার ভয়ে আঁতকে পিছনপানে একলাফে মেরে একেবারে পড়লেন গিয়ে একরাশ ডাক্তারি ওষুধ-পত্তরের মধ্যে! হুড়মুড় করে সমস্ত ভেঙে পড়ল এবং সেই বিষম শব্দে ভড়কে গিয়ে সিংহটা অন্যদিকে সরে পড়ল।

ডাক্তার সেবারের মতো বেঁচে গেলেন বটে কিন্তু সিংহটা খালি পেটে ফিরে যেতে রাজি হল না। সে হাসপাতালের আর একটা ঘরের ভিতরে গিয়ে হানা দিলে, সেখানে নয়জন রোগী শয্যাশায়ী ছিল। দুজন রোগীকে আহত করে, তৃতীয় রোগীর দেহকে সে কাঁটাঝোপের ভিতর দিয়ে হিড়হিড় করে টেনে বাইরে নিয়ে গেল। পরদিন সকালে গিয়ে দেখলুম, একটা তাঁবু ছিঁড়ে ভূমিসাৎ হয়েছে এবং তার তলায় পড়ে কাতরাচ্ছে দুই বেচারি আহত কুলি। সেইদিনই সেখান থেকে হাসপাতাল তুলে আর-একটা সুরক্ষিত জায়গায় স্থানান্তরিত করা হল।

শুনেছিলুম, সিংহরা প্রায়ই খালি-তাঁবুর ভিতরে বেড়াতে আসে। তাই রাত্রে তাদের অভ্যর্থনা করবার জন্যে আমি বন্দুক নিয়ে তৈরি হয়ে পরিত্যক্ত হাসপাতালের ভিতর বসে সিংহদের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলুম। কিন্তু গভীর রাত্রে স্তম্ভিত প্রাণে শুনলুম, নতুন হাসপাতালের ভিতর থেকে মর্মভেদী আর্তনাদ জেগে উঠল! বুঝলুম, শয়তানরা এবারেও আমাকে ফাঁকি দিলে।

সকাল হতে না হতেই ছুটলুম নতুন হাসপাতালের দিকে। সিংহটা কাল রাতে বেড়া টপকে ভিতরে এসেছে এবং এক বেচারি ভিস্তিকে নিয়ে অদৃশ্য হয়েছে! যে-সব কুলি স্বচক্ষে সমস্ত ঘটনা দেখেছে, তারা যা বললে তা হচ্ছে এই:

তাঁবুর ক্যাম্বিসের দেওয়ালের দিকে পা ছড়িয়ে ভিস্তি পরম আরামে ঘুমোচ্ছিল। কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ একটা সিংহ এসে তাঁবুর তলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ভিস্তির পা কামড়ে ধরে তাকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেল। হতভাগ্য ভিস্তি সিংহের কবল থেকে বাঁচবার জন্যে প্রথমে একটা সিন্দুক, তারপর তাঁবুর একগাছা দড়ি দুই হাতে প্রাণপণে চেপে ধরলে, কিন্তু মিথ্যা চেষ্টা! ভিস্তিকে তাঁবুর বাইরে টেনে নিয়ে গিয়ে সিংহটা তার পা ছেড়ে টুঁটি কামড়ে ধরে বারকয়েক ঝটকান দিতেই বেচারার সমস্ত আর্তনাদ চিরদিনের জন্যে থেমে গেল। তারপর বিড়াল যেমন ইঁদুরকে মুখে করে, তেমনিভাবে ভিস্তির দেহ মুখে করে সিংহটা কাঁটাঝোপের বেড়া ভেদ করে বাইরে বেরিয়ে গেল।

যেখান দিয়ে সিংহটা বাইরে বেরিয়ে গেছে, সেইখানে গিয়ে দেখলুম, কাঁটাঝোপের গায়ে ছেঁড়া কাপড়ের ও রক্তাক্ত মাংসের টুকরো লেগে রয়েছে। বাইরে খানিক তফাতেই ভিস্তির দেহাবশেষ পাওয়া গেল। দেহাবশেষ তো ভারী! মাথার খুলি, দু-খানা চোয়ালের ও দেহের খানকয় বড়ো বড়ো হাড়, হাতের খানিকটা অংশ—তাতে তখনও দুটো আঙুল সংলগ্ন রয়েছে এবং একটা আঙুলে একটা রুপোর আংটি! আংটিটা ভারতবর্ষে অভাগা ভিস্তির বিধবার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হল।

সেইদিন বৈকালেই খবর পাওয়া গেল, মাইল-তিনেক তফাতে দুটো সিংহের সাক্ষাৎ পাওয়া গেছে! প্রথমে তারা একজন কুলিকে ধরবার চেষ্টা করে। কিন্তু সেই কুলি ছিল তাদের চেয়েও চটপটে। সিংহদের দেখেই সে বিনাবাক্যব্যয়ে একটা মস্ত-লম্বা গাছের উপরে তড়বড় করে উঠে পড়ে। মানুষের দুষ্টুমিতে বেজায় বিরক্ত হয়ে সিংহ দুটো প্রস্থান করে বটে, কিন্তু কুলি-বেচারা ভয়ে আর গাছ থেকে নামতে পারে না। এমন সময়ে সেখান দিয়ে একখানা রেলগাড়ি যায়; তার এক কামরায় ছিলেন ট্রাফিক ম্যানেজার। তিনি জানলা থেকে সেই ভয়ে মরো মরো কুলিকে দেখতে পেয়ে তাকে উদ্ধার করেন।

তারপরেই দেখা যায়, সিংহ দুটো সাভো ইস্টিশানের কাছে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে।

তারপর রেলের ডাক্তার ব্রক সাহেব সন্ধ্যার অল্প আগে হাসপাতাল থেকে যখন ফিরছিলেন, তখন একজন কুলি দেখতে পায় যে, সিংহটা গুড়ি মেরে চুপিচুপি ব্রক সাহেবের পিছনে পিছনে আসছে।

সিংহেরা পাড়া-ছাড়া হয়নি শুনে আমি দ্বিতীয় হাসপাতালের সামনেই একখানা ঢাকা মালগাড়ি এনে রাখলুম এবং আশেপাশে গোটাকয় গোরুকেও বেঁধে রাখা হল—সিংহদের লোভ জাগাবার জন্যে। রাত্রে বন্দুক নিয়ে আমি সেই মালগাড়ির ভিতরে এসে ঢুকলুম এবং আমার সঙ্গে এলেন ব্রক সাহেব। তাঁকে ফলার করবার চেষ্টা করেছিল বলে ব্রক সাহেব যে সিংহের উপরে যার পর নাই খাপ্পা হয়েছিলেন, এ-কথা আর বলা বাহুল্য।

আবার সেই কালির মতো কালো, ঘন অন্ধকার! অরণ্যের নির্জনতা কী একঘেয়ে!

হাসপাতালের দিকে তাকিয়ে আছি বটে, কিন্তু চোখে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না,—অন্ধকার আমাদের অন্ধ করে দিয়েছে। এমনি ভাবে ঘণ্টাদুয়েক কেটে গেল।

আচম্বিতে ডানদিক থেকে শুকনো পাতার মড়মড়ানি শব্দ এল—বুঝলুম, কাছেই কোনও জানোয়ারের আবির্ভাব হয়েছে! তারপরেই ধুপ করে একটা অস্পষ্ট শব্দ, যেন হাসপাতালের কাঁটাঝোপের উপর দিয়ে একটা ভারী দেহ লাফিয়ে পড়ল। গোরুগুলো যে ব্যস্ত হয়ে ছটফট করছে, আওয়াজ শুনে তাও বোঝা গেল। তারপর আবার সব চুপচাপ—যেন পরিত্যক্ত শ্মশান!

আমি বললুম, 'মালগাড়ি থেকে নেমে আমি এবার মাটির ওপরে শুয়ে থাকি। তাহলে সিংহ এদিকে এলে তাকে দেখবার আমার সুবিধা হবে।'

কিন্তু ডাক্তার ব্রক মানা করলেন বলে আমি আর গাড়ি ছেড়ে নামলুম না। ভাগ্যে আমি নামিনি! কারণ পরেই টের পেলুম যে একটা নরখাদক সিংহ কাছেই আমাদের জন্যে ওত পেতে বসে আছে। নামলেই তারা আমাকে গপ করে গিলে ফেলত! আমরা যখন চোখ মেলে দেখছি খালি অন্ধকার, সে-বদমাইস তখন অন্ধকারের ভিতরে চোখ চালিয়ে বসে বসে ভাবছিল যে, কোনও কায়দায় আমাদের একজনকে সে গ্রেপ্তার করে পেটে পুরবে!

মনে হল, কেউ যেন চোরের মতো পা টিপে টিপে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে! তার দেহ যেন অন্ধকারের চেয়েও কালো।

এ কি আমার মনের ভুল? যে জমাট অন্ধকারটা এগিয়ে আসছে, তার দিকে বন্দুকের মুখ রেখে শুধালুম, 'মি. ব্রক! আপনি কি কিছু দেখতে পাচ্ছেন?'

ব্রক সাহেব কোনও জবাব দিলেন না।

আবার ক্ষণিকের জন্যে সমস্ত স্তব্ধ! এবং তারপরেই অন্ধকারের ভিতর থেকে প্রকাণ্ড একটা দেহ আমাদের দিকে লাফিয়ে পড়ল!

আমি চেঁচিয়ে উঠলুম, 'সিংহ!'—সঙ্গে সঙ্গে আমরা দুজনেই বন্দুকের ঘোড়া টিপলুম!

আর-একটু দেরি হলেই আর রক্ষে ছিল না—সে শয়তান তাহলে নিশ্চয়ই মালগাড়ির ভিতরে ঝাঁপিয়ে পড়ত! কিন্তু একসঙ্গে ডবল বন্দুকের আওয়াজে এবং বারুদের দপ করে জ্বলে ওঠা আগুনে ভয় পেয়ে সিংহটা তখনই সে-মুল্লুক ছেড়ে চম্পট দিলে!

পরদিন সকালে দেখা গেল, ব্রক সাহেবের বন্দুকের গুলি সিংহের একটা পদচিহ্নের পাশেই বালির ভিতরে গিয়ে প্রবেশ করেছে—আর এক ইঞ্চি এদিক দিয়ে এলেই গুলিটা ঠিক তার গায়ে লাগত। আমার বন্দুকের গুলির কোনওই খোঁজ পাওয়া গেল না।

নরখাদকের সঙ্গে এই আমার প্রথম মুখোমুখি পরিচয়!

॥ তিন ॥

মালগাড়ির সামনে বন্দুকের আগুনে আর আওয়াজে বোধহয় সিংহদের চোখ ঝলসে ও পিলে চমকে গিয়েছিল! কারণ অনেকদিন আর তাদের কোনওই খোঁজখবর পাওয়া গেল না। আমরা সবাই হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম। ব্রক সাহেবের আর প্রতিশোধ নেওয়া হল না, তিনি অন্য দেশে চলে গেলেন।

কিন্তু আমার কেমন সন্দেহ হল যে, সিংহদের এ সুবুদ্ধি বেশিদিন স্থায়ী হবে না। সুতরাং যদি তারা আবার এদিকে বেড়াতে আসে, তাহলে তাদের ভালো করে আদর করবার জন্যে আমি একটা মস্ত ফাঁদ বানিয়ে রাখলুম।

ফাঁদটা হল অনেকটা ইঁদুর-কলের মতো, তবে আকারে তার চেয়ে অনেক বড়ো। ফাঁদের ভিতরে রইল দুটো কামরা। একটা কামরায় থাকবে মানুষ, তাকে খাবার জন্যে সিংহ ভিতরে ঢুকলেই ফাঁদের দরজাটা যাবে দুম করে পড়ে। সিংহ অন্য কামরায় বন্দি হবে, মানুষের কোনওই ক্ষতি করতে পারবে না, কারণ দুটো কামরার মাঝে মোটা লোহার রেলিংয়ের পাঁচিল দেওয়া আছে।

মাস-কয় সিংহরা সাভোর কাছে আর এল না বটে, কিন্তু তাদের নিষ্ঠুর অত্যাচারের নিত্যনতুন কাহিনি আমাদের কানে আসতে লাগল। দশ-বারো মাইল তফাতে গিয়ে, রেললাইনের অন্যত্র, আবার তারা কুলিদের উপরে আক্রমণ শুরু করেছে। এবং অল্পদিনের মধ্যেই তাদের কবলে আবার কয়েকজন মানুষের প্রাণ গেল।

সাভোর কুলিরা কিন্তু নিরাপদ শান্তিতে কাল কাটাতে লাগল। তারা ধরে নিলে, শয়তানরা তাদের কথা ভুলে গেছে। নির্ভয়ে সবাই আবার কাজকর্মের যোগ দিলে।

তারপর অকস্মাৎ এক ঘুটঘুটে রাত-আঁধারে আমাদের সমস্ত আশা-ভরসা ফরসা হয়ে গেল! বিষম এক সোরগোলে আমাদের সকলকার ঘুম গেল ছুটে এবং সেই পরিচিত আর্তনাদে যখন রাতের আকাশ কেঁপে উঠল, তখন বুঝতে দেরি লাগল না যে, পশুরাজ আবার আজ নতুন পূজার বলি গ্রহণ করলে!

বেজায় গরম পড়েছে, তাঁবুর ভিতরে দম যেন বন্ধ হয়ে আসে। আর তো শয়তানের উপদ্রব নেই, অতএব তাঁবুর বাইরে গিয়ে একটু আরাম করে শুতে আর বাধা কী? বিশেষ, তাঁবুর বাইরে যখন শক্ত ও উঁচু বেড়া রয়েছে! এই ভেবে কুলির দল তাঁবুর বাইরে গিয়ে শুয়েছিল।

হঠাৎ একজন কুলি জেগে সভয়ে দেখে, বেড়া ফুঁড়ে ভিতরে ঢুকছে ভীষণ এক সিংহ! তখনই শুরু হল হই-চই, হুড়োহুড়ি, লাফালাফি, ছুটোছুটি—সিংহকে টিপ করে ওরই মধ্যে যারা সাহসী তারা কেউ ছুড়লে লাঠি-সোটা, কেউ ছুড়লে ইট-পাটকেল, কেউ ছুড়লে জ্বলন্ত কাঠ! কিন্তু পশুরাজ সেসব তুচ্ছ ব্যাপার গ্রাহ্যের মধ্যেই আনলে না এবং একটুও ইতস্তত না করে এক হতভাগ্যকে ধরে কাঁটাঝোপের ভিতর দিয়ে টানতে টানতে বাহিরে নিয়ে গেল। সেখানে আর একটা সিংহ এসে তার সঙ্গে যোগ দিলে। এবং এমনি তাদের বুকের পাটা

যে, মানুষের দেহ নিয়ে এবারে তারা আর বনের ভিতরে গেল না, কাঁটাঝোপের বেড়ার পাশেই বসে তারা আহার আরম্ভ করলে। কুলিদের জমাদার অন্ধকারে তাদের দিকে কয়েকবার বন্দুক ছুড়লে, কিন্তু তাও তারা আমলে আনলে না! নিশ্চিন্ত ভাবে তাদের ভয়ানক ভোজ সমাপ্ত করে তবে তারা সে স্থান ছেড়ে প্রস্থান করলে!

রাত পোয়ালে পর দেখলুম, কুলির দেহের খুব সামান্য অংশই সিংহরা ফেলে গেছে। অন্যান্য কুলিদের মানা করলুম, আজকেই তারা যেন সেই দেহাবশেষ গোর না দেয়।

রাত্রে সেইখানেই বন্দুক নিয়ে আমি জেগে রইলুম—ভাবলুম, দেহের বাকি অংশটা শেষ করবার লোভে সিংহরা আবার যদি ফিরে আসে!

কিন্তু তারা আর ফিরে এল না—এল খালি একটা হায়না।

সকালেই খবর এল, মাইল-দুয়েক দূরের এক তাঁবু থেকে সিংহরা আর একজন কুলিকে ধরে নিয়ে গেছে এবং এক্ষেত্রেও তাঁবুর পাশেই নির্ভয়ে বসে তাদের খাওয়া-দাওয়া সেরে নিয়েছে!......সিংহরা যে কী করে এমন নিঃশব্দে এই পুরু কাঁটাঝোপের বেড়া ভেদ করে ভিতরে ঢোকে, আমি কিছুতেই সেটা বুঝে উঠতে পারলুম না। আমার তো বিশ্বাস, শব্দ হোক আর নাই-ই হোক, এর ভিতরে দিয়ে ঢোকাই অসম্ভব! ব্যাপারটা আজ পর্যন্ত আমার কাছে রহস্যের মতোই মনে হয়।

এই ঘটনার পর আমি উপরি উপরি আট-দশ রাত্রি নানা স্থানে সেই দুর্দান্ত পশুদের জন্যে অপেক্ষা করলুম। কিন্তু সমস্তই ব্যর্থ হল। হয় আমাকে দেখতে পেয়ে তারা অদৃশ্য হয়, নয় আমার কাছ থেকে অনেক দূরের তাঁবুতে গিয়ে মানুষ বধ করে! একদিনও তাদের বন্দুকের সীমানার মধ্যে পেলুম না—এদিকে রাতের পর রাত জেগে আমার শরীর রীতিমতো কাহিল হয়ে পড়ল। তবু আমি হাল ছাড়লুম না, কারণ এতগুলো নিরীহ মানুষ যখন একমাত্র আমাকেই তাদের রক্ষাকর্তা বলে জানে, তখন তাদের রক্ষা করা ছাড়া আমার আর কোনও কর্তব্য নেই।

বনে-জঙ্গলে বহুকাল কাটিয়েছি, অনেক বিপজ্জনক হিংস্র পশুর সঙ্গে যুদ্ধ করেছি। কিন্তু আমার জীবনে এমন ভয়াবহ সময় আর কখনও আসেনি! রাত্রের পর রাত্রে শুনছি ভয়ংকর নরখাদকের মেঘগর্জনের মতো চিৎকার এগিয়ে আসছে—ক্রমেই কাছে এগিয়ে আসছে এবং সঙ্গে সঙ্গে এও বুঝতে পারছি যে, ভোর হবার আগেই আমাদের ভিতর থেকে একজন না একজনকে ইহলোকের সমস্ত আনন্দ থেকে বঞ্চিত হতে হবে! সিংহরা যেই তাঁবুর কাছে আসত, অমনি তাদের চিৎকার থেমে যেত। আর তাদের চিৎকার থামলেই আমরা বুঝতুম, তারা শিকারের সন্ধান পেয়েছে, কারণ শিকারের সময়ে সিংহরা একেবারে চুপচাপ হয়ে যায়!......তারপরেই সমস্ত স্তব্ধতা চঞ্চল হয়ে উঠত—তাঁবুতে তাঁবুতে মানুষের উচ্চ কণ্ঠস্বর শোনা যেত—'খবরদার! ভেইয়া, শয়তান আতা!' কিন্তু সে সাবধানতায় কোনওই ফল হত না, আবার জেগে উঠত সেই পরিচিত আর্তনাদ এবং পরদিন সকালে নাম ডাকবার সময়ে একজন কুলিকে আর পাওয়া যেত না!

রাত্রের পর রাত্রে বারংবার বিফল হয়ে ক্রমেই আমি হতাশ হয়ে পড়লুম। এ সিংহরা

নিশ্চয়ই মায়া সিংহ, নিশ্চয়ই তারা সিংহ-মূর্তিতে সাক্ষাৎ শয়তান! জঙ্গলের ভিতরে গিয়ে তাদের খুঁজে বার করবার চেষ্টা বৃথা, তাদের কোনও পাত্তাই পাওয়া যাবে না; কিন্তু কুলিদের সান্ত্বনা ও ভরসা দেবার জন্যে একটা কিছু তো করতে হবেই! কাজেই প্রতিদিন আমি দুর্ভেদ্য জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে কখনও হুমড়ি খেয়ে, কখনও হামাগুড়ি দিয়ে সিংহদের খুঁজতে লাগলুম। এই অন্বেষণের সময়ে যদি কোনওদিন তাদের সঙ্গে আমার মুখোমুখি দেখা হয়ে যেত, তাহলে তাদের চেয়ে আমারই ছিল বিপদের ভয় বেশি,—আমি তাদের কোনও ক্ষতি করবার আগেই তারা হয়তো আমারই ঘাড় ভেঙে সব আপদ চুকিয়ে দিত। এতদিনে সাভোর নরখাদকের ভীষণ কাহিনি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং অনেক শিকারি ও সৈনিক আমাকে সাহায্য করবার জন্যে সাভোয় এসে হাজির হয়েছিলেন। প্রতি রাতে সবাই বন্দুক নিয়ে পাহারায় বসতেন। কিন্তু ফল হত একই, সিংহরা এমনি চালাক হয়ে উঠেছিল যে, যেদিকে বিপদ সেদিকে কিছুতেই ঘেঁষত না। আমরা যদি পূর্ব দিকে পাহারা দি, তারা তবে মানুষ ধরে পশ্চিম দিকে গিয়ে।

এক রাত্রের কথা স্পষ্ট আমার মনে আছে। রেলস্টেশন থেকে একজন কুলিকে ধরে এনে সিংহরা, আমার তাঁবুর কাছে এসেই আড্ডা গেড়ে বসল। খেতে খেতে তাদের গজরানি ও সেই সঙ্গে মড়মড় করে হাড় ভাঙার শব্দ এখনও আমি যেন কানে শুনতে পাই! এর মধ্যে সবচেয়ে ভয়ানক হচ্ছে আমাদের অসহায়তা! বাইরে যাওয়া বৃথা, কারণ যাকে তারা ধরেছে সে-বেচারা আর বেঁচে নেই এবং চতুর্দিকের অন্ধকার এমন গাঢ় যে, বন্দুক ছুড়েও লাভ নেই। আমার তাঁবুর কাছেই যেসব কুলি থাকত, সিংহদের আহারের শব্দে তারা এমনি ভয় পেলে যে, চেঁচিয়ে আমার তাঁবুতে আসবার জন্যে কাকুতি-মিনতি করতে লাগল। আমি সম্মতি দিলুম। তারা এক ছুটে আমার তাঁবুতে এসে হাজির! তখন আমার মনে পড়ল, তাদের দলে এক শয্যাশায়ী রোগী ছিল, তার কথা। তাদের জিজ্ঞাসা করে শুনলুম যে, এমনি তারা হৃদয়হীন, সে-হতভাগ্যকে তাঁবুতে একলা ফেলে রেখে এসেছে! আমি তৎক্ষণাৎ তাকে আনবার জন্যে একদল লোক নিয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়লুম। কিন্তু কুলিদের তাঁবুতে গিয়ে দেখলুম, তাকে আর আমার তাঁবুতে আনবার কোনওই দরকার নেই। কারণ সঙ্গীরা তাকে একলা সেইখানে ফেলে পালাল দেখে ভয়েই তার প্রাণ বেরিয়ে গেছে!

ব্যাপার ক্রমেই গুরুতর হয়ে উঠল। এতদিন কেবল একটা নরখাদকই তাঁবুর ভিতরে ঢুকে মানুষ ধরে নিয়ে যেত, তার সঙ্গী অপেক্ষা করত বাইরেই। এখন তারা দুজনে মিলেই তাঁবুতে এসে ঢুকছে এবং প্রত্যেকেই এক-একজন মানুষকে না নিয়ে বাইরে যায় না। মানুষ শিকার খুব সহজ দেখে তাদের বুক বলে গেছে! এইভাবে এক রাত্রে তারা দুজন স্থানীয় লোককে ধরে নিয়ে গেল। একজনকে তারা তখনই উদরসাৎ করে ফেললে, কিন্তু আর একজনের কাতর ক্রন্দনে চারিদিক পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। অনেকক্ষণ পরে তার ভয়ে আধমরা সঙ্গীরা কোনওরকমে কিঞ্চিৎ সাহস সঞ্চয় করে এগিয়ে গিয়ে দেখলে, 'বোমা' জঙ্গলের বেড়ার ভিতরে তার রক্তাক্ত দেহ আটকে রয়েছে। সিংহরা সেই জঙ্গল ভেদ করে তার দেহকে টেনে নিয়ে যেতে পারেনি! হতভাগ্যকে উদ্ধার করে আনা হল বটে, কিন্তু সে বাঁচল না।

এরই দু-চার দিন পরে সিংহরা এক রাত্রে সবচেয়ে বড়ো তাঁবুর ভিতরে গিয়ে হানা দিলে। দূর থেকে আমি কুলিদের করুণ আর্তনাদ শুনতে পেলুম কিন্তু কিছুই করতে পারলুম না। ইনস্পেকটার মি. ডলগ্রেন বন্দুক নিয়ে বাইরে এলেন, এবং অন্ধকারে যেখানে বসে সিংহরা সশব্দে নরমাংস ভক্ষণ করছিল, সেই দিকে উপরি উপরি পঞ্চাশবার বন্দুক ছুড়লেন। কিন্তু দুঃসাহসী সিংহরা সে গুলি-বৃষ্টিতেও ভয় পেলে না।

ডলগ্রেন সাহেবের সন্দেহ হল, তিনি একটা সিংহকে আহত করেছেন। পরদিন সকালে তাই তাঁর সঙ্গে আমি আহত সিংহটার সন্ধানে বেরিয়ে পড়লুম। বালির উপরে সিংহের পদচিহ্ন অনুসরণ করে খানিকদূর অগ্রসর হয়েই একটা জঙ্গলের ভিতর থেকে বারংবার সিংহের ক্রুদ্ধ গর্জন শুনতে পেলুম। খুব সাবধানে জঙ্গল সরিয়ে দেখা গেল, মাটির উপরে একটা কুলির আধ-খাওয়া দেহ পড়ে রয়েছে, কিন্তু সিংহরা সেখান থেকে সরে পড়েছে!

সত্যিকথা বলতে কী, এরকম ভয়াবহ ব্যাপারে অশিক্ষিত কুলিরা তো দূরের কথা, পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সাহসী ব্যক্তিও স্তম্ভিত না হয়ে পারবে না। সাভোর চারিদিকে তখন পালাও পালাও রব উঠল! কুলিরা দল বেঁধে কাজে কামাই করলে এবং আমার কাছে এসে জানালে যে, 'আমরা আর কিছুতেই এদেশে থাকব না। ভারতবর্ষ থেকে আমরা এখানে সিংহের ফলার হবার জন্যে আসিনি, আমরা এসেছি সরকার-বাহাদুরের চাকরি করতে।'

তারপরেই সাভোতে প্রথম যে-রেলগাড়ি এল, দলে দলে কুলি লাইনের উপরে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে সে গাড়িখানাকে থামিয়ে ফেললে। এবং তারপরে সকলে মিলে গাড়িতে উঠে কয়েক শত কুলি সেইদিনই এই অভিশপ্ত দেশ ছেড়ে চম্পট দিলে।

লাইনের কাজ একেবারেই বন্ধ হয়ে গেল। বাকি যারা রইল তারা কাজকর্ম করবে কী, সিংহের কবল থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্যে নানা উপায়ের কথা ভাবতে ভাবতেই তাদের সময় কাটতে লাগল। কেউ ছাদের উপরে, কেউ উঁচু জলের 'ট্যাঙ্কে'র উপরে গিয়ে আশ্রয় নিলে। কেউ বা তাঁবুর মাটির ভিতরে গভীর গর্ত খুঁড়ে, গর্তের মুখে ভারী কাঠ চাপা দিয়ে সেইখানেই রাত্রিবাস করে। সন্ধ্যা হলেই দেখা যায়, বড়ো বড়ো গাছের ডালে ডালে বানরের মতো দলে দলে মানুষ বসে আছে। এক-একটা গাছের ডালে এত লোক বসে থাকত যে, একরাত্রে একটা গাছের ডাল ভেঙে অনেকগুলো লোক সিংহের মুখে গিয়ে পড়ল। ভাগ্যক্রমে সিংহরা তখন অন্য একজন মানুষকে ধরেছিল বলে তাদের দিকে আর ফিরে তাকায়নি; কিংবা গাছ থেকে মানুষ বৃষ্টি দেখে তারা বিস্ময়ে অত্যন্ত চমকে গিয়েছিল!

॥ চার ॥

ওখানকার ডিস্ট্রিক্ট অফিসার ছিলেন মি. হোয়াইটহেড। কুলিদের ধর্মঘটের কিছু আগে আমি তাঁকে সাভোয় এসে সিংহ-শিকারে আমাকে সাহায্য করবার জন্যে চিঠি লিখেছিলুম। উত্তরে তিনি জানিয়েছেন, 'অমুক তারিখে আমি যাত্রা করব।'

তাঁকে ও তাঁর মোটমাট আনবার জন্যে নির্দিষ্ট তারিখে আমি আমার ভৃত্যকে স্টেশনে পাঠিয়ে দিলুম।

খানিকক্ষণ পরেই আমার ভৃত্য ছুটতে ছুটতে ও ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে ফিরে এল।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'ব্যাপার কী?'

সে জানালে যে, স্টেশনে ট্রেনও নেই, রেলের কোনও লোকও নেই, কেবল মস্তবড়ো একটা সিংহ প্ল্যাটফর্মের উপরে নিজের মনে পায়চারি করে বেড়াচ্ছে!

অসম্ভব কথা! আমি হেসেই উড়িয়ে দিলুম। আজকাল এখানকার লোকেরা ভয়ে এতটা ভেবড়ে গেছে যে, জঙ্গলে একটা বেবুন কি হায়না কি কুকুর দেখলেও সিংহ দেখেছে বলে চিৎকার করে ওঠে!

কিন্তু পরদিনই জানা গেল, আমার চাকরের কথা মিথ্যা নয়। সত্য-সত্যই একটা মানুষখেকো সিংহ এসে স্টেশনে হানা দিয়েছিল এবং স্টেশনমাস্টার তাঁর লোকজন নিয়ে ঘরের ভিতরে খিল দিয়ে বসে থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন।

কিন্তু তখনও মি. হোয়াইটহেডের দেখা নেই। আমি ভাবলুম, তাহলে এবারে তাঁর আসা আর হল না।

সন্ধ্যার পর আহারে বসেছি, এমন সময়ে দু-বার বন্দুকের আওয়াজ শুনলুম। কিন্তু তাতে আমি ভ্রূক্ষেপ করলুম না, কারণ আজকাল এখানে যখন-তখন বন্দুকের শব্দ শোনা যায়।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে পর প্রতি রাত্রের মতো আজকেও আমি রাত জাগতে বেরুলুম। একটি গোপন জায়গায় গিয়ে বন্দুক বাগিয়ে বসে রইলুম। একটু পরেই খুব কাছেই শুনলুম, সিংহরা গজরাতে গজরাতে মড়মড় করে হাড় ভেঙে খাচ্ছে! তাঁবুর ভিতরে কোনও গোলমাল নেই, কেউ আর্তনাদও করছে না, তবে এখানে তারা আর কী খাবার জিনিস পেয়েছে? মনে মনে আন্দাজ করলুম, হয়তো তারা কোনও হতভাগ্য পথিককেই আজ বধ করেছে।

হঠাৎ দেখলুম, অন্ধকারের ভিতরে তাদের অগ্নিময় চোখগুলো জ্বলে উঠল! বেশ টিপ করে বন্দুক ছুড়লুম। তার পরেই সব চুপচাপ। নিশ্চয়ই তারা শিকার নিয়ে সেখান থেকে সরে পড়েছে!

সকালবেলায় তাঁবুতে ফেরবার পথে মি. হোয়াইটহেডের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল! তাঁর মুখ বিবর্ণ, চুল উসকো-খুসকো, পোশাক এলোমেলো, যেন তিনি অত্যন্ত পীড়িত।

সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলুম, 'এ কী ব্যাপার? তুমি এলে কোত্থেকে? কাল তুমি আসোনি কেন?'

তিনি মুখভার করে বললেন, 'ভদ্রলোককে নিমন্ত্রণ করে তুমি তাঁর অভ্যর্থনার জন্যে চমৎকার ব্যবস্থা করে রেখেছ।'

—'সে কী? হয়েছে কী?'

—'তোমার সেই হতচ্ছাড়া সিংহ কাল রাতে আর একটু হলেই আমার দফা রফা করে দিয়েছিল!'

—'কী বাজে বকছ, নিশ্চয়ই তুমি কোনও দুঃস্বপন দেখেছ!'

হোয়াইটহেড আমার দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমার পিঠের দিকে তাকিয়ে দ্যাখো। এটাও কি স্বপ্ন?'

তাঁর জামা গলার কাছ থেকে নীচে পর্যন্ত ছিঁড়ে ফালাফালা হয়ে গেছে এবং আদুড় পিঠের উপরে চার-চারটে ধারালো নখের রক্তাক্ত দাগ দেখা যাচ্ছে। নির্বাক হয়ে তাঁকে নিয়ে আমি তাঁবুতে ফিরে এলুম। তাঁর ক্ষতস্থানে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিলুম। তারপর তাঁর মুখ থেকে যা শুনলুম, তা হচ্ছে এই :—

'কাল আমি যখন সাভো স্টেশনে এসে হাজির হলুম, তখন রাত হয়ে গেছে। সঙ্গে ছিল আমার চাকরদের সর্দার আবদুল্লা। আমি তোমার তাঁবুতে আসবার পথ ধরলুম—পিছনে পিছনে লণ্ঠন নিয়ে আসতে লাগল আবদুল্লা। কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ একটা প্রকাণ্ড সিংহ কোত্থেকে এক লাফে আমার ঘাড়ের উপরে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল, বিষম ধাক্কায় আমি ছিটকে মাটির উপরে দড়াম করে পড়ে গড়াগড়ি দিতে লাগলুম।

সৌভাগ্যক্রমে বন্দুকটা তখনও আমার হাতেই ছিল, আমি তখনই সিংহকে লক্ষ্য করে বন্দুক ছুড়লুম।

গুলি সিংহের গায়ে লাগল না বটে, কিন্তু বন্দুকের আগুন ও আওয়াজ দেখে-শুনে সিংহটা হতভম্ব হয়ে গেল! সেই সুযোগে আমি একলাফে সরে দাঁড়ালুম।

কিন্তু সিংহ তখন আবদুল্লাকে আক্রমণ করলে। সে বেচারা চিৎকার করে উঠল, 'হুজুর, সিংহ!' তারপরে সে আর কিছু বলবার সময় পেলে না, কারণ সিংহ তাকে নিয়ে তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি আবার বন্দুক ছুড়লুম, কিন্তু কোনওই ফল হল না।'

এতক্ষণে আমি বুঝতে পারলুম যে, কাল রাত্রে সিংহরা কোন হতভাগ্যের মাংস ভক্ষণ করছিল!

সেইদিনেই ওখানকার পুলিশ-সুপারিন্টেন্ডেন্ট কার্কুহার সাহেবও একদল সেপাই নিয়ে সিংহ-শিকারে আমাকে সাহায্য করতে এলেন। এবং আরও কয়েকজন সাহেব নানা স্থান থেকে সাভোয় এসে হাজির হলেন। সিংহদের কুখ্যাতি তখন দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল।

সিংহের বিরুদ্ধে মানুষের এই বিপুল যুদ্ধ ঘোষণার কথা সিংহরা টের পেয়েছিল কি না জানি না,—জানলে দুরাত্মাদের পেটের পিলে নিশ্চয়ই চমকে যেত।

এবারে আমরা আট-ঘাট বেঁধে কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলুম।

আমি যে একটি সিংহ ধরবার ফাঁদ তৈরি করেছি, পূর্বেই সে কথা বলা হয়েছে। সেই ফাঁদটি একটি যুৎসই জায়গায় এনে রাখলুম। তার ভিতরের একটি কামরায় রইল দুজন সশস্ত্র সেপাই! মানুষ খাবার লোভে সিংহরা ভিতরে ঢুকলেই ফাঁদের অন্য ঘরে বন্দি হবে, অথচ মানুষের ঘরে আসতে পারবে না।

গাছে গাছে বন্দুক নিয়ে অন্যান্য সেপাইরা পাহারায় রইল। সাহেবরাও প্রস্তুত হয়ে ঝোপেঝাপে লুকিয়ে রইলেন।

রাত নটা বাজল। এখন পর্যন্ত চারিদিক একেবারে নিসাড় হয়ে আছে।

আচম্বিতে একটা শব্দ হল। বুঝলুম, আমার ফাঁদের ভারী দরজা ঝপাং করে পড়ে গেল। আনন্দে প্রাণ নেচে উঠল!

'উঃ এতদিনে! এতদিনে অন্তত একটা শয়তানকেও বাগে পাওয়া গেল।'

কিন্তু শেষে দেখা গেল, সবই ফক্কিকার!

সিংহ এসেছিল, ধরা পড়েছিল, কিন্তু তবু তাকে খাঁচার ভেতরে পাওয়া গেল না! বুঝুন, এ কত বড়ো দুর্ভাগ্য!

খাঁচার ভিন্ন কামরায় যে দুজন সেপাই ছিল, তাদের উপরে হুকুম ছিল যে, সিংহ ধরা পড়লেই তারা তাকে বধ করবে।

কিন্তু ভীষণ সিংহ যখন পিঞ্জরে বন্দি হয়ে গর্জন ও লম্ফত্যাগ করতে লাগল, তখন সেপাইরা আতঙ্কে এমনি আড়ষ্ট হয়ে গেল যে, বন্দুক ছোড়ার কথা আর তাদের মনেই রইল না।

কাছেই এক জায়গায় ছিলেন ফার্কুহার সাহেব, ব্যাপার বুঝে সেইখানে থেকেই তিনি চেঁচিয়ে তাদের উৎসাহিত করতে লাগলেন।

তখন তারা মরিয়া হয়ে বিপুল-বিক্রমে বন্দুক ছুড়তে শুরু করলে!

সে কি যে সে বন্দুক ছোড়া, অন্ধ বা পাগলরাও তেমন ভাবে বন্দুক ছোড়ে না! আকাশে, বাতাসে, আমাদের আশে পাশে,-মাথার উপরে গুলির ঝড় বইতে লাগল—প্রাণ যায় আর কী! বন্দুকের গুলির চোটে ফাঁদের দরজার খিল গেল উড়ে, সঙ্গে সঙ্গে সিংগি দিলে দে-চম্পট! একেবারে পাশ থেকে এমন রাশি রাশি গুলি ছুড়লে যে কোনও দুর্দান্ত একবার নয়, দশ-বারো বার মরতে পারত! তবু যে সেপাইরা কেন তাকে বধ করতে পারলে না, এটা একটা অসম্ভব রহস্যের ব্যাপার! খাঁচার ভিতরে রক্ত দেখে বোঝা গেল, সিংহটা আহত হয়েছে বটে! কিন্তু এ তুচ্ছ সান্ত্বনার ব্যাপার, কারণ তার মৃত্যু ছিল নিশ্চিত!

তবু আমরা একেবারে হাল ছাড়লুম না, সকালবেলায় দল বেঁধে বেরিয়ে পড়ে, বনে বনে সিংহের খোঁজ করতে লাগলুম। মাঝে মাঝে জঙ্গলের ভিতর থেকে পশুরাজের ক্রুদ্ধ গর্জন শোনা গেল,—কিন্তু ওই পর্যন্ত। তার দেখা পাওয়ার সৌভাগ্য আর হল না, কেবল ফার্কুহার সাহেব একটা সিংহকে একবার বিদ্যুতের মতো এ-জঙ্গল থেকে ও-জঙ্গলে চলে যেতে দেখেছিলেন।

এইভাবে দু-দিন কাটল। সিংহ কিন্তু দেখা দিতে রাজি হল না। ফার্কুহার সাহেব তখন হতাশ হয়ে তাঁর সেপাইদের নিয়ে চলে গেলেন। মি. হোয়াইটহেড ও অন্যান্য সাহেবরাও একে একে বিদায় গ্রহণ করলেন।

আবার আমি একলা! বুঝলুম, এখন থেকে আমাকে আবার একা-একাই নরখাদক সিংহদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে!

॥ পাঁচ ॥

দিন-দুই পরের কথা। সকালবেলায় বাইরে বেরিয়েই দেখি, একজন 'সোয়াহিলি' (স্থানীয় অসভ্য বাসিন্দা) মহাভয়ে ছুটতে ছুটতে চ্যাচাচ্ছে 'সিম্বা। সিম্বা!' ('সিংহ। সিংহ!') এবং বারংবার পিছনপানে তাকিয়ে দেখছে!

তাকে প্রশ্ন করে জানলুম যে, নদীর ধারের তাঁবুর ভিতর থেকে সিংহরা একজন মানুষ ধরতে গিয়ে ধরতে পারেনি; তখন তারা একটা গাধাকে বধ করে সেইখানেই বসে বসে ভোজন করছে!

হুঁ, এই হল আমার সুযোগ। এ সুযোগ কি আর ছাড়ি?

একছুটে তাঁবুতে ফিরে, ফার্কুহার সাহেব যে বৃহৎ বন্দুকটা রেখে গিয়েছিলেন সেটা তুলে নিয়েই বেরিয়ে পড়লুম। সোয়াহিলি আগে আগে আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। খুব সন্তর্পণে এগুতে লাগলুম—এবারে এসপার কি ওসপার!

খানিক পরেই ঘন ঝোপের ফাঁক দিয়ে দেখা গেল একটা সিংহকে।

দুর্ভাগ্যক্রমে সোয়াহিলির পা পড়ল একটা খড়মড়ে শুকনো ডালের উপরে গিয়ে। সুচতুর পশুরাজ তখনই সে-শব্দটা শুনতে পেলে এবং একবার গজরে উঠেই আরও ঘন জঙ্গলের ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

পাছে বাগে পেয়েও আবার তাকে হারাই, সেই ভয়ে তাড়াতাড়ি আমি তাঁবুতে ফিরে এলুম। সেখানে যত কুলি ছিল সবাইকে ডেকে এনে এক জায়গায় জড়ো করলুম এবং বললুম, 'যত ঢাক-ঢোল আর টিনের কানাস্তারা আছে, সব নিয়ে তোমরা আমার সঙ্গে এসো।'

যে-জঙ্গলে সিংহটা অদৃশ্য হয়েছিল, দল বেঁধে আবার সেখানে গিয়ে দাঁড়ালুম। কুলিদের জমাদারকে বললুম, 'জঙ্গলের ওপাশে যাচ্ছি আমি। তোমার লোকজনকে এই জঙ্গলের এপাশ থেকে তিন দিক ঘিরে অর্ধচন্দ্রাকারে দাঁড় করাও। আমি ওপাশে গিয়ে পৌঁছোলেই তোমরা সবাই মিলে ঢাক-ঢোল আর কানাস্তারা বাজিয়ে বিষম গোলমাল শুরু করে দেবে!'

গুড়ি মেরে আমি জঙ্গলের ওপাশে গিয়ে হাজির হলুম। জঙ্গলের ভিতর থেকে একটা পথ বেরিয়ে এসেছে, তারই সামনে একটা ঢিপির পিছনে গিয়ে আমি গা-ঢাকা দিলুম।

একটু পরেই একসঙ্গে অসংখ্য ঢাক-ঢোল আর কানাস্তারার আকাশ-ফাটানো ও বন-কাঁপানো বাজনা আরম্ভ হল, সেই সঙ্গে আবার ভৈরব চিৎকার করতে করতে সমস্ত কুলি যখন পায়ে পায়ে এগুতে সুরু করলে, তখন সেই হই-হই রবে আমারই কান যেন কালা হয়ে যাবার জোগাড় হল! কোনও ভদ্র সিংহই এ গোলমাল সইতে পারবে না বুঝে আমি প্রস্তুত হয়ে রইলুম।

যা ভেবেছি তাই! মহা আনন্দে দেখলুম, একটা মস্তবড়ো, বলবান ও কেশরহীন সিংহ দ্রুতপদে জঙ্গল ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়াল। আজ কয়েক মাস ধরে এত চেষ্টা, এত পরিশ্রম

ও এত নরহত্যার পরে অন্তত একটা শয়তান এই প্রথম আমার কবলে এসে পড়ল! আর ওর রক্ষা নাই!

ধীরে ধীরে সিংহটা এগুচ্ছে এবং বারবার অবাক হয়ে চারিদিক তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবছে, তার রাজত্বে হঠাৎ এ অশান্তির কারণ কী? এই গোলমালেই সে অন্যমনস্ক হয়ে আছে, নইলে এতক্ষণে নিশ্চয়ই সে আমাকে দেখে ফেলত, কারণ ঢিপির আড়ালে আমার সব দেহটা ঢাকা পড়েনি। সে যখন আমার কাছ থেকে মাত্র পনেরো গজ তফাতে, আমি তখন বন্দুক তুলে লক্ষ্য স্থির করে ফেললুম—

এবং সঙ্গে সঙ্গে তার চোখ পড়ে গেল আমার উপরে—

আচম্বিতে আমাকে যেন মাটি ফুঁড়ে জেগে উঠতে দেখে অত্যন্ত হতভম্ব হয়ে সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল এবং গরর-গরর করতে লাগল।

আর কোথায় পালাবে যাদু? এই না ভেবে তার মাথা টিপ করে দিলুম আমার বন্দুকের ঘোড়া টিপে।

কী সর্বনাশ। টোটার বারুদ যে জ্বলে গেল—গুলি যে ছুটল না—পরের বন্দুক নিয়ে এ কী বিপদ!

এই অভাবিত দুর্ঘটায় আমি এমন স্তম্ভিত হয়ে পড়লুম যে, বন্দুকের দ্বিতীয় নলচের ঘোড়া টেপার কথা ভুলেই গেলুম! বন্দুকটা কাঁধ থেকে নামালুম, যদি সময় পাই, আবার তাতে টোটা ভরে ফেলব।

সৌভাগ্যক্রমে ঢাক-ঢোল কানাস্তারার আওয়াজে ও কুলিদের চিৎকারে সিংহটা এমনি ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছিল যে, আমার দিকে সে আর নজর দেবার সময় পেলে না। নইলে এ-যাত্রায় আমার প্রাণ নিশ্চয়ই বাঁচত না! সে আমাকে আক্রমণ না করে একলাফে আবার জঙ্গলের ভিতর গিয়ে পড়ল! এবং এতক্ষণে আমার আবার হুঁস হল, আমি আবার বন্দুক তুলে দ্বিতীয় নলচের গুলি ছুড়লুম! সঙ্গে সঙ্গে সিংহের গজরানি শুনেই বুঝলুম, আমি লক্ষ্যভেদ করেছি!

কিন্তু আসলে কোনও সুফলই ফলল না। আহত সিংহ আবার পালাল, তার পিছনে ছুটেও আর তাকে ধরতে পারলুম না।

বিষম খাপ্পা হয়ে আমি বন্দুককে, যার বন্দুক এবং যে এই বন্দুক তৈরি করেছে তাদের যা-মুখে আসে তাই বলে গালাগালি দিতে লাগলুম। এরপর আর কোনও দিন আমি এই বন্দুকটা ব্যবহার করিনি।

তখনকার মতো আবার তাঁবুর দিকে ফেরা ছাড়া আর উপায় রইল না। বার বার দুর্ভাগ্যে ও অসাফল্যে মন আমার ভেঙে পড়ল। এবং কুলিদেরও কুসংস্কার আরও দৃঢ় হয়ে উঠল—এখানকার সিংহরা মায়াসিংহ না হয়ে যায় না! সত্যি, অনেকটা সেই রকমই বটে, এ সিংহদের উপরে কে যেন মন্ত্র পড়ে দিয়েছে, বন্দুকের গুলি এদের কিছুই করতে পারে না।

॥ ছয় ॥

সিংহরা যে-গাধাটাকে বধ করেছে, তাকে খেয়ে ফেলবার আগেই আমরা যে গিয়ে পড়েছিলুম, এটা আমি ভুলিনি। এবং তারা যে গাধার মাংস খাবার লোভে আবার ফিরে এলেও আসতে পারে, এটাও আমার অজানা ছিল না।

গাধার দেহটা যেখানে পড়ে আছে, তার কাছে কোনও গাছটাছ ছিল না। তাই সেখানে আমি চারটে বড়ো বড়ো ডান্ডা পুঁতে তার উপরে তক্তা পেতে একটা বারো ফিট উঁচু মাচা বানিয়ে ফেললুম। এবং একটা খোঁটা পুঁতে তার সঙ্গে একগাছা মোটা দড়ি জড়িয়ে গাধার দেহটা এমন ভাবে বেঁধে রাখলুম যে সিংহরা সহজে সে দেহটা টেনে নিয়ে যেতে পারবে না।

সূর্য যেই আস্তে গেল, আমিও অমনি মাচার টঙে চড়ে বসলুম এই আশায় যে, যদি সিংহরা আবার ভুল করে আমার ফাঁদে পা দেয়!

অন্ধকার নেমে এল, সঙ্গে সঙ্গে অসীম স্তব্ধতা! আফ্রিকার অরণ্যে অন্ধকার নিশীথের স্তব্ধতা যে কী রকম, লিখে তা বুঝানো যায় না, প্রাণ দিয়ে তাকে অনুভব করতে হয়। বিশেষ, আমার মতন অবস্থায়,—একাকী ও সঙ্গীরা আছে কত দূরে!

নির্জনতা, নীরবতা ও যে-জন্যে আমি এখানে বসে আছি তার ভাবনা, এই সমস্তরই প্রভাব আমার চিত্তকে কেমন যেন স্বপ্নাচ্ছন্ন করে তুললে! উপরে আকাশ, অন্ধকার সেখানে খুব জমাট নয়, চারপাশে বন-জঙ্গল, অন্ধকারের উপরে সেখানে যেন অন্ধকারের আর একটা প্রলেপ পড়েছে এবং সামনে খোলা জমি, অন্ধকার সেখানে যেন একলাটি শুয়ে আছে। কোথাও একটা পাখি ডাকছে না, বাতাসের দোলায় পাতা শিউরে উঠছে না!

ঢুলতে ঢুলতে চমকে উঠলুম! যেন শুকনো পাতা মড় মড় করে উঠল না? কান পেতে রইলুম—বনের ভিতরে কোনও দানবের পায়ের শব্দ শোনবার জন্যে। ও শব্দটা কীসের? নরখাদক সিংহের? নিশ্চয়ই আজ আমার ভাগ্য ফিরবে?

আবার সেই গম্ভীর স্তব্ধতা। প্রাণপণে অন্ধকারের ভিতরে দৃষ্টিকে চালিয়ে বন্দুক ধরে আমি বসে রইলুম একটা পাথরের মূর্তির মতো!

একটু পরেই সকল সন্দেহ ঘুচে গেল! হ্যাঁ, পশুরাজেরই আবির্ভাব হয়েছে! ওই গভীর দীর্ঘশ্বাস, ওটা হচ্ছে ক্ষুধার চিহ্ন! ওই তো! জঙ্গলের ভেতর দিয়ে সাবধানে সে এগিয়ে আসছে, তারই শব্দ হচ্ছে!

এক মুহূর্তের জন্যে সমস্ত স্থির, তার পরেই ক্রুদ্ধ গর্জন! পশুরাজের চোখে ধুলো দেওয়া অসম্ভব, সে টের পেয়েছে যে আমি এখানে সশরীরে উপস্থিত!......তাই তো, সে কি আবার আমাকে ফাঁকি দেবে?

না! চাকা ঘুরে গেল, ব্যাপারটা হঠাৎ অন্য রকম হয়ে দাঁড়াল! আমি এসেছি সিংহ শিকার করতে, কিন্তু সিংহই এখন আমাকে শিকার করতে চায়! সে কি বুঝতে পেরেছে যে, আমিই হচ্ছি প্রধান শত্রু?

সিংহটা গাধার দিকও মাড়াল না, সে চোরের মতো আমার মাচার চারিপাশে ওত পেতে ঘুরে বেড়াতে লাগল! প্রায় ঘণ্টা দুই ধরে এই ব্যাপার চলল—ধীরে ধীরে সে মাচার কাছ ঘেঁষে এসে দাঁড়াল। অন্ধকারে তাকে আমি দেখতে পাচ্ছিলুম না বটে, কিন্তু তার পায়ের শব্দে সমস্তই আন্দাজ করতে পারছিলুম! আমার এই নড়বোড়ে মাচা, এমন কাণ্ড হতে পারে সেটা না ভেবেই এটা তৈরি করা হয়েছে, বলিষ্ঠ সিংহের প্রথমই আক্রমণেই মাচাসুদ্ধ আমাকে মাটিতে গড়াগড়ি দিতে হবে—এবং তারপর?

আর এই তো মোটে বারো ফিট উঁচু মাচা, সিংহ যদি একলাফে এর উপরে উঠে পড়ে, তা হলেই বা আমার দশা কী হবে?

...আমার বুক দুর্ভাবনায় ধড়ফড় করতে লাগল, বোকার মতো নিজের মৃত্যুকে নিজেই ডেকে এনেছি ভেবে মনে মনে অনুতাপ করতে লাগলুম।

যতই ভয় পাই, আমি কিন্তু একেবারে স্থির হয়ে বসে রইলুম। দৃষ্টি আমার নিষ্পলক!

আচম্বিতে আমার মাথার পিছনে ঝপাং করে কে আঘাত করলে!

পরমুহূর্তে ভীষণ আতঙ্কে অবশ হয়ে মাচার উপর থেকে আমি পড়ে যাচ্ছিলুম—সিংহটা নিশ্চয়ই পিছন দিক থেকে লাফ মেরে আমার মাচার উপরে উঠে এসেছে!

কোনও রকমে সামলে গেলুম! না, সিংহ নয়,—একটা প্যাঁচা! আমার স্থির দেহকে গাছের ডাল বা অমনি কিছু বলে ভুল করেছে! অতি সাধারণ ব্যাপার! উল্লেখযোগ্যই নয়! কিন্তু সময় বিশেষে সাধারণ ব্যাপারও কতখানি ভয়ানক হয়ে উঠতে পারে!

প্যাঁচার ডানার ঝাপটায় যেই আমি চমকে উঠলুম, নীচে থেকে দুরন্ত সিংহটাও অমনি রেগে গোঁ গোঁ করে উঠল!

আবার আমি স্থির হয়ে বসলুম—যদিও মনের ভিতর দিয়ে আমার উত্তেজনার স্রোত বয়ে চলেছে! সিংহটা আবার চোরের মতো আমার দিকে এগিয়ে আসছে! তার পায়ের শব্দ শুনলুম এবং অন্ধকারের ভিতরেও নিবিড়তর অন্ধকারের মতো তার দেহটা আমার সামনে জেগে উঠল!

আর তাকে এগুতে দেওয়া উচিত নয়। যেটুকু দেখেছি সেইটুকুই যথেষ্ট।

আমি বন্দুকের ঘোড়া টিপলুম।

বন্দুকের আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে সিংহের সে কী ভয়ঙ্কর চিৎকার! একটা অন্ধকারের চেয়েও কালো ছায়া বিপুল এক লম্ফে দূরের ঝোঁপের উপরে ঠিকরে গিয়ে পড়ল—তারপর চারিদিকে লাফালাফি করতে লাগল—আমি আর কিছু আন্দাজ করতে পারলুম না—কেবল গুলির পর গুলি বৃষ্টি করতে লাগলুম!......তারপর ঘন ঘন আর্তনাদ, তারপর বার বার গভীর শ্বাস, তারপর আবার সব চুপচাপ! আমি বেশ বুঝলুম অন্তত একটা নরহন্তা শয়তানের লীলাখেলা জন্মের মতো ফুরিয়ে গেল!

কিন্তু একসঙ্গে এই বন্দুকের ও সিংহের গর্জন স্তব্ধ রাত্রে আমাদের তাঁবুর ভিতরে গিয়ে পৌঁছতে দেরি লাগল না! সারা অরণ্য শত শত মানুষের কণ্ঠস্বরে জাগ্রত হয়ে উঠল! দূর থেকে প্রশ্ন আসতে লাগল—ব্যাপার কী, আমার কি কোনও বিপদ হয়েছে?

চিৎকার করে আমি জানালুম,—না, আমার কোনও বিপদ হয়নি, কিন্তু একটা মানুষখেকো দানব মারা পড়েছে!

সঙ্গে সঙ্গে শত শত মানুষ এমন সমস্বরে গগনভেদী জয়ধ্বনি করে উঠল যে, সেই বিরাট অরণ্যের সমস্ত পশু বোধহয় অত্যন্ত বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে পড়ল!

জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে দেখা গেল, শত শত আলো ছুটোছুটি করতে করতে এগিয়ে আসছে, অনেকে ঢোল বাজাচ্ছে এবং অনেকে বাজাচ্ছে শিঙা—তাঁবু খালি করে এক বিরাট জনতা আমার কাছে এসে পড়ল!

আমি সবিস্ময়ে দেখলুম, দলে দলে লোক এসে আমার সামনে নীচু হয়ে মাথা নামিয়ে অভিভূত স্বরে বলছে, 'হুজুর, আপনি গরিবের মা-বাপ!'—'আপনি ঈশ্বর-প্রেরিত!'—'আপনিই আমাদের রক্ষাকর্তা!'

তারা তখনই মরা সিংহটাকে ঝোপের ভিতর থেকে টেনে বার করতে চায়!

কিন্তু আমি বাধা দিলুম! কী জানি, হয়তো সিংহটা কেবল আহত হয়েছে, হয়তো এখনও সে মরেনি, কেউ কাছে এগুলে হয়তো এখনও সে লাফ মেরে তার ঘাড় ভাঙতে পারে! আহত সিংহ অত্যন্ত সাংঘাতিক জীব!

অতএব সে-রাত্রের মতো সকলকে নিয়ে আমি খুশি মনে আবার তাঁবুতে ফিরে এলুম। ছাউনির ভিতরে সারারাত ধরে মহা উৎসব, জয়ধ্বনি ও নাচ-গান চলল।

প্রভাতের অপেক্ষায় অধীর আগ্রহে আমি বসে রইলুম। এবং ভালো করে ফরসা হতে না হতেই আমি সদলবলে আহত বা নিহত সিংহটার উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লুম।

মাটির উপরে রক্তের দাগ দেখে সেই দাগ ধরে আমরা একটা ঘন ঝোপের ভিতরে প্রবেশ করলুম। কিন্তু কয়েক পা এগুতে না-এগুতেই আমাদের সামনে ও কী ও!—একটা প্রকাণ্ড সিংহ আমাদের উপরে লাফিয়ে পড়বার জন্যে গুড়ি মেরে আছে!

বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল! কিন্তু তারপরেই বুঝলুম,—না, সিংহটা জ্যান্ত নয়, ওই অবস্থাতেই তার প্রাণ বেরিয়ে গেছে!

কুলিদের আনন্দ দেখে কে! আমাকে তাদের কাঁধে তুলে নিয়ে, তারা হাসতে হাসতে চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে মৃত সিংহটার চারপাশ ঘিরে নাচতে আরম্ভ করলে!

আনন্দের প্রথম উচ্ছ্বাস একটু শান্ত হবার পরেই সিংহের দেহটাকে আমি পরীক্ষা করে দেখলুম। হ্যাঁ, এরকম সিংহ বধ করতে পারা ভাগ্যের কথা বটে! মাথায় সে তিন ফুট নয় ইঞ্চি উঁচু ও লম্বায় হচ্ছে নয় ফুট আট ইঞ্চি! এবং তার দেহটাকে তাঁবুতে বয়ে আনবার জন্যে আট-আট জন বলবান কুলির দরকার হয়েছিল!

এই প্রথম নরখাদকের মৃত্যু-সংবাদ দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়তে দেরি লাগল না। স্বচক্ষে তার গা থেকে ছাড়ানো চামড়াটা দেখাবার জন্যে বহুদূর থেকে অসংখ্য কৌতূহলী লোক আমার তাঁবুর কাছে এসে ভিড় করতে লাগল।

॥ সাত ॥

প্রথম নরখাদকের মৃত্যুর পরই আমরা যে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম, এ-কথা কেউ যেন মনের কোণেও ঠাঁই না দেন।

দ্বিতীয় নরখাদক যে এখনও বেঁচে আছে, এ সত্য আমরা ভুলিনি। ভোলবার উপায়ও ছিল না। কারণ কিছুদিন যেতে না যেতেই সে নিজেই এসে তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদের সচেতন করে তুললে।

রেলপথের ইনস্পেকটার এক রাত্রে নিজের বাংলোর ভিতরে বসে আছেন, হঠাৎ বাইরের বারান্দা থেকে একটা শব্দ এল—কে যেন সেখানে দুম দুম করে পা ফেলে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে! ইনস্পেকটার ভাবলেন, বোধ হয় কোনও কুলি অতিরিক্ত মাতাল হয়ে বারান্দায় এসে গোলমাল করছে! তিনি রেগে-মেগে ধমক দিলেন, 'ভাগো হিঁয়াসে।'

ভাগ্যে তিনি দরজা খুলে বাইরে আসেননি! কারণ বারান্দার উপরে ওঁত পেতে বসেছিল, একটা সিংহ! মানুষ ধরতে না পেরে সিংহটা তখন নাচার হয়ে ইনস্পেকটারের দুটো পোষা ছাগলকে বধ করলে। এবং সেইখানে বসে-বসেই ছাগলদুটোকে পেটে পুরে তবে বিদায় হল।

খবর পেয়ে তখনই আমি ঘটনাস্থলে গিয়ে হাজির হলুম।

সমস্ত দেখে-শুনে স্থির করলুম, সিংহের শুভাগমনের জন্যে আজকের রাতটা আমি এইখানেই কাটিয়ে দেব।

কাছেই একটা খালি লোহার ঘর ছিল এবং তার দেওয়ালে ছিল একটা গর্ত—যেখান দিয়ে বন্দুক ছোড়বার খুব সুবিধা! সন্ধ্যার আগেই ঘরের বাইরে বেঁধে রাখা হল তিনটে ছাগল এবং ভিতরে গিয়ে আশ্রয় নিলুম আমি! ছাগলগুলো বাঁধা রইল একটা আড়াই মন ভারী রেলের সঙ্গে।

প্রায় সারা রাত কেটে গেল অত্যন্ত নিস্তব্ধতার ভিতর দিয়ে। ভোর যখন হয়-হয়, তখন হঠাৎ শুনতে পেলুম, ছাগল তিনটের সঙ্গে সেই ভারী রেলটা কে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে যাচ্ছে! এ সিংহ না হয়ে যায় না! গর্তের ভিতরে বন্দুকের নল চালিয়ে তখনই তার উদ্দেশে ঘন ঘন গুলিবৃষ্টি করলুম—কিন্তু অন্ধকারে আমার সমস্ত গুলিই ব্যর্থ হল।

সকাল হলে পর দলবল নিয়ে আমি সিংহের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লুম। মাটির উপরে ছাগল ও রেল টেনে নিয়ে যাবার স্পষ্ট চিহ্ন রয়েছে, সুতরাং সিংহটা কোন দিকে গেছে তা বুঝতে আমাদের কোনওই কষ্ট হল না।

প্রায় একপোয়া পথ পার হয়েই শোনা গেল, একটা ঝোপের আড়াল থেকে সিংহের গর্জন!

আমরা সেই ঝোপটার দিকে এগুতে লাগলুম। সিংহটা তখন খাপ্পা হয়ে আমাদের দিকে ছুটে এল—কিন্তু জঙ্গলের ভিতর থেকে বেরুল না। তাকে ছুটে আসতে দেখেই আমার সঙ্গের লোকজন যে যেদিকে পারলে চম্পট দিলে, কেবল মি. উইঙ্কলার ছাড়া।

খানিক পরে সিংহের আর কোনও সাড়াশব্দ না পেয়ে ঝোপের ভিতরে আমরা ইট-

পাটকেল ছুড়তে লাগলুম। তবু সব চুপচাপ। তারপর উঁকিঝুকি মেরেই বেশ বোঝা গেল, সিংহ আর সে-অঞ্চলে নেই, আমাদের ভয় দেখিয়েই সে সরে পড়েছে। তিনটে ছাগলের ভিতরে মাত্র একটাকে সে সাবাড় করতে পেরেছে।

অসমাপ্ত ফলারের লোভে সিংহটা হয়তো আবার ফিরে আসবে।—এই ভেবে আমি সেইখানেই খুব উঁচু একটা মাচান খাড়া করালুম এবং রাতের অন্ধকার নামবার আগেই তার উপরে চড়ে বসলুম। কিন্তু আবার আজকের রাতটা একেবারে অনিদ্রায় কাটাবার শক্তি আমার ছিল না। তাই আমার বন্দুক-বাহক মহিনাকেও সঙ্গে রাখলুম—পালা করে রাত জাগবার জন্যে।

মাচানের উপরে শুয়ে আমি ঢুলছিলুম। হঠাৎ মহিনা আমার হাত টেনে ধরে চুপিচুপি বললে, 'সিংহ!'

এক লহমায় আমার তন্দ্রা গেল ছুটে। ধড়মড়িয়ে উঠে বসে বন্দুকটা চেপে ধরে অপেক্ষা করতে লাগলুম।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। একটা ঝোপ সশব্দে দুলে উঠল এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা সিংহ খুব সন্তর্পণে ঝোপের ভিতর থেকে বেরিয়ে মরা ছাগলদুটোর দিকে এগিয়ে আসতে লাগল।

সিংহটা যখন প্রায় আমার মাচানের নীচে এসে পড়ল, তখনই আমি একসঙ্গে বন্দুকের দুটো নলের গুলিই ত্যাগ করলুম। সানন্দে আমি দেখলুম, দু-দুটো গুলির চোটে সিংহটা তখনই মাটির উপরে আছড়ে পড়ল। একেবারে তাকে সাবাড় করবার জন্যে তাড়াতাড়ি আমি আর একটা বন্দুক নেবার জন্যে ফিরলুম—কিন্তু সেই ফাঁকে সিংহটা চটপট উঠে পড়ে সাঁৎ করে অদৃশ্য হয়ে গেল—তার দিকে বারংবার গুলি ছুড়েও কোনও ফল হল না।

কিন্তু সিংহটা যখন রীতিমতো জখম হয়েছে, তখন কাল সকালে তাকে যে আবার খুঁজে বার করতে পারব, এ বিশ্বাস আমার ছিল,—তাই হতাশ হয়ে পড়লুম না।

সকালের আলো যেই পদ্মের মতো পবিত্র শুভ্রতা নিয়ে পূর্বাকাশে ফুটে উঠল, অমনি আমাদেরও খোঁজা শুরু হল। আধ-ক্রোশ পর্যন্ত মাটির উপরে রক্তের দাগ পাওয়া গেল। কিন্তু তারপরেই এল শুকনো পাহাড়ে-জমি, রক্তের দাগ সেখানে এরই মধ্যে শুকিয়ে মিলিয়ে গিয়েছে।

মিছেই হল আমাদের সমস্ত খোঁজাখুঁজি, পলাতক সিংহের আর কোনও পাত্তা পাওয়া গেল না।

এর পর একে একে দশ দিন কাটল, পশুরাজের কোনওই সন্ধান নেই। আমরা মনে মনে এই ভেবে আশ্বস্ত হলুম যে, আহত সিংহটা হয়তো বনের ভিতরেই অক্কা লাভ করেছে! তবু বলা তো যায় না, কুলিদের বলে দিলুম রাত্রিবেলায় খুব সাবধানে থাকতে।

কথায় বলে, সাবধানের মার নেই! ভাগ্যিস কুলিরা আমার উপদেশ শুনেছিল!

কারণ এক রাত্রে তাঁবুর ভিতর থেকে হঠাৎ শুনলুম, বাইরের গাছের উপর থেকে একদল কুলি মহা আতঙ্কে চিৎকার করছে!

চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, 'ব্যাপার কী?'

উত্তরে শুনলুম, একটা সিংহ তাদের ধরবার জন্যে গাছের উপরে চড়বার চেষ্টা করছে!

চাঁদ তখন মেঘে ঢাকা পড়েছে—চারিদিকে পিচের মতো কালো অন্ধকার। এ সময়ে তাঁবুর বাইরে যাওয়া আর আত্মহত্যা করা, একই কথা! কাজেই সিংহটাকে ভয় দেখাবার জন্যে তাঁবুর ভিতর থেকেই বারকয়েক বন্দুক ছুড়লুম। ফলে, সে আহত না হলেও আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল। সে আর গাছে চড়বার চেষ্টা না করে পালিয়ে গেল!

পরদিন প্রভাতে শুনলুম, কেবল গাছ নয়, সিংহটা প্রত্যেক তাঁবুর ভিতরেই মাথা গলাবার চেষ্টা করেছিল! বিষম তার আস্পর্ধা!

আবার যদি পশুরাজ ক্ষুধার চোটে এদিকে আসে, এই আশায় আমি সেই কুলিদের গাছে উঠে আজকের রাতটা কাটাব বলে ঠিক করলুম।

সন্ধ্যার সময়ে গাছে উঠছি, হঠাৎ একটা ডাল থেকে একটা বিষধর সর্প ফোঁশ করে উঠল—আমিও তড়াক করে মাটিতে এসে অবতীর্ণ হলুম।

একজন কুলি একটা লম্বা ডান্ডার চোটে সাপটার কামড়াবার সাধ তখনই মিটিয়ে দিলে।

সে রাত্রি ছিল খুবই সুন্দর—আকাশে মেঘ নেই, চাঁদের আলোয় চারিদিক ধবধব করছে—সমস্ত বনটাকে দেখাচ্ছে একখানি চমৎকার ছবির মতো।

রাত দুটো পর্যন্ত আমি জেগে রইলুম। তারপর মহিনার হাতে বন্দুক দিয়ে একটু ঘুমিয়ে নেবার চেষ্টা করলুম।

গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে দিব্য আরামে ঘুমোচ্ছি, আচম্বিতে কেন জানি না, আমার ঘুম গেল ভেঙে!

মহিনাকে শুধোলুম, সে সন্দেহজনক কিছু দেখেছে কি না!

মহিনা বললে, না।

চারিদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করে আমিও কিছু আবিষ্কার করতে পারলুম না।

আশ্বস্ত হয়ে আবার নিদ্রাদেবীকে ডাকবার উপক্রম করছি, হঠাৎ মনে হল, দূরের ওই নীচু ঝোঁপের কাছে কী যেন একটা নড়ে উঠল!

ভালো করে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকেই বুঝলুম, না—আমার ভুল হয়নি! সিংহই বটে। সে-ও আমাদের লক্ষ করছে!

হতভাগার সাধ, আমাদের ধরে পেটের ভিতরে পোরে। সেই আশায় সে চোরের মতো এ-ঝোপ থেকে টপ করে ও-ঝোপে গিয়ে ধীরে ধীরে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে! পরিষ্কার চাঁদনি রাত। তার সমস্ত লুকোচুরিই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি, এটুকু তার মাথায় ঢুকল না! তার ভাবভঙ্গি দেখেই স্পষ্ট বোঝা গেল যে, মানুষ-শিকারের ভীষণ খেলায় সে খুবই ওস্তাদ।

আমি আর ইতস্তত করলুম না, কী-জানি দেরি করলে সে যদি আবার আমাদের ফাঁকি দেয়! যখন সে আমাদের কাছ থেকে মাত্র বিশ গজ দূরে আছে, তার বুক টিপ করে তখনই

আমি বন্দুকের ঘোড়া টিপলুম। গুলি যে তার বুকে গিয়ে লাগল, এও আমি বুঝতে পারলুম, কিন্তু গুলি খেয়েই সে লাফাতে লাফাতে পালাতে লাগল। উপরি উপরি আরও তিনবার বন্দুক ছুড়লুম, এবং আবার তার আর্ত গর্জন শুনে বুঝতে পারলুম যে, আমার শেষ গুলি ঠিক তার গায়ে লেগেছে! কিন্তু তবু সে মাটিতে কুপোকাত হল না,—জঙ্গলের ভিতরে কোথায় মিলিয়ে গেল!

অধীর ভাবে অপেক্ষা করতে লাগলুম—কখন ভোর হয়, কখন ভোর হয়!

রাত কাটল। আমিও গাছ থেকে নামলুম। মহিনা এবং আর একজন লোককে নিয়ে আমি চললুম আহত সিংহের খোঁজে।

মাটির উপরে রক্তের রেখা! পথ ভোলবার সম্ভাবনা নেই।

বেশিদূর এগুতে হল না। জঙ্গলের ভিতরে খুব কাছেই ওই তো সিংহের গর্জন! ঝোপঝাপের ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখলুম, সিংহটা আমাদের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিপাত করে গরর গরর করছে—তার ভয়ানক দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়েছে!

সাবধানে লক্ষ্য স্থির করে গুলি ছুড়লুম—পরমুহূর্তে কান-ফাটানো ও প্রাণ-কাঁপানো চিৎকার করে আমাদের উপরে সে ঝাঁপিয়ে পড়ল!

আবার আমি বন্দুক ছুড়লুম—গুলির চোটে মাটিতে ঠিকরে পড়েই আবার সে দাঁড়িয়ে উঠল এবং প্রচণ্ড বেগে হাঁ করে আমাদের দিকে ধেয়ে এল—মূর্তিমান মৃত্যুর মতো!

ফের গুলি ছুড়লুম—কিন্তু তবু সে দুর্দান্ত সিংহের গতিরোধ হল না। এ সিংহ কি অমর?

আমার পাশেই ছিল মহিনা, তার হাত থেকে অন্য বন্দুকটা নেবার জন্যে পাশের দিকে হাত বাড়ালুম—কিন্তু বন্দুক পেলুম না। চমকে চেয়ে দেখি, মহিনা আমার পাশে নেই! কী সর্বনাশ!

সিংহের সেই ভয়াবহ মূর্তি দেখে মহিনা ও তার সঙ্গী পিঠটান দিয়েছে এবং এতক্ষণে তারা আমার বন্দুক ও তাদের পৈত্রিক প্রাণ নিয়ে খুব ঢ্যাঙা একটা গাছের টঙে গিয়ে উঠেছে!

আমার সামনে রুদ্রমূর্তি সিংহ এবং আমার হাতে একটা শূন্য বন্দুক! অবস্থাটা খুব আরামের নয়।

সে-অবস্থায় কী আর করি,—আমিও মহিনার পথ অনুসরণ করে দৌড়ে গিয়ে একটা গাছের উপরে চড়বার চেষ্টা করতে লাগলুম।

কিন্তু আমার সে-চেষ্টা ব্যর্থ হত নিশ্চয়ই,—যদি-না আমার একটা গুলি লেগে তার পিছনের একখানা পা ভেঙে না যেত। কিন্তু সেই অবস্থাতেই, খোঁড়াতে খোঁড়াতে সে আর একটু হলেই আমাকে ধরে ফেলেছিল!

বদমাইশ মানুষখেকো সিংহটা যখন দেখলে আমিও তার নাগালের বাইরে এসে পড়েছি, তখন সে আবার খোঁড়াতে খোঁড়াতে ঝোপের দিকে ফিরে চলল।

কিন্তু ততক্ষণে মহিনা হাত বাড়িয়ে আমাকে আমার বন্দুকটা ফিরিয়ে দিয়েছে এবং আমিও কালবিলম্ব করলুম না, আর এক গুলিতে দুরাত্মাকে একেবারে মাটির উপরে পেড়ে ফেললুম।

সিংহটা আর নড়েও না, চড়েও না—আপদ একেবারে চুকে গেছে!

বিপুল আনন্দে ও উৎসাহে আমি গাছের আশ্রয় ছেড়ে আবার মাটির উপরে অবতীর্ণ হলুম। কিন্তু কী ভয়ানক ব্যাপার, সিংহটা তো মরেনি, আমাকে দেখেই এক লাফে সে উঠে দাঁড়াল, এবং জ্বলন্ত চক্ষে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে আমার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল!

কিন্তু এবারে আমার হাতে ছিল ভরতি বন্দুক—একটা গুলি তার বুকে ও আর একটা তার মাথায় ছুড়তেই সিংহটা হল পপাত ধরণীতলে! কিন্তু তখনও সে কাবু হয়ে পড়ল না, বিষম বিক্রমে মাটির উপর থেকে একটা গাছের ডাল তুলে নিয়ে কামড়াতে কামড়াতে সে প্রাণত্যাগ করল—সত্যসত্যই বীরের মতো!

ক্রমাগত বন্দুকের আওয়াজ শুনে ছাউনির কুলিরা ততক্ষণে ঘটনাস্থলে এসে হাজির হয়েছে! তাদের শেষশত্রুর পতন দেখে তারা যেন আনন্দে উন্মত্ত হয়ে উঠল!

সিংহের উপরে তাদের এমন আক্রোশ যে, আমি যদি বাধা না দিতুম, তাহলে মৃত পশুরাজের দেহটা তারা নিশ্চয়ই তখনই টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলত!

মাপজোক নিয়ে দেখা গেল, দ্বিতীয় সিংহটা মাথায় তিন ফিট সাড়ে এগারো ইঞ্চি উঁচু এবং লম্বায় নয় ফিট ছয় ইঞ্চি। তার দেহের ভিতর থেকে পাওয়া গেল সাত-সাতটা গুলি!

দ্বিতীয় নরখাদকের মৃত্যু-সংবাদ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে-সঙ্গেই আবার আমার তাঁবুর কাছে দেশ-বিদেশের লোক এসে জমায়েত হল—শয়তানের দেহ এবং শয়তানকে যে বধ করেছে তাকে দেখবার জন্যে সকলের আগ্রহের আর সীমাপরিসীমা নেই!

সবচেয়ে আনন্দিত হলুম আমি,—যখন পলাতক কুলিরা আবার ফিরে এসে কাজে যোগ দিলে। একটি সুন্দর রৌপ্যপাত্রে তাদের কাছ থেকে আমি যে অভিনন্দন-লিপি পেলুম, তা হচ্ছে এই;

'মহাশয়,

আমরা—আপনার কর্মচারীরা,—এই রৌপ্যপাত্রটি স্মৃতিচিহ্ন-রূপে আপনাকে উপহার দান করছি। কারণ আপনার সাহসের জন্যেই আমরা দুটো মানুষখেকো সিংহের কবল থেকে উদ্ধার পেয়েছি। আপনার নিজের প্রাণকে বিপদগ্রস্ত করেও আপনি আমাদের রক্ষা করেছেন। আপনি দীর্ঘজীবন, সুখ ও শান্তি লাভ করুন।

আপনার অনুগত ও কৃতজ্ঞ ভৃত্য
(বাবু) পুরুষোত্তম হুরজি পুরমার
(রেলপথের ওভারসিয়ার)

তারিখ—সাভো, ৩০ জানুয়ারি, ১৮৯৯

এই রৌপ্যপাত্রটি আমি আমার গৌরবজনক ও বহুশ্রমলব্ধ উপহার বলে সযত্নে রক্ষা করছি।

॥ আট ॥

রেল-রাস্তা তখন আঠি নদীর তীরে গিয়ে পৌঁছেছে।

আমার বন্ধু ডাক্তার ব্রক হঠাৎ একদিন এসে হাজির হয়ে বললেন, 'তোমার সঙ্গে কাল শিকার করতে যাব। আর, আমাকে একটা সিংহ খুঁজে দিতে হবে।'

আমি বললুম, 'তথাস্তু।'

পরদিন সকালে উঠেই আমরা খাবার, পানীয়, বন্দুক ও লোকজন নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম।

ছাউনিতে রোশন খাঁ নামে আমার এক চাকর ছিল, সে হঠাৎ বায়না ধরে বসল, তার শিকার দেখবার শখ হয়েছে, সে-ও আমাদের সঙ্গে যাবে।

রোশন খাঁ জাতে পাঠান, বয়সে যুবক, দেখতে সুন্দর, কাজে খুব চটপটে, আর তার স্বভাবটিও সৎ।

মনে মনে ভাবলুম, রোশন খাঁ যখন শিকারে গেলে আমাদের লাভও নেই লোকসানও নেই, তখন তার সাধ আর অপূর্ণ রাখি কেন? চলুক সে আমাদের সঙ্গে!

কিন্তু তখন ভাবতে পারিনি যে, রোশন খাঁ আমাদের সঙ্গে না গেলে এ যাত্রা শিকার থেকে আমাকে আর ফিরে আসতে হত না! দুনিয়ায় কিছুই তুচ্ছ নয়!

মাইল কয়েক এগিয়েও শিকার করবার মতো কিছুই পাওয়া গেল না।

তবু আমাদের উৎসাহের অবধি নেই! কারণ এ হচ্ছে এমন ঠাঁই যে, ঝোপঝাপের ভিতর থেকে যে-কোনও মুহূর্তে একটা প্রকাণ্ড সিংহ ঝাঁকড়া চুলে ঝাঁকানি দিয়ে লাফিয়ে পড়তে পারে! সাক্ষাৎ মৃত্যু লুকিয়ে আছে এখানে যেখানে-সেখানেই। একটু অসাবধান হয়েছ কী, যমের বাড়ির ফটক খুলে গেছে তোমার সামনে!

জঙ্গলের ভিতরে দূর থেকেই দেখা গেল, খানিকটা খোলা সবুজ জমি। সেইখানে ষাঁড়ের মতন বড়ো কৃষ্ণসার জাতীয় একদল হরিণ চরে বেড়াচ্ছে।

আমি শিস দিয়ে সেইদিকে ডাক্তার ব্রকের দৃষ্টি আকর্ষণ করলুম।

ব্রক তখনই পরম উৎসাহে তাদের দিকে এগিয়ে গেলেন, আমি সেইখানে বসে বসে দেখতে লাগলুম, ব্যাপারটা কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়!

ডাক্তার ব্রকের মূর্তি যখন বনপথের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল, রোশন খাঁ তখন পিছন থেকে উত্তেজিত স্বরে বলে উঠল, 'সায়েব দ্যাখো, বুনো-আদমিরা আসছে।'

আমি কিন্তু তা শুনে উত্তেজিত হলুম না, কারণ ভারতবাসীরা আফ্রিকার লোকদের বুনো-আদমি বলেই ডাকে।

পাঁচজন সুদীর্ঘ ও বলিষ্ঠ মাসাই-জাতীয় পুরুষ আমার সামনে এসে দাঁড়াল—তাদের প্রত্যেকেরই হাতে লম্বা এক-একটা বর্শা।

একজন আমাকে শুধোলে, 'হুজুরের কী ইচ্ছা?'

আমি বললুম, 'সিংহ।'

সে বললে, 'আমার সঙ্গে আসুন। আমি আপনাকে অনেক সিংহ দেখাব।'

তখনই সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলুম, 'কতদূরে আমাকে যেতে হবে?'

—'খুব কাছেই।'

চারিদিকে চেয়ে ব্রকের খোঁজ করলুম, কিন্তু তাঁর টিকিটি পর্যন্ত দেখা গেল না। কিন্তু পাছে এমন সুযোগ হাতছাড়া হয়, সেই ভয়ে ব্রককে ফেলেই আমি মাসাইদের সঙ্গে অগ্রসর হলুম।

দু-মাইল পথ হাঁটবার পর মনে হল, সিংহ তো 'খুব কাছেই' নেই। আমি অধীর ভাবে মাসাইদের দিকে ফিরে বললুম, 'এই কি তোমাদের খুব কাছে? কোথায় তোমাদের অনেক সিংহ?'

কিন্তু জবাব পেলুম না। আরও খানিকটা এগিয়ে আমি আবার জিজ্ঞাসা করলুম, 'কই, সিংহ কোথায়?'

একজন মাসাই থিয়েটারি ঢঙে সুমুখের দিকে বর্শাটা বাড়িয়ে দিয়ে বললে, 'দেখুন প্রভু, ওই দেখুন সিংহ!'

তাই তো, একটা সিংহী দূরে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে তো বটে!

একটা গাছের তলাতেও সন্দেহজনক কী যেন একটা দেখা যাচ্ছে! ভালো করে দেখে মনে হল, না বিশেষ-কিছু নয়, বোধহয় গাছের গুঁড়িতে ডালপালা দুলছে।

আমি তাড়াতাড়ি ছুটলুম—পাছে সিংহীটা আমার চোখে ধুলো দিয়ে সরে পড়ে! আচম্বিতে আমার পাশের দিক থেকে কে হুঙ্কার দিয়ে উঠল! চমকে ফিরে দাঁড়ালুম। যে-গাছটা দেখে প্রথমেই আমার সন্দেহ জেগেছিল, তার গুঁড়ির পাশ থেকে মুখ বাড়িয়ে আছে কালো-কেশর-ওয়ালা মস্ত এক সিংহ!

আমার আর তার মাঝখানকার ব্যবধান সত্তর গজের বেশি হবে না।

খানিকক্ষণ আমরা দুজনেই দুজনের দিকে স্থিরভাবে তাকিয়ে রইলুম। সে একবার প্রকাণ্ড হাঁ করে মুখ খিঁচিয়ে আমাকে রীতিমতো এক ধমক দিলে, তারপর সিংহীটার দিকে তাড়াতাড়ি চলে গেল।

ওই সিংহীটা হচ্ছে নিশ্চয়ই এর বউ! এ গাছের তলা দেখে দেখতে পেয়েছিল, অসভ্য এক মানুষ তার বউয়ের পিছু পিছু ছুটছে! সে পশুরাজ, মানুষের এত বড়ো আস্পর্ধা সহ্য করবে কেন? কাজেই খাপ্পা হয়ে ধমক দিয়ে বোধ হয় বলে উঠেছিল—খবরদার, বেয়াদপ!

যেখানে আমি দাঁড়িয়েছিলুম, সেখান থেকে বন্দুক ছোড়ার সুবিধা ছিল না। কাছেই একটা ভালো জায়গা বেছে নেবার জন্যে আমিও তার উপরে চোখ রেখে দৌড়োতে শুরু করলুম। কিন্তু আরে, এ আবার কী?

পশুরাজ যে-গাছের পিছন থেকে এইমাত্র বেরিয়ে এল, তারই পিছন থেকে আবার লাফাতে লাফাতে বেরিয়ে এল আরও চার-চারটে সিংহী! পশুরাজের অন্তঃপুরে কত সিংহী আছে? মহা বিস্ময়ে আমি যেন থ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লুম!

চোখের পলক পড়তে না পড়তে তিনটে সিংহী জঙ্গলের ভিতরে মিলিয়ে গেল, কিন্তু

চতুর্থ সিংহীটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে—আমাকে নয়—আমার দলের লোকজনদের উত্তেজিত ভাবভঙ্গি অবাক হয়ে দেখতে লাগল।

এমন সুযোগ কি ছাড়া যায়? খুব টিপ করে আমি বন্দুক ছুড়লুম এবং পরমুহূর্তে সিংহীটা লাফ মেরে পাশের ঝোপের ভিতরে গিয়ে পড়ল।

উঁচু হয়ে উঁকি দিয়ে দেখলুম, আমার গুলি ঠিক তার গায়ে লেগেছে, কারণ সে মাটিতে চিত হয়ে পড়ে ছটফট করছে এবং গজরাতে গজরাতে শূন্যে থাবা মারছে!

সে আর বেশিক্ষণ বাঁচবে না বুঝে আমার পিছনের লোকদের ডেকে বললুম, 'তোমরা এখানে পাহারা দাও!'—বলেই আমি সেই কালো-কেশরওয়ালা সিংহের উদ্দেশ্যে ছুটলুম।

সিংহটা বেশিদূরে যায়নি। সে মাঝে মাঝে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বোঝবার চেষ্টা করছিল, আমার আসল মতলবখানা কী? পরে আমার লোকজনদের মুখে শুনেছিলুম আমার গুলি খেয়ে সিংহীটা যখন আর্তনাদ করে ওঠে, তখন সে অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে বোধহয় ভাবছিল যে, এগিয়ে এসে সিংহীকে উদ্ধার করবে কি না! তারপরে বোধ করি 'আপনি বাঁচলে বাপের নাম' এই ভেবে আবার সে দৌড়োতে শুরু করে।

সিংহটা যখন বুঝলে আমি এখন তারই পিছু নিয়েছি, তখন সে দৌড় বন্ধ করে আবার আর-একটা গাছের তলায় গিয়ে ঝোপের ভিতরে সর্বাঙ্গ ঢেকে দাঁড়াল—দেখা যেতে লাগল কেবল তার মাথাটা।

সেইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খুব সতর্ক দৃষ্টিতে সে আমার প্রত্যেকটি ভাবভঙ্গি নিরীক্ষণ ও মাঝে মাঝে ক্রুদ্ধ গর্জন করতে লাগল—যেন সে বলতে চায়, 'দ্যাখো, ভালো হচ্ছে না কিন্তু! বার বার আমার পেছনে লাগলে মজাটা টের পাইয়ে দেব—হ্যাঁ!'

তার চাউনিটা আমারও মোটেই ভালো লাগছিল না,—কাছে কোনও গাছ-টাছ থাকলে আমি নিশ্চয়ই আগে তার উপরে গিয়ে চড়তুম, তবে বন্দুক ছুড়তুম!

সে আমার কাছ থেকে তখন মোটে পঞ্চাশ গজ তফাতে আছে।

যা থাকে কপালে—এই ভেবে আমি হাঁটু গেড়ে বসে পড়লুম এবং তার মাথা টিপ করে বন্দুক তুললুম। আমি বেশ বুঝলুম যে, যদি প্রথম গুলি ঠিক জায়গায় না লাগে, তাহলে আর আমার বাঁচোয়া নেই,—বিদ্যুতের ঝড়ের মতো সে একেবারে আমার ঘাড়ের উপরে এসে পড়বে!

টিপলুম আমার বন্দুকের ঘোড়া! ধ্রুম করে আওয়াজের সঙ্গে-সঙ্গেই সেই মস্ত বড়ো ঝাঁকড়াচুলো কালো মাথাটা গেল অদৃশ্য হয়ে! এবং পরমুহূর্তে ঝোপের ভিতর থেকে ঘন ঘন এমন হুঙ্কার ও গর্জন উঠল যে, আমার বুক সন্ত্রস্ত হয়ে ধড়ফড় করতে লাগল। এবং পাছে সে সামলে উঠে ঝোপ থেকে বেরিয়ে আমাকে আক্রমণ করতে আসে, এই ভয়ে ঝোপের ভিতরে আন্দাজে আন্দাজেই আমি আধ-ডজন গুলি বৃষ্টি করলুম। খানিক পরেই সব চুপচাপ।

পশুরাজের লীলাখেলা নিশ্চয়ই সাঙ্গ হয়ে গেছে!

একজন লোককে সেইখানে পাহারায় রেখে আমি আবার ঝোপঝাপ, পাথর ও টিপি

প্রভৃতি টপকে সেই সর্বপ্রথম সিংহীর সন্ধানে ছুটলুম। আমার আশার যেন শেষ নেই।

এতক্ষণে আমার পিছনে লোক জড়ো হয়েছে প্রায় ত্রিশজন! আফ্রিকার জঙ্গলে সবই আজব কাণ্ড। তুমি শিকারে বেরুলে পর দেখবে, জনমানবহীন গভীর অরণ্যের যেখান-সেখান থেকে যেন মাটি ফুঁড়ে মানুষ আবির্ভূত হচ্ছে! এরা আছে মৃত শিকারের পশুর মাংসের লোভে।

আমি ইশারায় তাদের বললুম, যে জঙ্গলের ভিতরে সর্বপ্রথম সিংহীটা আশ্রয় নিয়েছিল, সার বেঁধে সেইদিকে অগ্রসর হতে।

তারা সার বেঁধে বর্শা উঁচিয়ে বিকট চিৎকার করতে করতে যেই জঙ্গলের কাছে গিয়ে হাজির হল, সিংহীটাও অমনি ভয় পেয়ে খোলা জমির উপরে বেরিয়ে এল।

আমি বন্দুক ছুড়লুম। গুলি সিংহীর গায়ে লাগল কি না জানি না, সে কিন্তু আবার ঝোপের মধ্যে ঢুকে পড়ল। কী আর করি, ব্রক ফিরে না আসা পর্যন্ত ওকে রেহাই দেওয়া যাক,—এই ভেবে আমি যে-সিংহটাকে গুলি করেছিলুম, আবার তারই খোঁজ করতে লাগলুম।

কিন্তু যে-লোকটাকে সেখানে পাহারায় রেখে গিয়েছিলুম, একলা থাকতে ভয় পেয়ে সে কোথায় লম্বা দিয়েছে! বনের সব ঝোপই প্রায় একরকম দেখতে, কোন ঝোপে সিংহটা আছে তা কে জানে!

কিন্তু এত বড়ো শিকার হাতছাড়া করতে আমার মন সরল না। তাই সবাই মিলে আমরা প্রত্যেক ঝোপঝাপ তন্ন তন্ন করে খুঁজতে লাগলুম।

অবশেষে একজন সানন্দে চিৎকার করে বললে, 'ওই যে, ওইখানে সিংহটা রয়েছে।'—কিন্তু বলেই সে লম্বা লম্বা লাফ মেরে ঝোপের কাছ থেকে পালিয়ে গেল।

ঝোপের কাছে এগিয়ে গিয়ে আমি দেখলুম—সত্য, এমন সিংহ শিকার করতে পারা ভাগ্যের কথাই বটে!

কিন্তু তখনও সে মরেনি। সে সটান মাটির উপরে পড়ে আছে বটে, কিন্তু প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে তার দেহের দুই পাশ উঠছে ও নামছে! তার চারপাশ ঘিরে এ[illegible] লোক উত্তেজিত ভাষায় গোলমাল করছে, তবু সে উঠে পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারছে না দেখে আমার দৃঢ়বিশ্বাস হল, তার অন্তিম মুহূর্তের আর দেরি নাই। কাজেই আমি তাকে আরও ভালো করে দেখবার জন্যে তার মাথার কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম।

কিন্তু যেমন আমার সঙ্গে চোখোচোখি হওয়া, সিংহটা অমনি তার সমস্ত মৃত্যু-যন্ত্রণা ভুলে গেল! ভয়ংকর হুঙ্কারের সঙ্গে সঙ্গে এক লম্ফে সে খাড়া হয়ে উঠল—তাকে দেখলে কে বলবে যে, সে আহত?—দুই চক্ষে তার দপ দপ করে জ্বলছে প্রচণ্ড ক্রোধের অগ্নি, তার হাঁ করা মুখ যেন নরকের গহ্বর এবং বড়ো বড়ো নিষ্ঠুর দাঁতগুলো চক চক করছে ধারালো অস্ত্রের মতো! তেমন বিভীষণ মূর্তি আমি কখনও দেখিনি এবং আর কখনও দেখতেও চাই না! নিতান্ত নির্বোধের মতোই আজ আমি সাক্ষাৎ যমের খপ্পরে এসে পড়েছি,—তার আর আমার মাঝখানে তফাত আছে মাত্র তিন হাত!

সিংহের গাত্রোত্থানের সঙ্গে-সঙ্গেই, যারা এতক্ষণ দাঁড়িয়ে মজা দেখছিল তারা সবাই

ঠিক এক সঙ্গেই ঝড়ের মুখে শুকনো পাতার মতো এদিকে-ওদিকে ঠিকরে পড়ল এবং বানরের মতো ক্ষিপ্র গতিতে এক-একটা গাছের উপরে উঠতে লাগল।

রোশন খাঁ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে তখনও সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, পিছনে হটে আসতে গিয়ে আমি একেবারে তারই উপরে গিয়ে পড়লুম। বন্দুক আমার হাতে তৈরি ছিল, দিলুম তার ঘোড়া টিপে। সিংহটা তখন আমার মাথার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্যে হুমড়ি খেয়ে বসেছিল, গুলির চোটে তৎক্ষণাৎ সে চিতপাত হয়ে পড়ল—কিন্তু তারপরেই সে এক লাফে আবার দাঁড়িয়ে উঠল এবং এমন বিদ্যুতের মতো আমার দিকে ধেয়ে এল যে আমি আর বন্দুক তোলবারও সময় পেলুম না—তবু সেই অবস্থাতেই আর একবার গুলিবৃষ্টি করলুম! সে আবার আছড়ে পড়ল—এবং তখনই আবার লাফিয়ে উঠে আমার উপরে এসে পড়ল! তখন চক্ষে আমার অন্ধকার—জীবনের শেষমুহূর্ত উপস্থিত!

কেউ আমাকে বাঁচাতে পারত না, কিন্তু তবু আমি বেঁচে গেলুম দৈবগতিকে!

এতক্ষণে রোশন খাঁর হুঁশ হল—সে বুঝতে পারলে যে, মৃত্যু তার সামনে এসেছে। অকস্মাৎ প্রাণপণে চিৎকার ও আর্তনাদ করতে করতে সে তিরবেগে পালাতে লাগল!

রোশন খাঁর পলায়নই আমার প্রাণরক্ষার কারণ! সে পালাতে গিয়ে ক্রোধে-উন্মত্ত সিংহের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে এবং পশুরাজ তখন আমাকে ছেড়ে রোশন খাঁর পিছনেই ছুটে গেল!

রোশন খাঁ পালিয়ে আমার প্রাণ তো বাঁচালে, এখন তার প্রাণ বাঁচাতে হবে আমাকে। পলক ফেলবার আগেই ফিরে দাঁড়িয়ে আমি আবার বন্দুক ছুড়লুম—কিন্তু সর্বনাশ! গুলি সিংহের গায়ে লাগল না! আমি ক্ষিপ্র হাতে বন্দুকে আবার টোটা ভরলুম বটে, কিন্তু সিংহ তখন একেবারে হতভাগ্য রোশন খাঁর উপরে গিয়ে পড়েছে, আর তাকে বাধা দেওয়া অসম্ভব!

ঠিক এই সময়ে ছুটতে ছুটতে রোশন খাঁ আড়চোখে ফিরে তাকিয়ে নিজের ভয়ানক অবস্থাটা আন্দাজ করতে পারলে এবং সঙ্গে সঙ্গে দিলে ডান দিকে এক লাফ! সিংহও ফিরে দাঁড়িয়ে তাকে আবার আক্রমণ করতে গেল, এবং এই সময়টুকুই আমার পক্ষে যথেষ্ট হল!

সিংহ তখন মুখ ব্যাদান করে রোশন খাঁকে ধরতে উদ্যত হয়েছে—এমন সময়ে আমার গুলির চোটে সে ডিগবাজি খেয়ে ধরাশায়ী হল। সে আবার উঠে দাঁড়াবার আগেই আমি বন্দুক ছুড়লুম—আর একবার বিপুল গর্জন করে সে স্তব্ধ হল। তার সব লীলাখেলা শেষ।

তখন রোশন খাঁর দিকে ফিরে আমি যা দেখলুম, সে এক মজার দৃশ্য! হাসতে হাসতে আমার পেটে গেল খিল ধরে, আমি মাটির উপরে পড়ে গড়াগড়ি দিতে লাগলুম!

একটা কাঁটাগাছ জড়িয়ে রোশন খাঁ তখন তড়বড় করে উপরে উঠছে, সিংহটা জীবিত কি মৃত তা দেখবার সময় তার নেই, তার দৃষ্টি একেবারে কাঁটাগাছটার টঙের দিকে! কাঁটায় লেগে তার পাগড়ি গেছে উড়ে, তার বাহারি ফতুয়াটা কাঁটাগাছের আর একটা ডালে ঝুলে হাওয়ায় দোল খাচ্ছে এবং তার লম্বা জামাটাও ছিঁড়ে ফালাফালা হয়ে গেছে! সে তবু গাছের উপরে উঠছে আর উঠছে আর উঠছেই—সিংহের কাছ থেকে সে যতটা সম্ভব দূরে থাকতে

চায়! আমি তাকে নীচে নেমে আসবার জন্যে বারবার ডাকাডাকি করতে লাগলুম, কিন্তু তখন তাকে থামায় কার সাধ্য,—একেবারে মগডালে গিয়ে যখন দেখল আর উপরে ওঠবার উপায় নেই, তখন সে থামল! কিন্তু নীচে সিংহটা মরে পড়ে আছে দেখেও সে আর নামতে রাজি হল না! বেচারা ভারী ভয় পেয়েছে, আর পাবেই তো—এ যে তার পুনর্জন্ম!

এইবারে চারিদিককার গাছ থেকে মনুষ্য-বৃষ্টি শুরু হল—এ যাত্রা অনেক কষ্টে তারাও পৈতৃক প্রাণরক্ষা করেছে! মরা পশুরাজকে ঘিরে সবাই মহা স্ফূর্তিতে তাণ্ডব নাচ শুরু করলে। তারপর অভিনয়ও আরম্ভ হল—একজন সাজলে সিংহ, আর একজন আমার অংশ নিলে! মানুষ-সিংহ গজরাতে গজরাতে লাফ-ঝাঁপ মারছে, আর একজন আমার মতো পিছু হটতে হটতে বন্দুকের অনুকরণে আঙুলে তুড়ি দিতে দিতে চ্যাঁচাতে লাগল, 'টা, টা, টা!' তারপর আর একজন রোশন খাঁ হয়ে সেই কাঁটাগাছের দিকে পালাতে লাগল—তার পিছনে পিছনে নকল সিংহ! সেই দৃশ্য দেখে আর-সবাই অট্টহাস্য করে উঠল!

এমন সময়ে ব্রক এসে হাজির। প্রথমেই মৃত সিংহটাকে দেখে তিনি বলে উঠলেন, 'তোমার বরাত খুব ভালো দেখছি!'

আমি তখন সব ঘটনা বর্ণনা করলুম।

তাঁবুতে ফেরবার পথে একটা বুড়ো গন্ডার ভারী গোল বাধালে!

আমরা যেখান দিয়ে যাচ্ছি, সেখানকার জমি বেজায় উঁচু-নীচু। আমি যাচ্ছিলুম আগে আগে।

একটা উঁচু ঢিপির উপরে উঠে সামনেই দেখি, বিতিকিচ্ছি চেহারা নিয়ে মূর্তিমান এক গন্ডার!

হতভাগা জানোয়ারটার মেজাজ এমনি রুক্ষ যে, আমাকে দেখেই সে তড়বড়িয়ে এল তেড়ে।

তাকে বধ করবার সাধ আমার ছিল না, তাই আমি তাড়াতাড়ি সরে পড়লুম। কিন্তু আমি সরে পড়লে কী হবে, পিছনেই আমার সঙ্গীদের দেখে গন্ডারটা তাদের দিকেই ছুটে গেল!

ব্রক খুব দৌড়াতে পারতেন, গন্ডারকে দেখেই তিনি তাঁর সেই ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করতে একটুও দেরি করলেন না। আমি তখন সেইখানেই বসে বসে ব্রক আর গন্ডারের দৌড় দেখতে লাগলুম। আমি বেশ জানতুম যে গন্ডারটা সহজে ব্রককে ছাড়বে না—কিন্তু দৌড়ের জন্যে বিখ্যাত ব্রক যে অনায়াসেই গন্ডারকে কলা দেখাতে পারবেন, এ-বিষয়েও আমার সন্দেহ ছিল না।

কিন্তু হঠাৎ এক দুর্ঘটনা! একটা গাছ লক্ষ্য করে দৌড়োতে দৌড়োতে ব্রক একবার পিছনে ফিরে দেখে নিতে গেলেন, শত্রু কত দূরে আছে! আচম্বিতে একটা গর্তে তার পা ঢুকে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি আছাড় খেয়ে মাটির উপরে সটান লম্বা হয়ে পড়ে গেলেন ও তাঁর হাত থেকে বন্দুকটা ছিটকে অনেক দূরে গিয়ে পড়ল!

আতঙ্কে নিশ্বাস বন্ধ করে আমি উঠে দাঁড়ালুম,—গন্ডারটা এই বুঝি ব্রকের উপরে গিয়ে পড়ল!

কিন্তু একটা আস্ত ও ছুটন্ত মানুষকে এমন অকারণে হঠাৎ মাটির উপরে শুয়ে পড়তে দেখে গন্ডারটা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার মনে ঘোরতর সন্দেহ উপস্থিত হল। বোধহয় সে ঠাওরালে এ হচ্ছে তাকে মুশকিলে ফেলবার কোনও নতুন ফিকির। সে আর এগুল না, চটপট ফিরে দাঁড়িয়ে বোঁ বোঁ করে ছুটে পালাল! ওদিকে ব্রকও গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে অন্যদিকে ফিরে না তাকিয়ে সামনের গাছের দিকে দিলেন বন বন করে পা দুটোকে চালিয়ে! কী কৌতুক! হাসতে হাসতে আবার আমার পেটে খিল ধরে গেল!

যা হোক, সমস্ত বিপদ এড়িয়ে শেষটা আমরা তাঁবুতে ফিরে এলুম। বোধহয় রোশন খাঁ ছাড়া আজ আমাদের সকলেরই মেজাজ খুব খুশি!

এর পরেও আমি মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করতুম, 'হ্যাঁ রোশন খাঁ, আর-একবার তুমি শিকার দেখতে যাবে?'

অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে ও সজোরে ঘন ঘন মাথা নেড়ে সে সাফ জবাব দিত, 'কভি নেহি, কভি নেহি!'

॥ নয় ॥

এখানে সিংহের অত্যাচারের এমন একটি গল্প বলব,—যার নায়ক আমি নই!

পূর্ব আফ্রিকার কিমা নামে জায়গায় ছোট্ট একটি রেলস্টেশন আছে। সে-অঞ্চলের এক সিংহের মনে একদিন হঠাৎ রেলকর্মচারীদের মাংস খাবার জন্যে যারপরনাই লোভের সঞ্চার হল!

দু-দিন পরেই দেখা গেল, স্টেশনের ভিতরে সিংহ-মহাশয় যখন-তখন যাতায়াত শুরু করেছেন। তার ভাব দেখে এটাও বেশ বোঝা গেল যে, কুলি-মজুর থেকে স্টেশন-মাস্টার পর্যন্ত কারুর তোয়াক্কাই সে রাখতে রাজি নয় এবং যাকে বাগে পাবে তাকেই ফলার করে ফেলতেও সে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করবে না!

এক রাত্রে ফলারের লোভে সে স্টেশনঘরের ছাদের উপরে লাফিয়ে উঠল এবং দাঁত ও থাবা দিয়ে ছাদের করগেটের লোহার তক্তাগুলোকে ভেঙে ফেলবার চেষ্টা করতে লাগল।

ব্যাপার দেখে টেলিগ্রাফবাবুর পিলে গেল চমকে। তিনি ভারতবাসী ছিলেন,—পেটের দায়ে চাকরি করতে সুদূর আফ্রিকায় গিয়েছেন—সিংহ-টিংহের কোনওই ধার ধারেন না! ছাদের উপরে সিংহের আস্ফালনে ভয় পেয়ে ট্রাফিক ম্যানেজারকে তাড়াতাড়ি 'তার' করে দিলেন—'সিংহ স্টেশনের সঙ্গে লড়াই করছে (Lion fighting with station)। শীঘ্র সাহায্য পাঠান!' যদিও স্টেশনের সঙ্গে লড়াই করে সিংহ সে-রাত্রে বিজয়ী হতে পারলে না, কিন্তু তারপরেই দিন-কয়েকের মধ্যে একে একে সে অনেকগুলো লোককে পেটের ভিতরে অনায়াসে পূরে ফেললে!

কিমা স্টেশনের কর্মচারী ও কুলি-মজুরদের মধ্যে অনেকেই ছিল ভারতবাসী। সিংহের ভয়ে তারা কাজকর্ম প্রায় বন্ধ করে দিলে!

ব্যাপার গুরুতর দেখে সেখানকার পুলিশের সুপারিন্টেন্ডেন্ট রিয়াল সাহেব, দুই বন্ধুর সঙ্গে সিংগিমামাকে একেবারে নিশ্চিন্তপুরে পাঠিয়ে দিতে এলেন।

স্টেশনে নেমেই তিনি শুনলেন, এইমাত্র সিংহ-মহাশয় স্টেশনের চারিদিকে সান্ধ্যভ্রমণ করে গেছেন।

সিংহটা কাছেই কোথাও লুকিয়ে আছে বুঝে রিয়াল সাহেব স্থির করলেন, আজ স্টেশন থেকে এক পা নড়বেন না! তিনি হুকুম দিলেন, তাঁর কামরাটি যেন রেলগাড়ি থেকে আলাদা করে, লাইনের উপরে বন-জঙ্গলের মাঝখানে নিয়ে গিয়ে রাখা হয়!

সাহেবের হুকুমমতো কাজ করা হল। কিন্তু লাইন তখন মেরামত করা হচ্ছিল বলে কামরার গাড়িখানা ঠিক সমান ভাবে দাঁড় করানো গেল না।

রিয়াল সাহেবের দুই সঙ্গীর একজনের নাম মি. হুবনার, আর একজনের নাম মি. পেরেন্টি। তাঁরা তিনজনে বন্দুক হাতে করে চারিদিকে একটা চক্র দিয়ে এলেন। কিন্তু সিংহের নাম-গন্ধও না দেখে 'ডিনার' খাবার জন্যে আবার গাড়ির ভিতরে ফিরে এসে বসলেন।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হল! তারপর তিনজনেই কামরার জানলার কাছে বসে পশুরাজের যথোচিত অভ্যর্থনার জন্যে রীতিমতো প্রস্তুত হয়ে রইলেন।

অন্ধকার রাত্রি, চারিদিকে জঙ্গল আর ঝোপঝাপ। কিন্তু সিংহের কোনও পাত্তাই নেই! কেবল এক জায়গায় দেখা গেল, দুটো অত্যন্ত-উজ্জ্বল জোনাকি সমানভাবে দপদপ করে জ্বলছে!

পরের ঘটনার প্রকাশ পেয়েছিল, সাহেবরা যা জোনাকি ভেবে অবহেলা করলেন, তা হচ্ছে স্বয়ং পশুরাজেরই দুটো জ্বলন্ত চোখ। কারণ বিড়ালের মতো বাঘ ও সিংহের চোখও অন্ধকারে জ্বলজ্বল করতে থাকে!

সাহেবরা যখন সিংহের অপেক্ষায় বসে ছিলেন, সে নিজেই তখন অন্ধকারে থাবা পেতে বসে সাহেবদের সমস্ত গতিবিধি লক্ষ করছিল এবং বোধহয় মনে মনে মানুষের নির্বুদ্ধিতা দেখে হাসছিল! এই ব্যাপারেই বোঝা যায়, মানুষ-শিকারে সিংহটা কতবড়ো পাকা।

সিংহের সাড়া না পেয়ে রিয়াল সাহেব তাঁর বন্ধুদের বললেন, 'ওহে, সবাই মিলে রাত জেগে কী হবে? ততক্ষণ তোমরা ঘুমিয়ে নাও, আমিই এখানে পাহারায় বসে আছি!'

কথাটা সঙ্গত বুঝে বন্ধুরাও বললেন, 'সেই ঠিক!'

কামরার ভিতরে শয্যাস্থান ছিল দুটি,—একটি টঙের উপরে আর একটি জানলার ধারে। উপরের বিছানায় শুলেন হুবনার। পেরেন্টি বললেন, 'রিয়াল, তুমি নীচের বিছানাটা দখল কোরো। আমি কামরার মেঝেতেই আজকের রাতটা বেশ কাটিয়ে দিতে পারব।'—এই বলে তিনি মেঝের উপরেই বিছানা ছড়িয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লেন। তাঁর পা দুটো রইল কামরার ভিতরে আসা-যাওয়া করবার পাশে-ঠেলা দরজার দিকে।

রিয়াল একলাটি বসে বসে পাহারা দিলেন—অনেক রাত পর্যন্ত, কিন্তু কোথায় সিংহ? শেষটা হতাশ ও বিরক্ত হয়ে তিনিও জানলার ধারের বিছানায় শুয়ে নিদ্রাদেবীর আরাধনা

করতে লাগলেন। রেললাইন থেকে কামরার জানালা ছিল অনেক উঁচুতে, কাজেই তাঁর মনে কোনওরকম বিপদের ভয়ও হল না।

যে-মুহূর্তে রিয়াল ঘুমিয়ে পড়লেন, বাইরের অন্ধকার থেকে সিংহটাও যে তখনই গা-ঝাড়া দিয়ে উঠেছিল, পরে তার প্রমাণের অভাব হয়নি। সে সোজা দুটো উঁচু সিঁড়ির ধাপ দিয়ে গাড়ির উপরে উঠল। পাশে ঠেলা দরজাটা খুব সম্ভব একটুখানি খোলা ছিল, সিংহটা থাবা দিয়ে দরজাটা সন্তর্পণে সম্পূর্ণরূপে খুলে ফেলে একেবারে কামরার ভিতরে ঢুকে পড়ল। কিন্তু আগেই বলেছি, লাইনের দোষে গাড়িখানা ঠিক সমানভাবে দাঁড় করানো ছিল না। সিংহের বিপুল দেহ কামরার ভিতরে ঢুকবামাত্র তার ভারে সমস্ত গাড়িখানা আর একদিকে কাত হয়ে পড়ল, ফলে পাশে-ঠেলা দরজাটা আবার আপনা আপনি বন্ধ হয়ে গেল। তখন একই কামরার ভিতরে বন্ধ হয়ে রইল বিশালাকার সেই সিংহটা এবং তিন-জন ঘুমন্ত মানুষ! ভাবতেও কি তোমাদের গা শিউরে উঠছে না?

সিংহ কামরায় ঢুকে সর্বাগ্রে রিয়ালকেই লক্ষ করলে। সে বোধহয় অন্ধকারে বসে বসে এতক্ষণে বুঝতে পেরেছিল যে, রিয়ালই তার সবচেয়ে বড়ো শত্রু। কারণ তার পায়ের তলাতে মুখের কাছেই শুয়ে ছিলেন পেরেন্টি, সুতরাং সে খুব সহজেই তাঁকে আক্রমণ করতে পারত, কিন্তু তা না করে সে ঘুমন্ত পেরেন্টির উপরে পা তুলে দাঁড়িয়ে রিয়ালের উপরেই হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

তীব্র এক আর্তনাদে উপরের বিছানায় হুবনারের ঘুম গেল ভেঙে। তড়াক করে উঠে বসে তিনি স্তম্ভিত নেত্রে দেখলেন, প্রকাণ্ড এক সিংহ পিছনের দুই পা রিয়ালের দেহের উপরে স্থাপন করে দাঁড়িয়ে আছে!

হঠাৎ ঘুম ভেঙে এমন দৃশ্য দেখলে হুবনারের মনের ভাব কী রকম হওয়া উচিত, তা বোধহয় তোমরা বুঝতেই পারছ? হুবনার আতঙ্কে একেবারে পাগলের মতন হয়ে গেলেন! তিনি সভয়ে আরও দেখলেন, তাঁরও পালাবার কোনও উপায়ই নেই! একমাত্র যে পথ আছে তা হচ্ছে দ্বিতীয় একটা পাশে ঠেলা দরজা—যা দিয়ে চাকরদের মহলে যাওয়া যায়। কিন্তু সে পথ তো সিংহের নাগালের মধ্যেই! সে পথে পালাতে গেলে এক থাবায় সে তো তাঁর মাথাটাই উড়িয়ে দেবে!

পেরেন্টির অবস্থা আরও শোচনীয়। ঘুম ভেঙেই তিনি দেখলেন তাঁর বুকের উপরে কয়েক মন ওজনের এক ভীষণ সিংহ, তাঁর আর নড়বার চড়বার উপায় পর্যন্ত নেই! চোখ কপালে তুলে তিনি আড়ষ্ট হয়ে রইলেন।

রিয়াল তখন সিংহের কবলে ইঁদুরের মতন ছটফট ও বিষম যাতনায় পরিত্রাহি চিৎকার করছেন!

হুবনার দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে উপর থেকে পালাবার জন্যে লাফ মারলেন। কিন্তু পড়লেন গিয়ে একেবারে সিংহের পিঠের উপরে। তা ভিন্ন আর উপায়ও ছিল না, কারণ তার বিপুল দেহ সমস্ত পালাবার পথটা জুড়ে দাঁড়িয়ে ছিল। ভয়ে পাগলের মতন না হলে হুবনার কখনই এমন বোকার মতন সাক্ষাৎ-মৃত্যুর কবলে ঝাঁপ দিতে পারতেন না!

সৌভাগ্যক্রমে সিংহটা তখন রিয়ালকে নিয়েই ব্যস্ত ছিল, তার পিঠের উপরে যে একটা তুচ্ছ মানুষ লাফিয়ে পড়ল এটা সে খেয়ালের মধ্যেই আনলে না!

হুবনার সিংহের পিঠ থেকে নেমে ওদিককার পাশে ঠেলা দরজার কাছে নিরাপদে গিয়ে পৌঁছলেন বটে, কিন্তু হতাশ ভাবে দেখলেন যে, স্টেশনের ভয়বিহ্বল ভারতীয় কুলিরা বাহির থেকে দরজাটা প্রাণপণে চেপে আছে—পাছে সিংহটা কোনও গতিকে বেরিয়ে পড়ে তাদের ঘাড় ভাঙতে চায়! কিন্তু হুবনার দেহের সমস্ত শক্তি একত্র করে দরজাটা কোনওরকমে একটুখানি খুলে সেই ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। কুলিরা দরজা তৎক্ষণাৎ আবার বন্ধ করে পাগড়ির কাপড় দিয়ে খুব শক্ত করে বেঁধে ফেললে!

পরমুহূর্তে ভয়ানক একটা শব্দ হল এবং গাড়িখানা আবার আর একদিকে হেলে পড়ল! সবাই বুঝলে, হতভাগ্য রিয়ালকে মুখে করে সিংহ জানলা গলে বাইরে বেরিয়ে গেল!

পেরেন্টি তখন টপ করে উঠেই অন্য পাশের জানালা দিয়ে বাইরে লাফিয়ে পড়লেন এবং এক দৌড়ে স্টেশনের ভিতর গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করলেন! মরণের মুখ থেকে যে-ভাবে এ-যাত্রা তিনি পার পেয়ে গেলেন, বাস্তবিকই তা অসম্ভবের মতই আশ্চর্য!

পরদিন সকালে দেখা গেল, গাড়ির ভিতরটা, ও যে জানলা দিয়ে সিংহ বেরিয়ে গেছে, তার চারপাশের কাঠের তক্তা ভেঙে-চুরে তছনচ হয়ে আছে এবং সমস্ত কামরাটা রক্তে যেন ভেসে যাচ্ছে।

গাড়ি থেকে খানিক তফাতেই, জঙ্গলের ভিতরে অভাগা রিয়ালের দেহের খানিক অংশ পাওয়া গেল।

কিন্তু এই দুর্দান্ত পশুরাজকেও বনের ভিতরে আর বেশি দিন রাজত্ব করতে হয়নি। কারণ এ ঘটনার অল্পদিন পরেই রেল কর্মচারীরা ফাঁদ পেতে তাকে বন্দি করে। দিন কয়েক খাঁচার ভিতরে পুরে তাকে জীবন্ত অবস্থায় সকলের সামনে রেখে দেখানো হয়। তারপর তার পশুলীলা সাঙ্গ হয় বন্দুকের গুলিতে।

॥ দশ ॥

এক রাত্রে বিছানায় শুয়ে শুয়ে আমি শুনছিলুম, গভীর অরণ্যের ভিতরে সিংহরা কীরকম গর্জনের পর গর্জন করছে! যেন তারা নিজেদের ভাষায় কথাবার্তা কইছে! যেই একটা সিংহ গর্জন করে, অমনি আর একটা যেন উত্তর দেয়!

বুঝলুম, আপাতত যেখানে তাঁবু গেড়েছি, সে-জায়গাটা হচ্ছে সিংহদের মস্ত বড়ো এক আস্তানা!

চিড়িয়াখানায় লোহার খাঁচার বাইরে নির্ভাবনায় দাঁড়িয়ে সিংহের গর্জন শোনা এককথা, আর জঙ্গলের ভিতরে নড়বোড়ে, পাতলা তাঁবুর ভিতরে শুয়ে নিশুত রাতে আশপাশ থেকে অনেকগুলো সিংহের গর্জন শোনা আর এক ব্যাপার! তাঁবু তো ভারী জিনিস! সিংহের এক থাবার চোটে তা ছিঁড়েখুঁড়ে হুড়মুড় করে পড়ে যেতে পারে!

সিংহদের চিৎকার শুনে মনের যে-অবস্থাই হোক, এটা বেশ আন্দাজ করলুম যে, কালকের শিকারটা আমাদের জমবে ভালো!......হ্যাঁ, পরদিনের শিকারটা খুবই জমেছিল বটে! জীবনে সেদিনের কথা ভুলতে পারব না,—ব্যাপারটা এমনি ভয়ানক!

যথাসময়ে শিকারে যাত্রা করা গেল। এবারে আমার সঙ্গী হলেন বন্ধু স্পুনার এবং তাঁর সঙ্গে চলল, তাঁর ভারতীয় ভৃত্য ইমামদীন ও আর একজন ভারতীয় শিকারি, নাম ভূতা। এবারের শিকারের নূতনত্ব হচ্ছে, আমরা ঘোড়ায় টানা টোঙ্গা গাড়িতে চড়ে চলেছি সিংহ শিকারে। আঠি নদীর ধারের ধু ধু প্রান্তর প্রায় সমতল, সেখানে গাড়িতে চড়ে যাওয়া যখন যায়, তখন এমন সুযোগ ছাড়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

পথে যেতে যেতে আমরা গোটাকয়েক হরিণ শিকার করলুম। সবুজ ঘাসজমির উপরে চরতে চরতে তারা নিশ্চিন্ত প্রাণে নিজেদের খোরাক জোগাড় করছিল, অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় এখন আমাদের খোরাকে পরিণত হল!

আঠি নদীর এই ময়দানময় খুব লম্বা লম্বা ঘাসের জঙ্গল আছে। সিংহরা লুকিয়ে থাকে তারই ভিতরে।

কিছুদূর এগিয়েই দেখা গেল, অল্প তফাতেই ঘাসজঙ্গলের মধ্যে একটা সিংহের দুটো কানের ডগা বেরিয়ে আছে! ভালো করে দেখে বুঝলুম, সেটা সিংহী।

পরমুহূর্তেই তার পাশ থেকে মাথা তুলে দাঁড়াল, সুন্দর কেশরওয়ালা বলিষ্ঠ এক সিংহ! তারা একদৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইল। বোধহয় আমাদের উদ্দেশ্য বোঝবার চেষ্টা করছিল।

আমাদের গাড়ি তাদের দিকে অগ্রসর হতেই তারা ধীরকদমে চলে যেতে এবং যেতে যেতে সিংহটা বারংবার থেমে আমাদের দিকে তাকাতে লাগল—যেন বলতে চায়, 'কে বাপু তোমরা? আমরা দুজনে এখানে খেলা করছি, হঠাৎ তোমরা আমাদের পিছু-পিছু আসছ কেন?'

আমাদের গাড়ি যত এগোয়, তারা তত দূরে চলে যায়। আমরা যে লক্ষ্মীছেলের মতো তাদের সঙ্গে আলাপ করতে আসিনি, এটা তারা বুঝতে পেরেছিল।

তারা পাছে হাতছাড়া হয়, এই ভয়ে আমি দূর থেকেই বন্দুক ছুড়লুম। সিংহীটা গুলি খেয়েই মাটিতে চিতপাত হয়ে পড়ে শূন্যে চার পা ছুড়তে লাগল। আমি ভাবলুম, এখনই তার দফা রফা হয়ে যাবে,—কিন্তু না, মিনিট কয় পরেই সামলে উঠে সিংহীটা পাশের ঘাস জঙ্গলে ঢুকে পড়ল, সিংহটা তার আগেই সেখানে গিয়ে আশ্রয় নিয়ে নিজের সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিল।

তখন দিনের আলো ধীরে ধীরে কমে আসছিল এবং সাধ করে গরম গুলি খাবার জন্যে সিংহরা যে তাড়াতাড়ি জঙ্গল ছেড়ে বেরিয়ে আসতে রাজি হবে, এমন কোনও সম্ভাবনা দেখলুম না। কাজেই হতাশ হয়ে সেদিনকার মতো তাদের রেহাই দিয়ে আমরা আবার তাঁবুর দিকে গাড়ির মুখ ফেরালুম। বলতে ভুলেছি যে, আমরা সঙ্গে একটি ঘোড়াও এনেছিলুম এবং টোঙ্গার আগে আগে ঘোড়ায় চড়ে আসছিলুম আমি।

হঠাৎ আমার ঘোড়া আঁতকে উঠল! চেয়ে দেখি, তার পায়ের তলা থেকে একটা হায়েনা ঠিক যেন মাটি ফুঁড়ে উঠেই চম্পট দিলে! তারপরেই দেখি, আমার ঘোড়ার সর্বাঙ্গ থরথর করে কাঁপছে! ব্যাপার কী?

এদিকে-ওদিকে তাকিয়েই দেখা গেল, বৃহৎ একজোড়া সিংহ প্রায় একশো গজ দূরে দাঁড়িয়ে আমাদের পথ আগলে আছে!

তারা আস্তে আস্তে হাত-কুড়ি এগিয়ে এসে, মাটির উপরে থাবা পেতে কায়েমি হয়ে বসে স্থির-দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে যেন বলতে চাইলে—এখানে এসেছ চালাকি করতে? 'যেতে আমি দিব না তোমারে'!

আচ্ছা মুশকিল তো! আমি চেঁচিয়ে স্পুনারকে ডাকলুম। তিনি টোঙ্গা চালিয়ে পাশে এসে হাজির হলেন।

স্থির করলুম, পথ আগলানোর কত মজা, পশুরাজদের সেটা ভালো করে টের পাইয়ে দিতে হবে! স্পুনারকে বললুম, 'ডাইনের সিংহটা তোমার, বাঁয়েরটা আমার।'

দুজনে বন্দুক-হাতে পদব্রজে সিংহদের দিকে এগিয়ে যেতেই তাদের সব সাহস গেল কর্পূরের মতন উবে! কারণ তারা উঠেই টেনে দৌড় মারলে। সঙ্গে সঙ্গে আমার অগ্নিমুখী বন্দুক গুলিবৃষ্টি করলে—একটা সিংহ মাটির উপরে পড়ে শূন্যে থাবা মারতে লাগল। তারপরেই সে উঠে আবার পালাতে শুরু করলে।

আমিও নাছোড়বান্দা। ঘোড়ায় চড়ে আমিও তাদের পিছনে ছুটলুম।

তারা যখন দেখলে, আমি তাদের সঙ্গ ছাড়তে রাজি নই, তখন তারা দুজনে একসঙ্গেই আমাকে আক্রমণ করলে এবং আহত সিংহটাই আসতে লাগল আগে আগে।

ইতিমধ্যে স্পুনার ও অন্যান্য সকলেও আমার কাছে এসে পড়লেন।

যে-সিংহটা এখনও অক্ষত আছে, আগে আমি তাকেই লক্ষ্য করে বন্দুক ছুড়লুম—সে-ও শূন্যে এক সুদীর্ঘ লম্ফ ত্যাগ করে দুম করে সশব্দে পড়ল মাটির উপরে এসে! আহত সিংহটা তখন আমাদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়বার চেষ্টা করছিল, কিন্তু স্পুনারের অব্যর্থ গুলি তখনই ছুটে গিয়ে তার লাফ-ঝাঁপ এ-জন্মের মতো বন্ধ করে দিলে।

আমি যাকে গুলি করেছিলুম, এখনও সে মরেনি, মাটির উপরে চার পা ছড়িয়ে বসে ক্রুদ্ধ-দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে।

আমরা অতি সন্তর্পণে তাঁর দিকে অগ্রসর হতে লাগলুম। কিন্তু আমরা যেদিক দিয়েই অগ্রসর হই, সে-ও অমনি সেই দিকে ফিরে বসে। তার ভাবভঙ্গি তখন এমন ভয়ংকর যে, এক গুলিতে তাকে সাবাড় করতে না পারলে আমাদের সমূহ বিপদের সম্ভাবনা!

আমি ক্রোধোন্মত্ত পশুরাজের আরও কাছে এগিয়ে গেলুম—আমার পিছনে পিছনে স্পুনার, তারপরে শিকারি ভূতা ও ইমামদীন। পশুরাজ এখন আমাদের কাছ থেকে প্রায় আশি গজ দূরে। রাগের চোটে সে মাটির উপরে ল্যাজ আছড়ে রাশি রাশি ধুলো ওড়াচ্ছে। স্পুনারকে আগে বন্দুক ছুড়তে বলে আমি হাঁটু গেড়ে বসে প্রস্তুত হয়ে রইলুম।

বেশিক্ষণ আমাকে অপেক্ষা করতে হল না। যেমনি স্পুনারের বন্দুক গর্জে উঠল,

সিংহটাও অমনি একলাফে উঠে পড়ে মেল-ট্রেনের মতন বেগে আমার দিকে ছুটে এল। আমি বন্দুক ছুড়লুম, সে গুলি তার গায়ে লাগল না। আবার বন্দুক ছুড়লুম, সে গুলি তার গায়ে লাগল না। আবার বন্দুক ছুড়লুম, কিন্তু সিংহ তা গ্রাহ্যও করলে না! বন্দুকে আর টোটা ভরবারও সময় নেই—চোখের সামনে দেখলুম, মৃত্যু-বিভীষিকা!

মরণের অপেক্ষায় স্থির হয়ে বসে রইলুম, সিংহটাও প্রায় আমার উপরে এসে পড়ল, পরমুহূর্তেই ডান দিকে বেঁকে আমাকে পেরিয়ে চলে গেল—স্পুনারের দিকে! না, সে স্পুনারকেও ছেড়ে দিলে এবং একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়ল ভূতার উপরে! ভূতার পা ধরে সে একটানে তাকে ধরাশায়ী করলে। ভূতা ও সিংহ পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে খানিকদূর গড়িয়ে চলে গেল। তারপরই সিংহটা ভূতার দেহের উপরে দাঁড়িয়ে তার গলা কামড়ে ধরতে গেল, কিন্তু সাহসী ভূতা সিংহকে বাধা দেবার জন্যে নিজের বাঁ হাতখানা দিলে তার প্রকাণ্ড হাঁয়ের ভিতরে ঢুকিয়ে। অভাগা ভূতা! নিশ্চয়ই সে নড়ে উঠেছিল, সিংহ তাই আমাকে ছেড়ে আক্রমণ করলে তাকেই!

সমস্ত ব্যাপারটা শেষ হয়ে গেল দুই-এক মুহূর্তের মধ্যেই। কিন্তু এই সময়টুকুর ভিতরে নিজেকে আমি সামলে নিলুম। স্পুনারের চাকর ইমামদীন বন্দুক নিয়ে সারা দিনই আমার সঙ্গে সঙ্গে আছে ছায়ার মতো। দুর্দান্ত সিংহের আক্রমণেও সে একটুও ভয় পায়নি বা থতোমতো খায়নি। এই বিপদের সময় বন্দুকটা সে আমার হাতে গুঁজে দিলে। ভূতাকে উদ্ধার করবার জন্যে আমি ঝড়ের মতো ছুটে গেলুম। ইতিমধ্যে আমার আগেই স্পুনার সেইখানে গিয়ে হাজির হয়েছেন। ভূতা মাটির উপরে সটান পড়ে ছটফট করছে এবং তার উপরে রয়েছে সিংহটা। দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে স্পুনার তখন সিংহের বিপুল দেহটা ভূতার গায়ের উপর থেকে ধাক্কার পর ধাক্কা মেরে ঠেলে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন। স্পুনারের বুকের পাটা দেখে আমি অবাক হয়ে গেলুম। ভাগ্যে সিংহটা তার ধাক্কা গ্রাহ্য করলে না। সে তখন অভাগা ভূতার হাতখানা এমন এক মনে চর্বণ করছিল যে অন্য কোনওদিকে ফিরে তাকাবার অবসর পেলে না।

দুর্ভাগ্যক্রমে আমি পড়ে গেলুম ঠিক তার সামনেই! অমনি সে হস্ত চর্বণ বন্ধ করলে। যদিও সে ভূতার হাতখানা ছেড়ে দিলে না, তবু সেই অবস্থাতেই বড়ো বড়ো ধারালো দাঁতগুলো বার করে মুখ খিঁচিয়ে আমার ঘাড়ের উপরে লাফ মারবার উপক্রম করলে। বুঝলুম এক পলক দেরি করলেই সর্বনাশ! টপ করে বন্দুকটা কাঁধে তুলে নিয়েই দিলুম আমি ঘোড়া টিপে। কিন্তু, কী ভয়ানক! ঘোড়া টিপলুম, তবু বন্দুকে আওয়াজ হল না! আমার প্রাণ স্তম্ভিত হয়ে গেল। আর রক্ষে নেই! বন্দুকে আবার নতুন টোটা পুরবার আগেই সিংহটা নিশ্চয় আমার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়বে! দারুণ ক্রোধে সিংহের চোখ দুটো তখন আগুনের ভাঁটার মতন দপ দপ করে জ্বলে জ্বলে উঠছিল! তার চোখে চোখ রেখে পায়ে পায়ে দু-পা পিছিয়ে এলুম। আচমকা আমার মনে পড়ে গেল বন্দুকটা ছোড়বার আগে তার চাবি তো আমি টিপে দিইনি। যাঁহাতক এই কথা মনে হওয়া, তাঁহাতক চাবিটা টিপে বন্দুক ছুড়তে

আমার আর এক মুহূর্তও দেরি হল না। গুলি খেয়ে সিংহটা দড়াম করে আছড়ে পড়ে একেবারে আড়ষ্ট হয়ে রইল।

সিংহের মৃতদেহের তলা থেকে আমরা তখন ভূতার দেহ টেনে বার করে ফেললুম। তার হাতখানা কামড়ে ধরেই সিংহটা পটল তুলেছিল, কাজেই ভূতার সেই ছিন্ন-বিছিন্ন হাতখানাকে বার করবার জন্যে সিংহের চোয়াল দুটো টেনে ফাঁক করে ধরতে হল। ভূতার জ্ঞান তখন প্রায় ছিল না বললেই চলে। ছুটে গিয়ে টোঙ্গা থেকে ব্রান্ডি এনে ভূতাকে খানিকটা খাইয়ে দিলুম। তার বাঁ হাত আর ডান পা-কে তখন হাত পা বলেই চেনা যাচ্ছিল না। সেদিকে তাকিয়ে গা আমার শিউরে উঠল। যা হোক, কোনওক্রমে ধরাধরি করে ভূতার দেহকে টোঙ্গায় তুলে নিয়ে আমরা বাসার দিকে ফিরলুম।

ভূতার চিকিৎসার কোনওই ত্রুটি হল না। ভালো ডাক্তার ঔষধপত্র সবই পাওয়া গেল। প্রথম প্রথম আমাদের খুবই আশা ছিল যে ভূতা এ যাত্রা রক্ষা পেয়ে যাবে। তার হাতের ক্ষত সেরে এল বটে, কিন্তু তার পায়ের অবস্থা ক্রমেই—শোচনীয় হয়ে উঠল। তবু সেই অবস্থাতেই সাহসী ভূতা বার বার বলতে লাগল, 'হুজুর, সবুর করুন—আগে সেরে উঠি, তারপর আমি দেখে নেব! আফ্রিকার সমস্ত সিংহকেই আমি নিজের হাতে বধ করব।'

কিন্তু হায়, হতভাগ্য ভূতার শিকারের দিন শেষ হয়ে গেছে! তার পায়ে এমন পচ ধরল যে, পা-খানাকে কেটে দেহ থেকে বাদ দিতে হল। পা-কাটার সমস্ত কষ্টই ভূতা মুখ বুজে সহ্য করলে! কেবল এক ভাবনাতেই সে মুষড়ে পড়ল। সে বললে, 'হুজুর এক পায়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে আমি স্বর্গে যাব কেমন করে?'

ভাই যেমন ভাইকে সেবা করে, তেমনি ভাবেই আমরা ভূতার সেবা করলুম বটে কিন্তু তবু তাকে বাঁচাতে পারলুম না। পা কাটার দিন-কয়েক পরেই ভূতার মৃত্যু হল।

॥ এগারো ॥

মেজর রবার্ট ফোর‍্যান হচ্ছেন একজন বিখ্যাত শিকারি। আফ্রিকায় ও ভারতবর্ষে ইনি যে কত সিংহ, বাঘ, হাতি, গন্ডার, হিপো ও অন্যান্য হিংস্র জন্তু বধ করেছেন, তার আর সংখ্যা নেই। নীচের গল্পটি তাঁরই নিজের মুখে শোনো।

'তখন বুয়োর-যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। সৈনিকের কাজ নিয়ে আমি ভারতবর্ষে এসেছি।

যে জেলায় আমি ছিলুম, তার চারিধারে গভীর বন-জঙ্গল আর সেখানে বাঘের উপদ্রবও বড়ো বেশি। একটা বাঘের বদমায়েশি আবার এত বেড়ে উঠেছিল যে তাকে আর শাস্তি না দিলে চলে না।

একদিন খবর পাওয়া গেল, কাছে এক জঙ্গলে বাঘটা একটা মোষকে বধ করে খানিকটা

খেয়ে ফেলে রেখে দিয়ে গেছে। বাঘেদের স্বভাবই হচ্ছে, যেসব জানোয়ার তারা বধ করে, এক দিনেই তারা খেয়ে সাবাড় করে দেয় না। খানিকটা এক দিন খায়, তার পরের দিন এসে আরও খানিকটা খায়। কাজেই মোষটাকে খাওয়ার জন্যে বাঘটা যে আবার ফিরে আসবে, এটুকু বেশ জেনেই আমি ঘটনাস্থানে গিয়ে হাজির হলুম।

মস্ত একটা গাছের উঁচু ডালে মাচান বেঁধে, আমি তার উপরে গিয়ে উঠে বসলাম। তখনও সন্ধে হয়নি। আজকের রাত এই মাচানে বসে কাটাতে হবে।

চারিধারে একবার চোখ বুলিয়ে নিলুম। আমার সামনে খানিকটা খোলা জমি আর জলাভূমি।

তারপরেই দুর্ভেদ্য বন জঙ্গলের প্রাচীর, তার ভিতর দিয়ে দৃষ্টি চলে না। চারিদিক স্তব্ধ। আমি একলা।

খানিকটা পরেই বুঝলুম, আমি আর একলা নই, একটা শেয়ালও মোষের গন্ধ পেয়েছে। সে লক্ষ্যহীন ভাবে মোষটার চারিধারে দূরে দূরে ঘোরাঘুরি করছে, কিন্তু মোষটার মৃতদেহের দিকে ভুলেও ফিরে তাকাচ্ছে না। চালাক শেয়ালটার মনের ভাব বোঝা একটুও শক্ত নয়। মোষের মাংসে তার প্রাণ নিশ্চয়ই আনচান করছে, কিন্তু তার মনের কথা সে মনেই লুকিয়ে রাখতে চায়। কী জানি, যে বাঘের এই মোষ, গাছের কোনও ঝোপেঝাপে যদি সে লুকিয়ে থাকে, আর বুঝতে পারে যে তার মোষের উপরে আমার নজর আছে, তাহলে আর কি সে আমাকে ছেড়ে কথা বলবে?

তার সেই মজার রকম সকম দেখে আমার ভারী আমোদ লাগল।

হঠাৎ শিয়ালটা একবার ক্যা-হুয়া—ক্যা-হুয়া করে চেঁচিয়ে উঠল! তারপরেই সাঁৎ করে আবার সে জঙ্গলের ভিতর মিলিয়ে গেল। মাংস খাওয়ার এমন সুবিধা সে ছাড়ল কেন, অবাক হয়ে তাই ভাবছি, এমন সময়ে দেখি না, সে পালায়নি। সে নিশ্চয়ই জঙ্গলের ভিতর গিয়ে দেখে এল, বাঘটা কাছাকাছি কোথাও লুকিয়ে আছে কি না? খানিকক্ষণ খুব সতর্কভাবে কান খাড়া করে সে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর পায়ে পায়ে মোষের কাছে এগিয়ে গিয়ে হঠাৎ আবার পিছন দিকে এক লাফ মেরে পিছিয়ে এল। খুব ভয়ে ভয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল—দরকার হলেই যেন সে পালাবার জন্যে প্রস্তুত! কিছুক্ষণ ধরে এই একই বিচিত্র অভিনয় চলল—পায়ে পায়ে মোষের দেহের দিকে সে এগিয়ে যায়, হঠাৎ লাফ মেরে পিছিয়ে আসে এবং পালাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে!

অবশেষে শিয়ালটা গলাটা খুব লম্বা করে বাড়িয়ে নাক দিয়ে মোষের দেহ স্পর্শ করলে। তাতেও কোনও বিপদ হল না দেখে মোষের পেটের উপর দিলে সে বসিয়ে এক কামড়। উঃ, সঙ্গে সঙ্গে সে যে কী বিশ্রী দুর্গন্ধ আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল, কেউ তা ধারণায়ও আনতে পারবে না। অস্থির হয়ে তাড়াতাড়ি রুমাল বার করে আমি নাকের উপর চেপে ধরলুম। সেই সময় মাচানটা একটু মচমচ করে নড়ে উঠল—সঙ্গে সঙ্গে চোখ তুলে আমাকে একবার দেখেই শেয়ালটা একেবারে দে ছুট তো দে ছুট!

প্রহসন শেষ হয়ে গেল। বনের বড়ো বড়ো গাছপালার পিছনে আকাশে সূর্য তখন মুখ

রাঙা করে নেমে যাচ্ছে। লতাগুল্মের আড়াল থেকে একটি চমৎকার সারস পাখি লম্বা পা ফেলে বাইরে বেরিয়ে এল। ঝাঁকে ঝাঁকে রংবেরঙের আরও নানান পাখি এসে বড়ো বড়ো গাছের ডালপালার ভিতরে আশ্রয় নিতে লাগল। দিন ফুরুল, সন্ধে হল,—শান্ত জীবদের ঘুমোবার সময় এল, এখন জেগে উঠবে খালি—দুর্দান্ত হিংস্র জন্তুরা।

এই সব গভীর অরণ্যে দয়া বলে কোনও জিনিস নেই। এক জীবের সঙ্গে অন্য জীবের দেখা হলেই আর কোনও কথা নেই—যুদ্ধ, যুদ্ধ, কেবল যুদ্ধ! জোর যার মুল্লুক তার! হয় মরো, নয় মারো।

এই সব ভাবছি, আচম্বিতে কেমন একটা অস্পষ্ট শব্দ শুনলুম। চেয়ে দেখি, ওদিককার একটা ঝোপ দুলে দুলে উঠছে। মড় মড় করে শুকনো পাতার শব্দ—যেন একটা মস্ত ভারী জন্তু বনের ভিতর দিয়ে আসছে। তারপরই বেরিয়ে এল প্রকাণ্ড একটা মাদি মোষ। তার শিং দুটো কী লম্বা আর মোটা, মোষের এত বড়ো শিং আমি আর দেখিনি। আমার অত্যন্ত লোভ হল, বন্দুকটা একবার তুললুম, কিন্তু তার পরেই মনে পড়ল, এখানে আমি এসেছি বাঘ শিকারে, কোনওরকম উৎপাত হলে আজ আর বাঘের দেখা পাব না। বন্দুকটা আবার নামিয়ে রাখলুম!

খুব দূরের জঙ্গল থেকে আর একটা মোষের ডাক শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে আমার সামনে মোষটাও শূন্যে মুখ তুলে চিৎকার করে সাড়া দিলে। বোঝা গেল মদ্দা মোষটা তার বউকে কাছে আসবার জন্যে ডাকাডাকি করছে।

মাদি মোষটা আস্তে আস্তে এগিয়ে মরা মোষের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর মৃতদেহটা বার কয়েক শুঁকে দেখলে। তারপর শূন্যে মুখ তুলে আবার একবার ক্রুদ্ধ-গর্জন করলে। বোধহয় সে আন্দাজ করতে পারলে, বিপদ বেশি দূরে নেই।

হঠাৎ সে কেমন যেন আঁতকে উঠল। তারপরই টপ করে ঘুরে দাঁড়াল—মাথা নামিয়ে জঙ্গলের একদিকে তাকিয়ে রইল তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে।

তার দেখা দেখি আমিও সেই দিকে ফিরে তাকালুম। সত্য-সত্যই বাঘের আবির্ভাব হয়েছে। একমনে সে এগিয়ে আসছে, আর তার সাদা পেট লেগে লম্বা লম্বা ঘাসগুলো দুমড়ে পড়ছে।

তারপর মোষের সঙ্গে চোখোচোখি হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার দেহ মূর্তির মতো স্থির, কেবল তার লেজটা ঝটপট করে মাটির উপর আছড়ে পড়ছে। মোষটা তার সামনের পা দিয়ে মাটি খুঁড়তে লাগল—কিন্তু তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রইল বাঘের উপরে। মোষ আর বাঘ দুজনেই এখন প্রস্তুত। দুজনারই চোখ দুজনের দিকে তাকিয়ে—তাদের সমস্ত দেহের উপরেই যেন পরস্পরের প্রতি দারুণ ঘৃণার ভাব সেখানে রয়েছে।

আমি বাঘকে আর গুলি করব না, জঙ্গলের এই অদ্ভুত অভিনয়ের পরিণাম কি দাঁড়ায়, আজ আমি সেইটাই ভালো করে দেখতে চাই।

ধীরে ধীরে ঘাসের উপরে লেজ আছড়াতে আছড়াতে বাঘটা মোষের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল, তার দুই চোখ দিয়ে তখন যেন আগুন ঠিকরে পড়ছে।

মোষটা এগিয়েও এল না, পিছিয়েও গেল না, কেবল বাঘটা যেদিকে যাচ্ছে সেইদিকে মুখ করে সে ফিরে ফিরে দাঁড়াতে লাগল। সে একটুও ভয় পায়নি, বরং তাকে দেখলেই ভয় হয়।

বাঘ মোষের চারিদিকে চক্রাকারে ঘুরতে লাগল। চক্র ক্রমে ছোটো হয়ে আসছে। বাঘ কেবল সুযোগ খুঁজছে, একবার মোষের পিছন দিকে যেতে পারলেই এক লাফে সে তার ঘাড়ের উপর এসে পড়বে। মোষ কিন্তু বাঘের চেয়ে বোকা নয়। বাঘের মতলব সে জানে। জঙ্গলে তার বাসা, এখানকার লড়ায়ের কোনও কায়দাই শিখতে তার বাকি নেই।

হঠাৎ বাঘটা ধনুকের মতো কুঁকড়ে বেঁকে পড়ল এবং পরমুহূর্তেই তার দেহটা রকেটের মতো বেগে শূন্যের দিকে উঠে গেল। এবং সেই সঙ্গেই মোষটাও গর্জন করে শিং নামিয়ে বাঘকে আক্রমণ করলে।

বাঘের দেহের সঙ্গে মোষের শিং-এর মিলন হল শূন্য পথেই! তারপরেই দুজনেই মাটির উপর পড়ে গেল এবং চোখের পলক পড়তে না পড়তেই দুজনেই আবার দাঁড়িয়ে উঠল। তারপরে দুজনে আবার দুজনকে আক্রমণ করলে এবং বাঘটা এসে পড়ল মোষের পিঠের উপর।

কিন্তু বাঘের দাঁত আর নখ তার পিঠের মাংসে বসবার আগেই মোষটা এক লাফ মেরে চিত হয়ে মাটির উপর শুয়ে পড়ল—নিজের দেহের বিপুল ভারে বাঘের দেহকে পিষে ফেলবার জন্যে। মোষের যুদ্ধের প্যাঁচ দেখে আমি তো অবাক!

মোষের দেহের চাপে চেপটে মরবার ইচ্ছা বাঘের মোটেই ছিল না। সে টপ করে মাটিতে নেমে পড়ল। মোষ আবার উঠে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে বাঘ আবার তার ডান কাঁধের উপর লাফিয়ে উঠল। মোষ এক ঝটকান মেরে বাঘকে আবার মাটিতে ফেলেই শিং দিয়ে তার দেহকে শূন্যে তুলে নিয়ে একটা ঝাউগাছের গুঁড়ির উপরে তাকে চেপে ধরলে। মোষের পিঠ ও কাঁধের উপরে বড়ো বড়ো ক্ষত দিয়ে রক্তস্রোত বেরুচ্ছে এবং তার মুখ দিয়েও ঝরঝর করে রক্ত ঝরছে। সে তাড়াতাড়ি কয়েক পা পিছিয়ে এল, তেড়ে গিয়ে বাঘকে আর একবার গুঁতিয়ে দেওয়ার জন্যে।

বাঘ তখনও কাবু হয়নি—যদিও তার দেহ ক্ষতবিক্ষত হয়ে থেঁতলে গিয়েছিল। আবার সে লাফ মারলে এবং এবারে মোষের বড়ো বড়ো দুটো শিং-এর ঠিক মাঝখানে এসে পড়ল। বাঘের দেহের আড়ালে মোষের মুখ তখন অদৃশ্য হয়ে গেছে এবং বাঘের ধারাল নখে ও তীক্ষ্ণ দাঁতে মোষের দেহ তখন ছিন্ন ভিন্ন ও রক্তময় হয়ে উঠেছে! দারুণ যাতনায় মোষটা তখন আর্তনাদ করে উঠল।

তারপরে সেই অবস্থাতেই বাঘের দেহ নিয়ে সে একটা প্রকাণ্ড গাছের গুঁড়ির উপরে হুড়মুড় করে গিয়ে পড়ল। ধপাস করে ভীষণ একটা শব্দ হল,—বাঘের ক্ষীণ আর্তনাদ শোনা গেল! টাল সামলাতে না পেরে মোষটা প্রথমে মাটির উপর বসে পড়ল, কিন্তু তার পরেই আবার চার পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল। বাঘের দেহ তার পিঠের উপর থেকে গড়িয়ে মাটির উপর লুটিয়ে পড়ল।

মোষ তাড়াতাড়ি আবার পিছিয়ে এল—তারপর তার নিষ্ঠুর শিং দুটোকে নামিয়ে চমৎকার ভাবে লক্ষ স্থির করে বেগে বাঘের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং তাকে ক্রমাগত গুঁতিয়ে দিতে লাগল। বাঘ তখন একেবারে কাহিল হয়ে পড়েছে এবং তার লড়ায়ের সাধও একেবারে মিটে গেছে। হামাগুড়ি দিয়ে বার বার সে জঙ্গলের ভিতরে পিঠটান দেওয়ার চেষ্টা করলে—কিন্তু জঙ্গলের যুদ্ধের আইনে ক্ষমা বলে কোনও কথাই নেই—হয় মরো, নয় মারো!

মোষ আবার তেড়ে এল, তারপর মাথা নামিয়ে বাঘের অবশ দেহটাকে আবার দুই শিং-এ করে তুলে নিয়ে বেগে মাথা ঘুরিয়ে ঠিক যেন একটা খড়কুটোর মতো অনায়াসে সেটাকে অনেকটা দূরে ছুড়ে ফেলে দিলে।

মাটির উপরে পড়ে বাঘ আর নড়ল না। মোষ আর তার দিকে এগুলও না, ফিরে তাকালেও না। সে জানে এর পরে তার শত্রু আর বাঁচতে পারে না।

চমৎকৃত হয়ে মাচানের উপরে আমি বসে রইলুম। বাঘকে বধ করে মোষ যে আমার শিকার কেড়ে নিলে এজন্যে আমি কোনও দুঃখই অনুভব করলুম না! যে দৃশ্য আজ চোখের সামনে দেখলুম, শিকারের আনন্দ তার কাছে তুচ্ছ!

রাতের কালো পর্দা সারা বনের উপরে তখন নেমে এসেছে—যে হেরেছে আর যে জিতেছে, তাদের কারুকেই আর দেখা যায় না। ছোট্ট এক টুকরো চাঁদ আকাশের কপালে তিলকের মতো আঁকা রয়েছে, আঁধারের মুখ তাতে ঢাকা পড়ে না।

সেই নিবিড় অন্ধকারে মোষের বিজয়-গৌরব ভরা চিৎকার শোনা গেল—সঙ্গে সঙ্গে খুব কাছের জঙ্গল থেকেই মদ্দা মোষটা তার সঙ্গিনীকে সাড়া দিলে। তারপরই আবার জঙ্গল ভাঙার শব্দ, মাদি মোষটা বোধহয় তার সঙ্গীর কাছে মনের আনন্দে ছুটে চলে গেল।

বাঘের দেহটা আমি আর নিয়ে গেলুম না, ও দেহের উপরে আমার কোনও দাবি নেই।

॥ বারো ॥

এ গল্পটিও মেজর রবার্ট ফোর্যান বলছেন :—নানা দেশের নানা বনে আজ ত্রিশ বৎসর ধরে শিকার করছি। এতকালের এই অভিজ্ঞতার ফলে, আমি জোর করেই বলতে পারি, হাতি শিকারে যত বিপদ আর উত্তেজনা আছে, অন্য কোনও শিকারেই তা নেই।

দেহের যে-জায়গায় গুলি লাগলে হাতি সহজেই মারা পড়ে, হাতির খুব কাছে গিয়েও সেটা জানতে পারা সহজ নয়!

খানিক তফাত থেকে হাতিকে গুলি করলে বিপদের সম্ভাবনা যথেষ্ট। হাতির একটা বদ-অভ্যাস আছে, আহত হলেই, সে ফিরে দেখে নেয়, ঢিল ছুড়লে কে? সে-সময় শিকারির মনের অবস্থা যে-রকম হয়, তা আর বলবার নয়। একদল সিংহের মাঝখানে গিয়ে পড়লেও শিকারির মনের অবস্থা এমনধারা শোচনীয় হয় না। আহত হলেই হাতি

ফিরে দাঁড়ায়, তার কুলোর মতো বড়ো বড়ো কান দুটো দু-দিকে ছড়িয়ে দেয়, যতটা উঁচু হতে পারে দেহটা ততখানি উঁচু করে তোমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখে এবং সঙ্গে সঙ্গে দুরন্ত ক্রোধে এমন ভীষণ গর্জন করে ওঠে, যে দেহের সমস্ত রক্ত যেন বরফের মতো জমাট হয়ে যায়।

আফ্রিকার হাতি তার স্বদেশে এক অতিকায় দানবের মতন। সামনে তাকে দেখলেই বুক যেন কুঁকড়ে আসে, আর নিজের হাতের বন্দুককে মনে হয়, তুচ্ছ একটা খড়কের মতো নগণ্য! যতই চেষ্টা করো, তার সামনে সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা প্রায় একটা অসম্ভব ব্যাপার! তখন পাগলের মতো তার সুমুখ থেকে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার জন্যে, তোমার মনের ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠবে। কতকাল ধরে শিকার করেছি, তবু আক্রমণোদ্যত হাতিকে দেখলেই আমার সমস্ত মন যেন ভয়ে এলিয়ে পড়ে।

কিন্তু এখন এসব কথা থাক। আজকে আমার শেষ শিকারের গল্প বলব। এই ঘটনার পরেও বার কয়েক আমি বনে-জঙ্গলে গিয়েছি,—কিন্তু হাতে বন্দুক নিয়ে নয়, ক্যামেরা নিয়ে,—জীবজন্তুদের ফটো তুলে নির্দোষ হিংসাহীন আনন্দ এবং উত্তেজনা লাভের জন্যে।

হামিজি ছিল আমার বিশ্বাসী চাকর। আফ্রিকাতেই তার জন্ম, গায়ের রং তার কালো, কিন্তু তার মনটা ছিল যে-কোনও শ্বেতাঙ্গের চেয়ে সাদা।

হামিজি আর আমি সেদিন শিকারে বেরিয়েছিলুম। মস্ত একটা মদ্দ মোষের পিছনে পিছনে বনের শুরু পথ দিয়ে এগিয়ে চলেছি। হামিজি আমাকে অনুসরণ করছিল আমার বড়ো বন্দুকটা হাতে নিয়ে। বনপথে তখন কোনও বিপদের ভয় ছিল না। নির্জনতার শান্তিভঙ্গ করতে পারে, বনের ভিতরে এমন কোনও হিংস্র জন্তুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হবারও সম্ভাবনা ছিল না। একটা গাছের ডালের উপরে দুটো পায়রা কেবল পরস্পরের সঙ্গে বাক্য-যুদ্ধ করছিল। তাদের বকবকানি শুনতে শুনতে এগিয়ে গিয়ে পেলুম, আবার স্তব্ধ-শান্তির রাজ্য! রামধনুকের রং মাখা প্রজাপতিরা সবুজ শ্রী নাচঘরে পাখনা কাঁপিয়ে আনাগোনা করছিল।

সুন্দর একটি পাখি ডানা নাচিয়ে সামনে দিয়ে বিদ্যুতের মতো উড়ে গেল। তারপরই গাছের ঘন পাতার ফাঁক দিয়ে মুখ বাড়ালে এক জোড়া বাঁদর, তারপর মুখ ভেংচে আরও উঁচু ডালে তড়বড় করে গিয়ে উঠে পড়ল।

যে-বিজন বন দিয়ে চলেছি, বোধহয় সেখানে আর কোনও মানুষের পায়ের দাগ পড়েনি। এখানে একটু এদিক-ওদিক হলেই পথ হারাবার ভয়! সে বিপথে উপরে-নীচে কেবল সবুজ রঙের তরঙ্গ, ছায়ার-মায়ার চারিদিক অপূর্ব। স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট অজানা সব ধ্বনি সেখানে কানের কাছে বেজে ওঠে। সূর্যের আলো সেখানে প্রবেশ করতে ভয় পায়, অচেনা কীট-পতঙ্গ সব চারিদিকে আনাগোনা করে, অদেখা সব সাপ আর গিরগিটি এধারে-ওধারে ছুটে চলে যায়, প্রেতলোকের কালো কালো পাখির ডানার ঝটপটানি শোনা যায়, এবং মনে হয় আমার আশেপাশে সাক্ষাৎ মৃত্যু যেন অপেক্ষা করে আছে।

আমাদের ঘিরে আছে কী রহস্যময় নিস্তব্ধতা! এ নিস্তব্ধতাকে অনুভব করলে বুক যেন

ভয়ে শিউরে ওঠে। অথচ এই নিস্তব্ধতার ধ্যান ভেঙে যাচ্ছে মাঝে মাঝে অজ্ঞাত দু-একটা পাখির ডাকে এবং মাঝে মাঝে, কে জানে কী বন্যজন্তু, শুকনো পাতায় আর্তনাদ জাগিয়ে, বিপুল সব গাছের তলা দিয়ে চলে যায়, কোথায় তা কেউ জানে না। বিজন বন বটে, কিন্তু প্রতিপদেই মনে হয়, কোনও সব বনবাসী জীবের দৃষ্টি তোমার দিকে স্থির হয়ে আছে। যতই চুপি চুপি আর সাবধানে তুমি এগিয়ে চলো, কিন্তু নিশ্চয় জেনো তোমার পায়ের শব্দ কারা শুনতে পাচ্ছে। তারা তোমার অপেক্ষায় ছিল না। কিন্তু তুমি যে এসেছ তারা তা টের পেয়েছে। তোমার সাড়ায় তারা হয় আক্রমণ নয় পলায়ন করবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে।

আমরা দুজনে এগিয়ে যাচ্ছি, হামিজি আর আমি। কিন্তু আমরা কেউ ভাবতে পারিনি যে মৃত্যু আমাদের সামনেই দাঁড়িয়ে আছে। এর জন্যে আমরা মোটেই প্রস্তুত ছিলুম না।

কারণ, হঠাৎ আমি মুখ তুলে দেখি, বিরাট এক হস্তী প্রকাণ্ড দুটো দন্ত নিয়ে আমার সামনেই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমি চমকে আর থমকে তখনই দাঁড়িয়ে পড়লুম, সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকটা তুললুম কাঁধের উপরে। পথের একটা বাঁকে হাতিটা পায়ে পায়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছিল, আচম্বিতে আমাদের সাড়া পেয়েই ফিরে দাঁড়িয়েছে! সে কিছুমাত্র ইতস্তত করলে না, একেবারেই একটা চলন্ত-পাহাড়ের মতো আমাদের আক্রমণ করলে। বিকট চিৎকার করে শুঁড় তুলে সে ছুটে এগিয়ে আসছে। আমাদের দু-ধারে গভীর জঙ্গল, পালাবার কোনও পথ নেই। চোখের পলক না পড়তেই নাচার হয়ে তার বুক লক্ষ্য করে আমি বন্দুক ছুড়লুম। তা ছাড়া আর কোনও উপায়ও ছিল না—আমরা যেখানে এসে পড়েছি সেখানকার একমাত্র নিয়ম হচ্ছে,—হয় মারো, নয় মরো।

গুলি খেয়েই সে তার বিরাট দেহ নিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল এবং আবার উঠবার আগেই তার দুই চক্ষুর মাঝখানে টিপ করে ফের আমি বন্দুক ছুড়লুম। বড়ো বন্দুকটা আমার হাতে ছিল না—কাজেই আমার পক্ষে উচিত ছিল এ সময় তার হাঁটু টিপ করে গুলি ছোড়া, হয়তো তা হলে সেখানেই তাকে অচল হয়ে বসে পড়তে হত। কিন্তু আমার এই ছোটো বন্দুকের গুলি খেয়ে একটুও কাবু হল না,—এবং হামিজির হাত থেকে বড়ো বন্দুকটা নেওয়ার আগেই সে আবার উঠে দাঁড়াল এবং মূর্তিমান বিভীষিকার মতো আমাদের দিকে ছুটে এল। আমার আর কোনও উপায় নেই, কারণ আমি দু-দুবার বন্দুক ছুড়েছি, এখন আমার বন্দুক একেবারে খালি। ভাবলুম হামিজির হাতে আমার বড়ো বন্দুকটা আছে, নিশ্চয় সে সেটাকে ছুড়বে। কিন্তু কোনও বন্দুকেরই আওয়াজ শুনতে পেলুম না। তার বদলে দেখলুম, বিপুল একটা কালো দেহ আমার উপর এসে পড়েছে, তার মস্ত বড়ো মুখখানা হাঁ করে আছে এবং প্রচণ্ড ক্রোধে চিৎকার করতে করতে সে আমার দিকে ছুটে আসছে! পরমুহূর্তে কী যে হল জানতে পারলুম না, কিন্তু এইটুকু অনুভব করলুম অজগর সাপের চেয়েও মোটা কী যে কী একটা, সজোরে আমাকে জড়িয়ে ধরে শূন্যে তুলে ছুড়ে ফেলে দিলে! অনেক তফাতে গিয়ে আমি পড়লুম এক বাবলাগাছের খুব উঁচু কাঁটা-ভরা ডালের উপরে!

আমার গায়ের কোনও হাড় ভেঙে গেল না বটে, কিন্তু একটা তীক্ষ্ণ কাঁটাগাছের উপরে গিয়ে পড়লে প্রত্যেক ভদ্রলোকের যেমন চ্যাঁচানো উচিত, তেমনি করে চ্যাঁচাতে আমি যে কোনও কসুর করলুম না সেটা তো তোমরা বুঝতেই পাচ্ছ! সেই কাঁটাগাছের ডালের উপরেই অসহায়ভাবে আমি ঝুলতে লাগলুম।

সর্বাঙ্গে কাঁটার বিষম আদর যে কোনও ভদ্রলোকেরই ভালো লাগে না, সে কথা বলা বাহুল্য। সেই যন্ত্রণাময় অবস্থা থেকে মুক্তিলাভের চেষ্টা করছি, এমন সময় হঠাৎ শুনলুম হামিজির ভয়ংকর আর্তনাদ! হামিজির গায়ে ছিল টকটকে-রাঙা এক পোশাক,—শিকারের সময় যে-পোশাক পরে আসা কারুরই উচিত নয়। সেই কন্টক-শয্যায় প্রায় শূন্যের উপরে শুয়েও আমি দেখতে পেলুম হাতিটা আমার জন্যে আর একটুও মাথা না ঘামিয়ে হামিজির দিকেই ছুটে গেল। হাতি, গন্ডার, মোষ প্রভৃতি রাঙা-পোশাক দেখলে খেপে যায়। হামিজি প্রাণপণে ছুটছে, আর সেই মত্ত হস্তীটা রাঙা রং দেখে পাগলের মতো রেগে উঠে তার দিকে তিরের মতো বেগে এগিয়ে চলেছে! হামিজির জন্যে আমি বেঁচে গেলুম—হাতিটা আমার দিকে আর ফিরেও তাকাল না।

কোনও রকমে যখন আমি মাটিতে গিয়ে নামলুম, সেই মত্ত হস্তীটা তখন তার বিরাট দেহ নিয়ে—বেচারা হামিজির ক্ষুদ্র দেহের উপরে গিয়ে পা ফেলে দাঁড়িয়েছে! সে শূন্যে শুঁড় আস্ফালন করছে, দাঁত দিয়ে হামিজির দেহকে ক্ষত-বিক্ষত করছে আর বড়ো বড়ো থামের মতো পা দিয়ে তাকে দলন করছে!

সামনেই আমার বন্দুকটা পড়েছিল। তাড়াতাড়ি আমি সেটা তুলে নিলুম। তারপর আমার সেই সাহসী ও বিশ্বস্ত ভৃত্যকে উদ্ধার করবার জন্য ছুটে গেলুম।

আমি হাতিটার খুব কাছেই গিয়ে তার বিরাট দেহ লক্ষ্য করে এক সঙ্গেই বন্দুকের দুটো নলের দুটো গুলি ছুড়লুম! দু-দুটো গুলি খেয়ে হাতিটার সমস্ত বীরত্ব উবে গেল—ল্যাজ পেটের তলায় ঢুকিয়ে তীক্ষ্ণস্বরে আর্তনাদ করতে করতে সামনের জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে সে অদৃশ্য হয়ে গেল।

হাতিটা চলে যাওয়ার পর আমি হামিজির দিকে ছুটে গেলুম। কিন্তু তার দেহের দিকে একবার চেয়েই বুঝতে পারলুম, হামিজির বাঁচবার আর কোনও আশা নেই! তার দেহ দেখে মনে হয় না যে সেটা মানুষের দেহ! চার পা দিয়ে মাড়িয়ে আর শুঁড় ও দাঁতের আঘাতে হামিজির দেহটাকে হাতিটা এক মাংসপিণ্ডে পরিণত করেছে! হামিজির কোমর থেকে গলা পর্যন্ত দেখলে সর্বাঙ্গ যেন শিউরে ওঠে! খালি রক্ত আর মাংসের পিণ্ড, আর কিছু নয়! তার পা দুটোর আর হাত দুটোর কোনও চিহ্ন নেই বললেই হয়। হামিজির হাতে আমার যে-ভারী বন্দুকটা ছিল সেটাও বেঁকে দুমড়ে এরকম হয়ে গেছে যে তাকে আর বন্দুক বলে চেনাই যায় না!

মানুষের পক্ষে যা করা সম্ভব, হামিজির জন্যে তা করতে আমি ত্রুটি করিনি। যখন আমি তার মুখে জল ঢেলে দিচ্ছিলুম, হামিজি তখনই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলে। সে দুই চোখ খুলে নীরবে আমার দিকে তাকিয়ে রইল এবং আমার মনে হল, আমার কাছ থেকে

বাধ্য হয়ে চলে যাচ্ছে বলে তার দুই চোখে ফুটে উঠল গভীর কী দুঃখের ভাব! তারপরেই সব শেষ হয়ে গেল!

হতভাগ্য হামিজি! বীর, সাহসী, বিশ্বাসী হামিজি! বছরের পর বছর আমার পাশে পাশে ছায়ার মতো থেকেছে, কিন্তু অতি বড়ো বিপদেও কখনও সে আমায় ত্যাগ করেনি। তার মৃত্যুর জন্যে আমি দায়ী নই, কিন্তু তার জন্যে আজ আমার প্রাণ কাঁদতে লাগল।

মনে আছে, সে রাত্রে আমি কোনও খাবার খেতে পারিনি; সমস্ত রাত ঘুমুতে পারিনি,— আমার সেই প্রিয়তম ভৃত্যের সেই ভয়ানক মৃত্যু এ জীবনে কখনও ভুলতে পারব না! সেইদিন থেকে আমি শিকার ছেড়ে দিয়েছি।

কিন্তু একটা কথা এখানে বলে রাখি। যে-হাতিটা হামিজির মৃত্যুর কারণ, দু-দিন পরেই তার মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া গেল! আমার গুলির আঘাতে খানিকক্ষণ পরেই তার প্রাণ বেরিয়ে গিয়েছিল। তার দাঁত দুটো ছিল খুব মস্ত আর সে-দুটোর দামও ছিল অনেক হাজার টাকার।

কিন্তু সেই দাঁত দুটো পাওয়ার জন্যে আমার মনে কোনওই আগ্রহ ছিল না। এর বদলে যদি আমার হামিজিকে পেতুম!

সেইদিন থেকে আমি শিকার ছেড়ে দিয়েছি।

ইতিহাসের রক্তাক্ত দৃশ্য

'ইতিহাসের রক্তাক্ত দৃশ্য' অধ্যায়টি 'হে ইতিহাস গল্প বলো' গ্রন্থ থেকে সংকলিত। 'হে ইতিহাস গল্প বলো' গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড থেকে।

তৈমুরের রক্ত

বিশ্বজিৎ তৈমুর লং!

হ্যাঁ, 'বিশ্বজিৎ' উপাধি তাঁরই প্রাপ্য। উত্তর-পশ্চিম ভারত থেকে রাশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত দেশে দেশে সগর্বে উড়েছিল তাঁর রক্তাক্ত জয়-পতাকা এবং সমগ্র ইউরোপের রাজারাজড়ারা সর্বদাই সভয়ে তাঁকে খোসামোদ করে তুষ্ট রাখতে চাইতেন।

ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর ছিলেন ওই তৈমুরেরই ষষ্ঠ বংশধর। তারপর একে একে সিংহাসনে বসেন হুমায়ুন, আকবর জাহাঙ্গির ও শাজাহান। শাজাহানের জ্যেষ্ঠপুত্র ছিলেন দারা সুকো। আজ আমরা এই দারারই করুণ জীবনকাহিনি বর্ণনা করব।

দারার কথা বলতে তৈমুরের কথা মনে পড়ল বিশেষ এক কারণে। তৈমুরের রক্তে কী বিশেষত্ব ছিল জানি না, কিন্তু তাঁর বংশধররা গৃহবিপ্লব, পিতৃদ্রোহ ও ভ্রাতৃবিরোধ প্রভৃতির দ্বারা নিজেদের কলঙ্কিত করেছিলেন যেন বংশানুক্রমেই।

তৈমুরের মৃত্যুর পরেই তাঁর পুত্রগণ সিংহাসনের জন্যে পরস্পরের বিরুদ্ধে করেছিলেন অস্ত্রধারণ। ফলে তৈমুরের সৃষ্ট অমন বিশাল সম্রাজ্য কেবল খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হয়ে পড়েনি, তার অধিকাংশই তাঁর বংশধরদের হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল।

বাবর প্রথমে ছিলেন ক্ষুদ্র এক নরপতি। কেবল ব্যক্তিগত শক্তি ও প্রতিভার প্রসাদেই তিনি অধিকার করতে পেরেছিলেন দিল্লির সিংহাসন। তাঁর পুত্র ও পৌত্র হচ্ছেন হুমায়ুন ও আকবর। সিংহাসনের কোনও ভাগিদার ছিল না বলেই তাঁদের আর ভাইয়ে ভাইয়ে কাটাকাটি করতে বা গৃহযুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে হয়নি।

কিন্তু তারপরেই দেখা গেল, আকবরের পুত্র জাহাঙ্গির হয়েছে পিতৃদ্রোহী এবং জাহাঙ্গিরের পুত্র শাজাহানও করেছেন পিতার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ। তারপর ঔরংজীবও বংশের ধারা বজায় রাখতে ছাড়লেন না, সম্রাটের আসন অধিকার করলেন তিনি পিতৃদ্রোহ এবং ভ্রাতৃহত্যার দ্বারা।

এবং নিয়তির ওই অভিশাপ থেকে ঔরংজীব নিজেও অব্যাহতি লাভ করেননি। ঔরংজীবের জীবনকালেই তাঁর পুত্র আকবর বিদ্রোহী হয়েছিলেন এবং তাঁর মৃত্যুর পরেই অন্যান্য পুত্ররা সিংহাসন লাভের জন্যে পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ করে পিতারই পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন। তারপরেও মোগল রাজবংশ ওই অভিশাপ থেকে মুক্তিলাভ করতে পারেনি। ভ্রাতৃহত্যার দ্বারা তা কলঙ্কিত হয়েছিল আরও কয়েকবার।

এমন সব অস্বাভাবিক দৃষ্টান্ত এবং একই মারাত্মক দৃশ্যের পৌনঃপুনিক অভিনয় পৃথিবীর আর কোনও রাজবংশের ইতিহাস খুঁজলে পাওয়া যাবে না।

॥ দুই ॥

বিষবৃক্ষের বীজ

সম্রাট শাজাহানের চার পুত্র ও দুই কন্যা—তাঁদের নাম যথাক্রমে দারা সুকো, মহম্মদ সুজা, মুহিউদ্দীন মহম্মদ ঔরংজীব ও মহম্মদ মুরাদ বক্স এবং জাহানারা ও রোশেনারা। শাজাহান যাঁর নাম স্থাপত্যে অমর করে রেখে গিয়েছেন, সেই মমতাজমহলই হচ্ছেন এই ছয় সন্তানের জননী।

দারা সুকো ছিলেন জ্যেষ্ঠ। পৃথিবীর সব দেশেই একটা সাধারণ নিয়ম প্রচলিত আছে। জ্যেষ্ঠ রাজপুত্রই হন সিংহাসনের অধিকারী। সুতরাং সম্রাট শাজাহান যে দারাকেই নিজের উত্তরাধিকারী রূপে নির্বাচন করবেন, এটা কিছুমাত্র অন্যায় বা অভাবিত কথা নয়।

কিন্তু তার উপরে একটা বিষয় সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। সম্রাট শাজাহানের হাবে ভাবে ব্যবহারে সর্বদাই জাহির হয়ে পড়ত যে, তিনি ছেলেদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতেন জ্যেষ্ঠপুত্র দারাকেই। এই পক্ষপাতিত্ব অন্য রাজপুত্রদের ভালো লাগত না।

তবে এ ব্যাপারটাও কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নয়। পৃথিবীর প্রত্যেক সাধারণ গৃহস্থ পরিবারের মধ্যেও দেখা যায়, একাধিক পুত্রের পিতারা নিজের কোনও একটি ছেলেকে অন্য সন্তানদের চেয়ে বেশি ভালো না বেসে পারেন না।

এমনকি পিতার পক্ষপাতিত্বর জন্য যে ঔরংজীব তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে সবচেয়ে বিষদৃষ্টিতে দেখতেন, তিনিও তাঁর অতি অক্ষম কনিষ্ঠপুত্র কামবক্সকে তাঁর অন্যান্য ছেলেদের চেয়ে বেশি আদর করতেন।

সাধারণ গৃহস্থ পিতার সম্বল বা সম্পদ হয় নগণ্য কিংবা যৎসামান্য। সে-ক্ষেত্রে পিতার একদেশদর্শিতার ফলে পুত্রদের মধ্যে মনোমালিন্য দেখা গেলেও তা আর বেশি দূর পর্যন্ত গড়াতে পারে না। কিন্তু যেখানে ভারতবর্ষের মতো বিপুল সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকার নিয়ে কথা, সেখানে ভাইয়ে ভাইয়ে মিল না থাকলে গুরুতর অনর্থপাতের সম্ভাবনাই বেশি! দেখা গেছে, মুকুটের লোভ পারিবারিক স্নেহের বন্ধন মানে না—পিতা ও পুত্রও হতে পারে পরস্পরের শত্রু। এক্ষেত্রে তাই হয়েছিল।

দারা ছিলেন শাজাহানের নয়নের মণি। দারাকে তিনি নিজের কাছে কাছে রাখতে চাইতেন অহরহ। এবং দারার প্রতি তাঁর এই অতিরিক্ত স্নেহটা বিশেষভাবে জাহির হয়ে পড়ায় অন্যান্য পুত্রের মন হয়ে উঠেছিল হিংসায় পরিপূর্ণ। একটা দৃষ্টান্ত দিই।

শাজাহান তাঁর প্রত্যেক পুত্রকে বালক বয়স থেকেই উপযুক্ত শিক্ষকের অধীনে রেখে নানা বিদ্যায় পারদর্শী করে তোলবার চেষ্টা করেছিলেন। তারপর ছেলেদের রাজকার্যে হাতেনাতে অভিজ্ঞতা করবার জন্যে প্রেরণ করতেন সাম্রাজ্যের এক এক প্রদেশে রাজপ্রতিনিধিরূপে।

দাক্ষিণাত্য ছিল অশান্তিপূর্ণ এবং রাজধানী দিল্লি থেকে বহুদূরে। শাজাহানের নির্দেশে ঔরংজীবকে রাজপ্রতিনিধিরূপে যেতে হয়েছিল সেইখানে!

মুরাদকেও পাঠানো হয়েছিল দক্ষিণের আর এক প্রদেশে।

মোগল সম্রাটরা নরকের মতো ঘৃণা করতেন সুদূর বাংলাদেশকে, কারণ সেখানকার আবহাওয়া পশ্চিমাদের ধাতে সইত না। দ্বিতীয় রাজপুত্র সুজা, প্রেরিত হয়েছিলেন ওই বঙ্গদেশেই।

পাঞ্জাব, এলাহাবাদ ও মুলতান প্রভৃতি প্রদেশ ছিল না অশান্তিকর ও আপত্তিকর, বরং অর্থকর বলেই তাদের খ্যাতি ছিল। সেই সব প্রদেশেই দারাকে রাজপ্রতিনিধির পদে নিযুক্ত করা হত। উপরন্তু, দারাকে অত দূর পর্যন্তও যেতে হত না, তিনি নিজে থাকতেন পিতার আশেপাশেই, প্রাদেশিক শাসনকার্য পরিচালনা করতেন তাঁর দ্বারা নিযুক্ত কোনও প্রতিভু।

শাজাহান যখন সসম্মানে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত, তখন থেকেই দারা হয়ে উঠেছিলেন সাম্রাজ্যের মধ্যে দ্বিতীয় ব্যক্তি,—তাঁর আসন ছিল সম্রাটের পরেই। তাঁকে 'শাহী-বুলন্দ-ইকবাল' (বা মহৎ সৌভাগ্যের রাজা) নামে সুদুর্লভ ও মহাসম্মানকর উপাধিতে ভূষিত এবং চল্লিশ হাজার অশ্বারোহী সৈনিক নায়কের পদ প্রদান করা হয়েছিল, তা বহু নৃপতিরও হিংসা উদ্রেক করতে পারত। বিভিন্ন ঐতিহাসিকের মতানুসারে, দারার বাৎসরিক বৃত্তির পরিমাণ ছিল দেড় কোটি থেকে দুই কোটি টাকা! আজকের হিসাবে ওই টাকার পরিমাণ হবে কত গুণ বেশি, সকলে তা কষে দেখতে পারেন।

রাজসভায় সম্রাটের কাছেই থাকত যুবরাজ দারার জন্যে নির্দিষ্ট সোনার সিংহাসন—ময়ূর সিংহাসনের চেয়ে তার উচ্চতা খুব কম ছিল না। সামরিক পদমর্যাদায় দারার পুত্ররাও ছিলেন সম্রাটের অন্যান্য পুত্রদের সমকক্ষ।

মুখাপেক্ষী কিংবা সামন্ত রাজারা, উপাধি বা পদপ্রার্থীরা এবং সম্রাটের বিরক্তিভাজন কৃপাপ্রার্থীরা শাজাহানের কাছে যাবার আগে দারার কাছে গিয়ে ধরনা দিতেন। পদস্থ সরকারি কর্মচারী এবং নতুন উপাধিধারীগণ যুবরাজের কাছে নতি স্বীকার করবার জন্য স্বয়ং সম্রাট কর্তৃক আদিষ্ট হতেন।

শেষের দিকে সম্রাটের সামনে বসে বা তাঁর অনুপস্থিতিকালেও শাসনকার্য পরিচালনা করতেন দারাই স্বয়ং। এমনকি তিনি স্বাধীনভাবে সম্রাটের নাম ও সিলমোহর পর্যন্ত ব্যবহার করতে পারতেন।

ব্যাপার দেখে অন্যান্য রাজপুত্রদের মনে হিংসা ও ক্রোধের সীমা ছিল না। এইভাবে দিল্লির রাজপরিবারের মধ্যে গোড়া থেকেই বোনা হয়েছিল বিষবৃক্ষের বীজ।

॥ তিন ॥

মানুষ দারা

শত্রুরা দারার চরিত্রকে কালো রঙে এঁকে দেখাবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু ইতিহাসের সাক্ষ্য দেখে বোঝা যায়, সেটা হয়েছে অপচেষ্টা মাত্র।

দারা ছিলেন ভদ্র ও বিনয়ী এবং বন্ধু ও দুর্গতদের সাহায্য করবার জন্যে প্রস্তুত। পত্নী ও পুত্রদের তিনি খুব ভালোবাসতেন এবং পিতাকেও করতেন রীতিমতো শ্রদ্ধা।

কিন্তু তিনি আজন্ম লালিতপালিত হয়েছিলেন অসামান্য সৌভাগ্যের কোলে, যখন যা চেয়েছেন তা পেয়েছেন অনায়াসেই এবং কখনও কিছুমাত্র দুঃখবোধ করেননি। তাই ছিল না তাঁর দূরদৃষ্টি ও মানুষ চেনার ক্ষমতা। মনের ও বুদ্ধির জোরে প্রতিবন্ধকতাকে এড়িয়ে যাবার ক্ষমতাও তাঁর ছিল না।

শাজাহানের কন্যা জাহানারার আত্মজীবনীতে প্রকাশ প্রপিতামহ আকবর যে স্বপ্ন দেখতেন, প্রপৌত্র দারা নিজের জীবনে তাকেই সম্ভবপর করে তোলবার চেষ্টা করতেন। আকবর হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের অবসান এবং এক নতুন ও উদার ধর্মমত প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন। দারারও কাম্য ছিল তাই।

কিন্তু কেবল স্বপ্ন দেখেই রাজদণ্ড পরিচালনা করা যায় না। সর্বত্র উদারতার সাধনা করা রাজধর্মের বিরোধী। আকবর ছিলেন কূটকচালে রাজনীতিতে বিশেষ অভিজ্ঞ—দারা যা ছিলেন না। আকবরের ছিল প্রথম শ্রেণির যুদ্ধপ্রতিভা। দারাও যোদ্ধা ছিলেন, কিন্তু সেনাপতির কর্তব্যপালন করতে পারতেন না।

একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক দারার ধর্মমত সম্বন্ধে যা বলেছেন, তার সারমর্ম হচ্ছে এই :

দারা ছিলেন সর্বেশ্বরবাদে বিশ্বাসী, তাই তিনি ইহুদিদের ধর্ম, খ্রিস্টধর্ম, মুসলমানদের সুফিধর্ম (যার সঙ্গে আমাদের বৈষ্ণবধর্মের মিল দেখা যায়) এবং হিন্দুদের বেদান্তধর্ম অনুশীলন করেছিলেন।

তাঁর দ্বারা একদল হিন্দু পণ্ডিতের সাহায্যে পারসি ভাষায় উপনিষদ অনূদিত হয়েছিল। তাঁর আর একখানি পুস্তকের নাম হচ্ছে, 'মাজমুয়া-উল-বাহারিন' বা 'দুই সাগরের সম্মিলন'। তা পাঠ করলে বোঝা যায়, তাঁর লক্ষ্য ছিল এমন এক মিলনক্ষেত্র আবিষ্কার করা, যেখানে এসে হিন্দু ও মুসলমান পরস্পরের সঙ্গে সম্মিলিত হতে পারে।

তিনি হিন্দু যোগী লালদাস ও মুসলমান ফকির সারমাদের পদতলে বসে শিষ্যের মতো মনোযোগ দিয়ে উভয়ের উপদেশবাণী শ্রবণ করতেন।

তা বলে তিনি স্বধর্মবিরোধী ছিলেন না। তিনি মুসলমান সাধুদের একখানি জীবনচরিত সঙ্কলন করেছিলেন। শিষ্যরূপে তাঁর দীক্ষা হয়েছিল মুসলমান সাধু মিয়ান মিরের কাছে—কোনও কাফেরের পক্ষে যা ছিল অসম্ভব। দারার নিজের কথাতেই প্রকাশ পেয়েছে যে, তিনি ইসলামের মূল ধর্মমতে অবিশ্বাসী ছিলেন না।

কিন্তু তিনি ছিলেন হিন্দুদের বন্ধু। অন্যান্য গোঁড়া মুসলমানের মতো তিনি কোনও দিনই হিন্দুদের বিরুদ্ধে 'জেহাদ' বা ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করতে পারতেন না। এইসব কারণে, বিশেষ করে হিন্দুদের কাছে দারা ছিলেন অত্যন্ত লোকপ্রিয়।

॥ চার ॥

ঔরংজীব বা শ্বেতসর্প

আলোচ্য নাটকীয় কাহিনির প্রধান ও প্রথম নায়ক দারা এবং দ্বিতীয় নায়ক হচ্ছেন ঔরংজীব। এইবারে তাঁরও একটু পরিচয়ের দরকার।

ঔরংজীব ছিলেন দারার চেয়ে কিছু কম, চার বৎসরের ছোটো। সম্রাট শাজাহানের অন্যান্য পুত্রের মতো বাল্যে ও যৌবনে উপযুক্ত শিক্ষকদের অধীনে তিনিও যথেষ্ট বিদ্যালাভের সুযোগ পেয়েছিলেন।

আরবি, পারসি, হিন্দি ও তুর্কি ভাষায় তাঁর দক্ষতা ছিল। কাব্যের প্রতি তাঁর বিশেষ শ্রদ্ধা না থাকলেও তিনি কয়েকজন কবির উপদেশপূর্ণ রচনার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন এবং দরকার হলেই মুখে মুখে তাঁদের বচন উদ্ধার করতে পারতেন। তিনি ইতিহাস পছন্দ করতেন না, কিন্তু ধর্মশাস্ত্র পাঠ করতে ভালোবাসতেন। নাচ-গান-ছবি তিনি পছন্দ করতেন না।

জাহানারার আত্মকাহিনিতে বালক ঔরংজীব সম্বন্ধে একটি কাহিনি পাঠ করা হয়। তাঁর পিতামহ জাহাঙ্গির ও পিতা শাজাহান দুজনেই প্রথম বয়সে হয়েছিলেন পিতৃদ্রোহী। শাজাহানেরও তাই ভয় ছিল যে, তাঁর পুত্ররাও হয়তো কোনওদিন পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করবে। সেইজন্যে এক ভবিষ্যদ্বক্তা সন্ন্যাসীকে তিনি কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'আমার কোনও ছেলে কি আমার বিরুদ্ধাচরণ করে সাম্রাজ্য নষ্ট করবে?'

সন্ন্যাসী বলেছিলেন, 'হ্যাঁ।'

—'কে সে?'

—'যে সবচেয়ে ফরসা।'

ঔরংজীবের গায়ের রং ছিল অতিশয় শুভ্র। ভবিষ্যদ্বাণীর সময় তাঁর বয়স ছিল দশ বৎসর মাত্র। শাজাহান কিন্তু সেইদিন থেকেই তাঁকে আর ভালো চোখে দেখতেন না এবং তাঁর নাম রেখেছিলেন 'শ্বেতসর্প'।

বালক বয়েস থেকেই ঔরংজীব ছিলেন অত্যন্ত সাহসী ও বীর। এখানে তাঁর সাহস ও বীরত্বের একটি গল্প দেওয়া গেল:

কিন্তু তার আগে আর একটা কথা বলা উচিত। মোগলসম্রাট ও রাজপুত্ররা—অর্থাৎ তৈমুরের বংশধররা চিরদিনই ছিলেন বীরত্ব ও সাহসের জন্যে বিখ্যাত, তৈমুরের রক্তে কাপুরুষের জন্ম হয়নি বললেও চলে। মোগল রাজবংশের উৎপত্তি যে তৈমুরের রক্ত থেকেই, এর জন্যে তাঁরা ছিলেন মনে মনে গর্বিত।

ঔরংজীবের ছোটোছেলে কামবক্স ছিলেন নির্বোধ, নিষ্ঠুর অত্যাচারী ও প্রমোদপ্রিয়—তাঁকে অকালকুষ্মাণ্ডের সঙ্গে তুলনা করলেও অন্যায় হবে না।

মেজোভাই সম্রাট বাহাদুর শাহের সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে অনায়াসেই তিনি পলায়ন করতে পারতেন। কিন্তু পালাবার নাম মুখেও না এনে লড়তে লড়তে সাংঘাতিকরূপে আহত

হয়ে তিনি প্রাণত্যাগ করেন এবং মরবার আগে তিনি বলে যান—আমি হচ্ছি তৈমুরের বংশধর, পাছে আমাকে কেউ কাপুরুষ ভাবে সেই ভয়েই স্বেচ্ছায় আমি মৃত্যুকে বরণ করেছি।

এইবারে গল্পটা বলি।

যেসময়ের কথা বলেছি তখন ঔরংজীবের বয়স মাত্র চৌদ্দ বৎসর।

সম্রাট সাজাহানকে হাতির লড়াই দেখানো হচ্ছে, আশেপাশে দর্শকরূপে রাজপুত্র ও আমির ওমরাহদের সঙ্গে উপস্থিত আছে সৈন্যসামন্ত ও এক বৃহতী জনতা।

আচম্বিতে একটা হাতি খেপে গিয়ে তেড়ে এল অশ্বারোহী ঔরংজীবের দিকে। তখনও পালাবার পথ খোলা ছিল, কিন্তু ঔরংজীব সে কথা মনেও আনলেন না। পাছে ঘোড়া ভয় পেয়ে সরে পড়ে, তাই তিনি তার বল্‌গা টেনে রেখে স্থিরভাবে অপেক্ষা করতে লাগলেন। হাতিটা আরও কাছে এগিয়ে এল, ঔরংজীব বল্লম তুলে সজোরে তার দিকে নিক্ষেপ করলেন।

হইহই রব উঠল চারিদিকে। আমির-ওমরাহ এবং অন্যান্য লোকজন ছুটোছুটি ও চ্যাঁচামেচি করতে লাগল—হাতিকে ভয় পাওয়াবার জন্যে অনেক আতশবাজি ছোড়া হল—কিন্তু বৃথা!

মত্তমাতঙ্গ ছুটে এসে শুঁড়ের এক আঘাতে ঘোড়াটাকে মাটির উপরে পেড়ে ফেললে—আর রক্ষা নেই!

ঔরংজীব এল লাফে মাটির উপরে লাফিয়ে পড়ে, খাপ থেকে তরোয়াল খুলে অটল পদে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ালেন হাতির সামনে।

হঠাৎ দৈবগতিকে হল দৃশ্য পরিবর্তন! একে তো ভীষণ হট্টগোলে, বল্লমের খোঁচায় ও আতশবাজির সশব্দ অগ্নিকাণ্ডে হাতিটা চমকে ও ঘাবড়ে গিয়েছিল, তার উপর তার প্রতিদ্বন্দ্বী হাতিটাও আবার রুখে উঠে তাকে আক্রমণ করতে আসছে দেখে সে ঊর্দ্ধশ্বাসে পৃষ্ঠভঙ্গ দিতে কালবিলম্ব করলে না।

ফাঁড়া উতরে গেল ভালোয় ভালোয়, সকলে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচল।

শাজাহান তাঁর বীর সন্তানকে সাদরে বুকের ভিতর জড়িয়ে ধরলেন। তিনি বুঝলেন একদিক দিয়ে ঔরংজীব হচ্ছেন তাঁরই যোগ্য পুত্র, কারণ তিনিও যৌবনে জাহাঙ্গিরের চোখের সামনে তরবারি হাতে নিয়ে নির্ভয়ে আক্রমণ করেছিলেন এক বন্য ও দুর্দান্ত ব্যাঘ্রকে!

ঔরংজীব লাভ করলেন 'বাহাদুর' উপাধি এবং পুরস্কার স্বরূপ দুই লক্ষ টাকা দামের উপহার ও নগদ পাঁচ হাজার মোহর।

ছেলের গোঁয়ারতুমির জন্য সম্রাট যখন মৌখিক ভর্ৎসনা করলেন, ঔরংজীব উত্তরে বললেন, 'পলায়নই ছিল লজ্জাকর। আমি মরলেও সেটা লজ্জার বিষয় হত না। মৃত্যু সম্রাটকেও ছেড়ে দেয় না, তাতে সম্মানহানি হয় না।'

দারা বাপের আদুরে ছেলে বলে রাজপুত্ররা সবাই অসন্তুষ্ট ছিলেন, এ কথা আগেই বলা

হয়েছে। কিন্তু দারার প্রতি ঔরংজীবের অসন্তোষ, ক্রোধ ও আক্রোশ ছিল আর সকলেরই চেয়ে বেশি। এ বিদ্বেষ তাঁর বাল্যকাল থেকেই এবং বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বিদ্বেষও বেড়ে উঠেছিল ক্রমে ক্রমে।

ঔরংজীব তখন দাক্ষিণাত্যের রাজপ্রতিনিধি এবং তাঁর বয়স ছাব্বিশ বৎসর। জ্যেষ্ঠ দারা পিতার সবচেয়ে প্রিয়পাত্র বলে মন তাঁর তিক্তবিরক্ত। তাঁর তখনকার মৌখিক ভাষায় এবং চিঠিপত্রে দারার প্রতি এই বিষম আক্রোশটা সর্বদাই প্রকাশ পেত। তার উপরে সেই সময়ে এমন এক ঘটনা ঘটল যার ফলে সেই বিরাগটা হয়ে উঠল দস্তুরমতো বিজাতীয়।

দৈবগতিকে আগুন পুড়ে সহোদরা জাহানারার জীবন নিয়ে টানাটানি চলছে। বোনকে দেখবার জন্যে ঔরংজীব এলেন আগ্রা শহরে।

সেই সময়ে সেখানে যমুনা তীরে দারা নিজের জন্যে তৈরি করিয়েছিলেন এক নতুন প্রাসাদ। একদিন তিনি পিতা ও তিন ভ্রাতাকে প্রাসাদ দেখবার জন্যে আমন্ত্রণ করলেন।

গ্রীষ্মের দারুণ উত্তাপ থেকে নিস্তার পাবার জন্যে সেখানে ভূগর্ভে নির্মাণ করা হয়েছিল একটি কক্ষ এবং তার মধ্যে আনাগোনা করবার জন্যে ছিল একটিমাত্র দ্বার।

দারার সঙ্গে সঙ্গে শাজাহান, সুজা ও মুরাদ ঘরের ভিতর প্রবেশ করলেন, কিন্তু ঔরংজীব একা বসে রইলেন দ্বারের কাছে।

শাজাহান বারংবার জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, তাঁর ওই আশ্চর্য ও অশোভন ব্যবহারের কারণ কী, তিনি কিন্তু চুপ করে বসে রইলেন সেইখানেই, কোনও জবাব দিলেন না।

তাঁর এই অবাধ্যতার শাস্তি হল গুরুতর। কেবল তাঁর বৃত্তিই বন্ধ করে দেওয়া হল না, দাক্ষিণাত্যের রাজপ্রতিনিধিত্ব ও রাজসভায় প্রবেশাধিকার থেকেও তিনি বঞ্চিত হলেন।

সুদীর্ঘ সাত মাস কাল অলসভাবে বসে থাকবার ও অপমানকর জীবনযাপন করবার পর অবশেষে জাহানারার কাছে তিনি তাঁর অবাধ্যতার কারণের কথা খুলে বললেন:

—'ঘরের একটি মাত্র দরজা, বাইরে যাবার দ্বিতীয় পথ নেই। আমি ভেবেছিলুম সেখানে সুযোগ পেয়ে দারা আমাদের সকলকে হত্যা করে সিংহাসনের পথ সুগম করে ফেলবেন! তাই পাহারা দেবার জন্যে আমি দরজার কাছেই বসেছিলুম।'

দেখা যাচ্ছে, যৌবন বয়সেই ঔরংজীবের মনে ধারণা জন্মেছিল, দারাই হচ্ছেন তাঁর প্রধান শত্রু এবং সিংহাসনের লোভে ভ্রাতৃহত্যা—এমনকি পিতৃহত্যা করাও অত্যন্ত স্বাভাবিক!

এই একটি ঘটনার মধ্যেই ঔরংজীব চরিত্রের সমস্ত রহস্যের হদিস পাওয়া যাবে। বীজ থেকে বিষবৃক্ষের জন্ম হয়েছে তখনই বাকি কেবল ফল ধরা!

সাত মাস পরে ভগ্নী জাহানারা ভ্রাতা ঔরংজীবের জন্য পিতার কাছে ধরনা দিলেন। মেয়েদের মধ্যে জাহানারাই ছিলেন সবচেয়ে প্রিয়পাত্রী। তাঁর অনুরোধ শাজাহান ঠেলতে পারলেন না, ঔরংজীবের অপরাধ মার্জনা করে রাজ-প্রতিনিধিরূপে তাঁকে পাঠিয়েদিলেন গুজরাট প্রদেশে।

॥ পাঁচ ॥
রোগশয্যায় শাজাহান

১৬৫৭ খ্রিস্টাব্দ। পরিপূর্ণ সুখ, সমৃদ্ধি ও গৌরবের মাঝখানে ভারতের সম্রাট শাজাহান অকস্মাৎ সাংঘাতিক ব্যাধির আক্রমণে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন।

সম্রাট বাইরে আর দেখা দেন না, দরবারও আর বসে না। রোগীর গৃহে রাজ-সভাসদদের প্রবেশ নিষিদ্ধ। রোগশয্যার পাশে যেতে পারতেন একমাত্র দারাই।

হপ্তাখানেক ধরে চিকিৎসকদের প্রাণপণ চেষ্টার পর সম্রাটের অবস্থার কিঞ্চিৎ উন্নতি হল বটে, কিন্তু ওই পর্যন্ত। তিনি শয্যা ছাড়তে পারলেন না। চিকিৎসকরা উপদেশ দিলেন বায়ুপরিবর্তন করতে। দিল্লি থেকে তাঁকে আগ্রায় নিয়ে যাওয়া হল। তবু তাঁর অসুখ সারল না।

ইতিমধ্যে নিজের আসন্নকাল উপস্থিত হয়েছে ভেবে, সম্রাট আমির-ওমরাহদের আহ্বান করে সকলের সামনে ঘোষণা করেছেন, তাঁর অবর্তমানে সিংহাসনের মালিক হবেন যুবরাজ দারাই।

আগ্রায় এসে সম্রাট আশ্রয় গ্রহণ করেছেন দারার নিজস্ব প্রাসাদেই। দারা সেখানে আর কাউকে ঢুকতে দেন না, একাই সেবাশুশ্রূষা করে পিতাকে নিরাময় করে তোলবার চেষ্টায় নিযুক্ত থাকেন এবং সম্রাটের নামে নিজেই রাজকার্য পরিচালনা করেন।

ওদিকে বাইরে গুজবের অন্ত নেই। দিকে দিকে জনরব উঠল, সম্রাটের মৃত্যু হয়েছে, স্বার্থসিদ্ধির জন্যে দারা সে-খবর গোপন রাখতে চান।

সুজা, মুরাদ ও ঔরংজীব এই সুযোগই খুঁজছিলেন; স্বরূপ প্রকাশ করতে তাঁরা আর বিলম্ব করলেন না।

বাংলা দেশের রাজপ্রতিনিধি সুজা সেইখানে বসেই নিজেকে ভারতসম্রাট বলে ঘোষণা করলেন।

গুজরাটের তখনকার রাজপ্রতিনিধি মুরাদও পিছনে পড়ে থাকবার পাত্র নন—তিনিও ধারণ করলেন ভারতসম্রাটের পদবি!

দাক্ষিণাত্যের রাজপ্রতিনিধি ছিলেন ঔরংজীব। ভ্রাতাদের মধ্যে তিনিই হচ্ছেন সবচেয়ে ধূর্ত ও সাবধানী। তিনি সহজে মুখোশ খুললেন না। তিনিও সৈন্যাদি সংগ্রহ করে যুদ্ধের তোড়জোড় করতে লাগলেন বটে, কিন্তু গাছে কাঁঠাল দেখেই গোঁফে তেল মাখতে চাইলেন না—অর্থাৎ প্রথমেই ধারণ করলেন না সম্রাট উপাধি।

মুরাদ ছিলেন তাঁর কাছেই এবং তিনি জানতেন ভাইদের মধ্যে মুরাদই হচ্ছে সবচেয়ে নির্বোধ। তার উপরে তিনি উগ্র এবং গোঁয়ার-গোবিন্দ। কিন্তু তিনি ছিলেন রীতিমতো যোদ্ধা; একবার রণক্ষেত্রে গিয়ে দাঁড়ালেই তাঁর ধমনির মধ্যে তৈমুরের রক্ত টগবগ করে ফুটে উঠত। এমন লোককে সহজেই টানা যায় এবং এমন লোককে দলে টানতে পারলে যথেষ্ট শক্তিবৃদ্ধি হবার সম্ভাবনা।

অতএব ঔরংজীব মিষ্ট কথায় মুরাদকে বোঝালেন যে, দারা হচ্ছে অধার্মিক, নামাজ পড়ে না, রমজানের উপবাস করে না, তার বন্ধু হচ্ছে হিন্দু যোগী, সন্ন্যাসী ও ব্রাহ্মণগণ। শর্ত হল যে, আগে দুইজনে মিলে এমন নাস্তিক লোককে পথ থেকে সরাতে হবে, তারপরে যুদ্ধে জয়লাভ করলে মুরাদ হবেন পাঞ্জাব, আফগানিস্তান, কাশ্মীর ও সিন্ধু প্রদেশের মুকুটধারী স্বাধীন নরপতি এবং সাম্রাজ্যের বাকি অংশ লাভ করবেন ঔরংজীব। সেই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, শর্তের কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করবেন বলে ঔরংজীব পবিত্র কোরান পর্যন্ত স্পর্শ করতে ভোলেননি। সরল বিশ্বাসী মুরাদও এই শর্তে রাজি হয়ে গেলেন।

সবাই মিলে একজোট হয়ে দাঁড়াবে আক্রমণ করবার জন্যে। সুজাকেও ফুসলে দলে ভেড়াবার ইচ্ছা ছিল ঔরংজীব ও মুরাদের, কিন্তু বাংলা অত্যন্ত দূরদেশ বলে ইচ্ছাটা শেষ পর্যন্ত কার্যে পরিণত হয়নি।

ইতিমধ্যে শাজাহান রোগমুক্ত হয়ে সমস্ত খবর শুনলেন। তাড়াতাড়ি স্বহস্তে পত্র লিখে সিংহাসনপ্রার্থী তিন পুত্রকে জানালেন যে, তিনি ইহলোকেই বর্তমান এবং সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত। কিন্তু তাতেও ফল হল না। পুত্ররা সন্দেহ করলেন, জাল পত্র পাঠিয়ে দারা তাঁদের ঠকাবার চেষ্টা করছে।

সম্রাটের সম্মতি নিয়ে দারা তখন সুজা, ঔরংজীব ও মুরাদের বিরুদ্ধে পৃথক পৃথক বৃহৎ ফৌজ প্রেরণ করলেন। সেই তিন ফৌজের সঙ্গে গেলেন শাজাহানের প্রধান প্রধান খ্যাতিমান সেনাপতিরা, ফলে দারার কাছে আগ্রায় যে সেনাদল রইল, তাদের চালনা করবার মতো যোগ্য সেনাপতির অভাব হল অত্যন্ত।

এই গৃহযুদ্ধের সময়ে রোগদুর্বল, জরাজর্জর শাজাহানের অবস্থা হয়েছিল অতিশয় করুণ। যারা এখন পরস্পরের সঙ্গে হানাহানি করতে উদ্যত, তারা প্রত্যেকেই তাঁর নিজের রক্তে গড়া পুত্র, কত আদরের ও স্নেহের নিধি, তাদের যে-কোনও একজনকে আঘাত করলে সে-আঘাত বাজবে তাঁর নিজেরই বুকে!

যুদ্ধযাত্রার প্রাক্কালে ভারতসম্রাট শাজাহান সাধারণ পিতার মতোই কাতরভাবে তাঁর সেনাপতিদের কাছে মিনতি জানালেন, যেন তাঁর পুত্রদের কোনও অনিষ্ট না হয়, যেন বিনা যুদ্ধেই মিষ্ট কথায় বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তাদের আবার যথাস্থানে ফিরে যেতে বলা হয়!

যুদ্ধ যখন বাধে, তখন শাজাহানের বয়স আটষট্টি। তাঁর প্রত্যেক পুত্রও তখন যৌবনের সীমা অতিক্রম করেছেন—দারার বয়স হয়েছিল তেতাল্লিশ, সুজার বয়স একচল্লিশ, ঔরংজীবের উনচল্লিশ এবং মুরাদের তেত্রিশ।

॥ ষষ্ঠ ॥

ধরমাট ও সামুগড়

ঔরংজীব ও মুরাদের বিরুদ্ধে যে-সেনাদল প্রেরিত হয়েছিল তার সেনাপতি ছিলেন মহারাজা যশোবন্ত সিংহ এবং কাসিম খাঁ ছিলেন তাঁর সহযোগী সেনাপতি। উজ্জয়িনী নগরের নিকটস্থ ধরমাট নামক স্থানে দুইপক্ষের প্রথম শক্তিপরীক্ষা হয়। উভয় পক্ষেই সৈন্যসংখ্যা কিছু বেশি—পঁয়ত্রিশ হাজার।

রাজপুত ও মুসলমান নিয়ে দারার সৈন্যদল গঠিত হয়েছিল এবং তাদের মধ্যে ছিল না কিছুমাত্র একতা। রাজপুতরা বীরের মতো লড়তে ও মরতে প্রস্তুত ছিল, কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে অনেকেই ছিল বিশ্বাসঘাতক এবং মনে মনে ঔরংজীবের পক্ষপাতী। তাই যুদ্ধ শেষ হলে দেখা গিয়েছিল, চব্বিশজন রাজপুত সর্দার নিহত হয়েছেন এবং মুসলমানদের মধ্যে মারা পড়েছেন একজন মাত্র সেনাপতি। মুসলমানরা কেবল যে ভালো করে লড়েনি, তা নয়; লড়াই শেষ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই চার-চার জন মুসলমান সেনাপতি শত্রুপক্ষে যোগদান করেছিল।

উপরন্তু ঔরংজীবের ফৌজে ছিল সুনিপুণ ফরাসি ও ইংরেজ গোলন্দাজগণ; দারার বা সম্রাটের ফৌজে ছিল না আগ্নেয়াস্ত্র। কাজেই ধরতে গেলে কামানের সঙ্গে লড়তে হয়েছিল তরবারিকে।

এমন যুদ্ধের ফল যা হওয়া উচিত, তাই হল। হাজার হাজার রাজপুত সৈন্য প্রাণদান করলে বটে, কিন্তু জয়লাভ করতে পারলে না। যশোবন্ত সিংহকে রণক্ষেত্র ছেড়ে পলায়ন করতে হল।

জাহানারা বলেন, আগ্রায় যখন খবর এল, ধরমাটের যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে ঔরংজীব যখন সদলবলে রাজধানীর দিকে ছুটে আসছেন, তখন বিপুল সম্পদের মধ্যেও হতভাগ্য সম্রাট সাজাহান আকাশের দিকে হাত তুলে আর্তকণ্ঠে বলে উঠেছিলেন—'হে ঈশ্বর, তোমারই ইচ্ছা!'

তারপর তিনি নিজেই যুদ্ধযাত্রার জন্যে প্রস্তুত হয়ে সেনাপতিদের আহ্বান করে আদেশ দিলেন, 'অবিলম্বে সৈন্য সমাবেশ করো!'

কিন্তু সম্রাটের পরামর্শদাতাদেরও মধ্যে ঔরংজীবের চরের অভাব ছিল না। তারা বেশ জানত, শাজাহান স্বয়ং সেনাদলের পুরোভাগে গিয়ে দাঁড়ালে বিলুপ্ত হবে বিদ্রোহী পুত্রদের সমস্ত আশা-ভরসা! অতএব তারা নানা মিথ্যা কারণ বা ভয় দেখিয়ে যুদ্ধযাত্রা থেকে সম্রাটকে নিরস্ত করে।

দারা তাড়াতাড়ি ষাট হাজার নতুন সৈন্য সংগ্রহ করে ঔরংজীব ও মুরাদকে বাধা দেবার জন্যে অগ্রসর হলেন। এই নতুন সৈন্যরা দলে ভারী হল বটে, কিন্তু তাদের মধ্যে ছিল শিক্ষিত যোদ্ধার অভাব।

এবারও ফৌজের মধ্যে মুসলমান সেনানী ও সৈনিকদের মধ্যে অনেকেই ছিল শত্রুপক্ষের চর বা ঔরংজীবের পক্ষপাতী। ১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দের ঊনত্রিশ মে তারিখে সামুগড়ের প্রান্তরে যে-যুদ্ধ হল, তাতেও প্রধান অংশ গ্রহণ করলে রাজপুত যোদ্ধারাই—তারাই হিন্দুদের প্রিয় দারার স্বার্থরক্ষার জন্যে দলে দলে লড়তে ও মরতে লাগল এবং ফৌজের প্রায় অর্ধেক মুসলমান সৈন্য ছিল বিশ্বাসঘাতক, তারা মুখরক্ষার জন্যে করলে কৃত্রিম যুদ্ধের অভিনয় মাত্র।

ফলে এবারেও হল যুবরাজ দারার শোচনীয় পরাজয়।

॥ সপ্তম ॥

যুদ্ধের পর

সামুগড়ের যুদ্ধে সম্রাটের ফৌজ পরাজিত এবং ঔরংজীব ও মুরাদ সসৈন্যে আগ্রার দিকে ধাবমান, এই দুঃসংবাদ বহন করে নিয়ে এল এক ফিরিঙ্গি ভগ্নদূত।

রাত্রের অন্ধকারে গা ঢেকে পরাজিত, পরিশ্রান্ত ও দুঃখে মুহ্যমান দারা কয়েকজন অনুচরের সঙ্গে আগ্রায় ফিরে এলেন বটে, কিন্তু দুর্গের মধ্যে প্রবেশ না করে নিজের প্রাসাদের ভিতরে গিয়ে আশ্রয় নিলেন।

দুর্গের মধ্যে অপেক্ষা করছিলেন বৃদ্ধ সম্রাট শাজাহান—গভীর নিরাশার প্রস্তরীভূত মূর্তির মতো। প্রিয় পুত্র দারাকে নিজের কাছে ডেকে পাঠালেন, কিন্তু উত্তরে দারা লিখে জানালেন, 'এই শোচনীয় দুর্দশার দিনে সম্রাটের কাছে মুখ দেখাবার ক্ষমতা আমার নেই। আমার সামনে রয়েছে সুদীর্ঘ পথ, আপনার আশীর্বাদ ও আদেশ পেলে এখন আমি সেই পথেরই পথিক হব।'

মর্মাহত শাজাহানের মনে হল, তাঁর আত্মা যেন দেহপিঞ্জর ত্যাগ করে বেরিয়ে যেতে চাইছে! কিন্তু শত্রুরা এখন হিংস্র শার্দূলের মতো অসহায় দারার বিরুদ্ধে বেগে ছুটে আসছে, তাঁর আর দুঃখ প্রকাশ করবারও অবসর নেই। তিনি তৎক্ষণাৎ দুর্গপ্রাসাদের ধনভাণ্ডার খুলে পুঞ্জ পুঞ্জ ধনরত্ন স্নেহাস্পদ দারার কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

আগ্রা থেকে দারা যাবেন দিল্লিতে। সেখানকার শাসনকর্তার কাছেও সম্রাটের আদেশ গেল—দিল্লির ধনভাণ্ডারের চাবি যেন দারার হাতে সমর্পণ করা হয়।

জন বারো অনুচর ও রক্ষী নিয়ে পলাতক দারা সহধর্মিণী নাদিরা বানু ও সন্তানদের সঙ্গে বিপজ্জনক আগ্রা নগরী ত্যাগ করলেন। বিজয়ী সৈন্যদলের সঙ্গে নিষ্ঠুর ঔরংজীব আগ্রা অধিকার করতে আসছে, একবার তার কবলে গিয়ে পড়লে যে তাঁর মুক্তিলাভের কোনও উপায় থাকবে না, এ কথা দারা ভালো করেই জানতেন।

তারপর আগ্রায় যে-অভূতপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা হল তার কথা এখানে বর্ণনা করবার দরকার নেই, কারণ আমাদের এখন যেতে হবে এই কাহিনির নায়ক দারার পিছনে পিছনে।

তবে দু-চারটে কথা উল্লেখযোগ্য। ঔরংজীব আগ্রা অধিকার ও দুর্গ অবরোধ করলেন। তাঁকে বোঝাবার জন্যে একবার শেষ চেষ্টা করবার উদ্দেশ্যে ঔরংজীবের সঙ্গে সম্রাট দেখা করতে চাইলেন।

কিন্তু ঔরংজীব নারাজ।

তখন সম্রাটকন্যা জাহানারা নতুন এক প্রস্তাব নিয়ে ভ্রাতা ঔরংজীবের কাছে এসে উপস্থিত হলেন। প্রস্তাবটি হচ্ছে এই:

সম্রাটের ইচ্ছা যে, সাম্রাজ্য চার রাজপুত্রদের জন্যে চার ভাগে বিভক্ত করা হোক।

দারাকে দেওয়া হোক পাঞ্জাব ও তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রদেশগুলি।

মুরাদের জন্যে গুজরাট, সুজার জন্যে বঙ্গদেশ এবং ঔরংজীবের জ্যেষ্ঠপুত্র মহম্মদ সুলতানের জন্যে দাক্ষিণাত্য।

সাম্রাজ্যের বাকি অংশ এবং শাজাহানের অবর্তমানে সিংহাসনের অধিকারী হবেন দারার বদলে ঔরংজীব।

ঔরংজীব কিন্তু নিজের সংকল্পে অটল। জবাবে জানালেন, 'দারা হচ্ছে ইসলামে অবিশ্বাসী ও হিন্দুদের বন্ধু। সত্য ধর্ম ও সাম্রাজ্যের শান্তির জন্যে দারাকে একেবারে উচ্ছেদ না করে আমি ছাড়ব না।'

১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট শাজাহান আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন এবং সুদীর্ঘ সাত বৎসরকাল আগ্রা দুর্গে বন্দিজীবন যাপন করবার পর তাঁর মৃত্যু হয়। তখন তাঁর পূর্ণ বয়স চুয়াত্তর বৎসর।

মুরাদের সম্বন্ধে এখানে কিছু বলবার নেই। নিজের উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে ঔরংজীব যে তাঁকে স্বহস্তচালিত যন্ত্রে মতো ব্যবহার করেছেন, নির্বোধ মুরাদ শেষ পর্যন্ত এই সহজ সত্যটা উপলব্ধি করতে পারেননি—যেদিন তাঁর চটকা ভাঙল, সেদিন তিনি বন্দি। সে হচ্ছে ১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দে পঁচিশে জুন তারিখের কথা। তিন বৎসর পরে গোয়ালিয়র দুর্গ থেকে পলায়নের চেষ্টা করেছিলেন বলে ঔরংজীবের ইচ্ছানুসারে কাজির বিচারে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন।

সুজাও করেছিলেন সিংহাসনের লোভে অস্ত্রধারণ। প্রথম যুদ্ধে তিনি দারার পুত্র সুলেমান সুকোর কাছে পরাজিত হন, কিন্তু তারপর তাঁর সঙ্গে দারার কাহিনির কোনও সম্পর্ক নেই। তারপর তিনি ঔরংজীবের কাছে বারবার হার মেনে ভারত ছেড়ে আরাকানে গিয়ে মগধের হাতে মারা পড়েন, কিন্তু সেসব কথা হচ্ছে এখানে অবান্তর।

॥ অষ্টম ॥

পলাতক ও বন্দি দারা

অতঃপর দারার জীবনের কথা বলতে গেলে বলতে হবে কেবল দুর্ঘটনার পর দুর্ঘটনার কাহিনি। এতদিন জীবন ছিল তাঁর সুদীর্ঘ এক সুখস্বপ্নের মতো, সামুগড়ের যুদ্ধের পর তিনি

এ জীবনে আর এক মুহূর্তের জন্যেও সুখশান্তির ইঙ্গিত পর্যন্ত দেখতে পাননি। সুখ আর দুঃখ, দুয়েরই দান পেয়েছিলেন তিনি অপরিমিত মাত্রায়।

দিল্লিতে এসে দারা আবার নতুন ফৌজ গঠনের জন্য তোড়জোড় করতে লাগলেন। কতক সৈন্য সংগৃহীত হল বটে, কিন্তু তাদের সংখ্যা হল না সন্তোষজনক।

তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র সুলেমান সুকোকে বাইশ হাজার সৈন্য দিয়ে সুজার বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হয়েছিল এবং তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিখ্যাত দুই সেনাপতি—মির্জা রাজা জয়সিংহ ও দিলির খাঁ। দারা তাঁদের দিল্লিতে এসে তাঁর সঙ্গে যোগদান করতে বললেন।

কিন্তু তাঁদের আগে-আগেই বিপুল এক বাহিনী নিয়ে দিল্লির দিকে আসতে লাগলেন স্বয়ং ঔরংজীব। উপায়ান্তর না দেখে দারা প্রস্থান করলেন লাহোরের দিকে, সঙ্গে রইল তাঁর দশ হাজার সৈন্য।

দিল্লিতে পৌঁছে ঔরংজীব নিজেকে ভারত সম্রাট বলে ঘোষণা করলেন। তারপর যাত্রা করলেন লাহোরের দিকে।

দারা হতাশ ভাবে বললেন, 'আমি ঔরংজীবকে বাধা দিতে পারব না। আর কেউ হলে এখানে দাঁড়িয়েই তার সঙ্গে আমি যুদ্ধ করতুম।'

দারা আবার পলায়ন করলেন মুলতানের দিকে। সেখানেও পিছনে পিছনে এলেন সদলবলে ঔরংজীব। দারা মুলতান থেকে পালালেন সক্কর শহরের দিকে এবং তারপর কান্দাহারের পথে এবং তারপর আবার স্থান থেকে স্থানান্তরে।

এমন সময়ে খবর এল সুজা সসৈন্যে আগ্রার নিকটবর্তী হয়েছেন। দারার অবস্থা তখন একান্ত অসহায়, কারণ তাঁর অধিকাংশ সৈন্য হতাশ হয়ে তাঁর পক্ষ পরিত্যাগ করেছে। আপাতত কিছুকাল তিনি আর মাথা তুলতে পারবেন না বুঝে ঔরংজীব সমস্ত শক্তি একত্র করে সুজার বিরুদ্ধে করলেন যুদ্ধযাত্রা। কিছু দিনের জন্য দারা পেলেন রেহাই।

পর বৎসর—অর্থাৎ ১৬৫৯ খ্রিস্টাব্দ। খাজোয়ার ক্ষেত্রে সুজাকে পরাজিত ও বিহারের দিকে বিতাড়িত করে ঔরংজীব খবর পেলেন যে দারা রাজস্থানে গিয়ে বাইশ হাজার সৈন্য সংগ্রহ করে আবার যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন। তিনিও যাত্রা করলেন দারার উদ্দেশ্যে।

আজমীরের চার মাইল দক্ষিণে দেওরাই গিরিসঙ্কটের কাছে আবার দুই ভ্রাতার শক্তি পরীক্ষা হল। এবারে দারা চারিদিক সামলে প্রাণপণে যুঝে প্রথমটা ঔরংজীবকে বেশ কাবু করে ও শেষ পর্যন্ত আবার হার মানতে বাধ্য হলেন। এই হল তাঁর শেষ প্রচেষ্টা। এরপর তিনি হয়ে পড়লেন একেবারেই নিঃস্ব ও শক্তিহারা।

তারপর দারা বাস্তুহারার মতো ঘুরে বেড়াতে লাগলেন দেশে দেশে দিকে দিকে। কিন্তু তিনি যেখানেই যান, পিছনে লেগে থাকে শত্রুচর। প্রথমে তাঁর সঙ্গে ছিল দুই হাজার সৈনিক, কিন্তু ক্রমেই তারা দলে দলে বা একে একে অন্নকষ্ট, জলকষ্ট ও পথকষ্ট সইতে না পেরে তাঁকে পরিত্যাগ করে গেল।

নির্জন মরুপ্রদেশ—তৃষ্ণায় সর্বদাই প্রাণ টা টা করে, খাদ্য মেলাও দুষ্কর। হিন্দুস্থানের

যুবরাজ চলেছেন দুপুরের ঝাঁ ঝাঁ রোদে ধুঁকতে ধুঁকতে ও ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে; তাঁর পরনে ময়লা সুতির পোশাক, পায়ে আট আনা দামের জুতো, সঙ্গে আছে মাত্র একটি ঘোড়া, নারীদের ও মালপত্তর বহনের জন্য গুটিকয় উট এবং মাত্র কয়েকজন বিশ্বাসী অনুচর।

তারপর দুর্ভগ্যের উপরে দুর্ভাগ্য! তাঁর রুগ্না সহধর্মিণী ও বিশ্ববিখ্যাত আকবর বাদশাহের প্রপৌত্রী নাদিরা বানু আর কষ্ট সইতে না পেরে প্রাণত্যাগ করলেন। সে আঘাতে দারা একেবারেই ভেঙে পড়লেন। জীবন্মৃত অবস্থায় তিনি বোলান গিরিসঙ্কটের নিকটস্থ দাদার নামক স্থানের আফগান জমিদারের কাছে পেলেন শেষ আশ্রয়। সে হচ্ছে ভয়াবহ আশ্রয়।

জমিদারের নাম মালিক জিওয়ান। কয়েক বৎসর আগে সম্রাট শাজাহান আদেশ দিয়েছিলেন, তাকে হাতির পায়ের তলায় ফেলে মেরে ফেলা হোক। কিন্তু যুবরাজ দারার প্রার্থনায় প্রাণদণ্ড থেকে সে অব্যাহতি লাভ করে।

বিশ্বাসঘাতক ও অকৃতজ্ঞ মালিক জিওয়ান প্রচুর পুরস্কারের লোভে তার প্রাণরক্ষক দারাকেই আজ নিঃসহায় অবস্থায় পেয়ে গ্রেপ্তার করে সমর্পণ করলে শত্রুপক্ষের হস্তে!

॥ নবম ॥

দারার নগর-ভ্রমণ

সম্রাট ঔরংজীব আদেশ দিয়েছেন, দিল্লির রাজপথে আবালবৃদ্ধবনিতার সামনে মিছিল করে দারাকে দেখিয়ে আনতে হবে!

একটা কর্দমাক্ত ছোটো মাদি হাতি তার পিঠের উপরে খোলা হাওয়ায় উপবিষ্ট পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী এবং সম্রাট শাজাহানের প্রিয়পুত্র দারা সুকো! ঠিক পাশেই বসে তাঁর চতুর্দশ বর্ষীয় দ্বিতীয় পুত্র সিপির সুকো।

দারার পরনে ধূলিধূসরিত কর্কশ ও নিকৃষ্ট পোশাক, মাথায় অতি দীনদরিদ্রের উপযোগী ময়লা পাগড়ি, আজ তাঁর কণ্ঠে নেই আর রত্নহার। তাঁর হস্তযুগল মুক্ত বটে, কিন্তু পদযুগল শৃঙ্খলে আবদ্ধ। পিছনে বসে আছে নগ্ন কৃপাণ হস্তে কারারক্ষক নজর বেগ।

প্রচণ্ড সূর্য মাথার উপরে করছে অগ্নিবর্ষণ। দিল্লির এই রাজপথই একদিন দেখেছে যুবরাজ দারা সুখসৌভাগ্য ও বদান্যতা। অপমানে মাথা নুইয়ে কোনও দিকে না তাকিয়ে দারা নিশ্চেষ্ট ভাবে বসে রইলেন স্তম্ভিতের মতো।

পথের ধার থেকে জনৈক ভিখারি কাতর কণ্ঠে ফুকরে উঠল, 'হে দারা, যখন তুমি প্রভু ছিলে, তখন সর্বদাই আমাকে ভিক্ষা দান করতে। কিন্তু আজ আর তোমার দান করবার কিছু নেই।'

সেই সময়ে মাত্র একবার মুখ তুলে ভিখারিকে দেখে দারা নিজের কাঁধ থেকে আলোয়ানখানা খুলে তার দিকে নিক্ষেপ করলেন।

দারাকে হাস্যাস্পদ করবার জন্যেই জনসাধারণের সামনে বার করা হয়েছিল। কিন্তু তার ফল হল উলটো। সেই বিপুল জনতার পুরুষ, নারী ও শিশুরা এমন তারস্বরে সম্মিলিত কণ্ঠে আর্তনাদ করতে লাগল, যেন তারা নিজেরাই পড়েছে কোনও ভীষণ দুর্ভাগ্যের কবলে। দানশীলতার জন্য দারা ছিলেন জনতার মানসপুত্রের মতো।

মিছিলের ভিতরে ক্রুদ্ধ জনতা বিশ্বাসঘাতক মালিক জিওয়ানকেও লক্ষ করেছিল। চরম অকৃতজ্ঞতার পুরস্কার স্বরূপ সে এখন লাভ করেছে সম্মানজনক বক্তিয়ার খাঁ উপাধি এবং এক হাজার অশ্বারোহী সৈন্যের নায়কত্ব। কিন্তু মনে মনে গুমরেও কেউ তাকে কিছু বলতে সাহস করেনি, কারণ মিছিলের সঙ্গে অসংখ্য সশস্ত্র সৈনিক।

কিন্তু পরদিন নতুন খাঁ সাহেব যখন নিজের দলবল নিয়ে ঔরংজীবের রাজসভায় যাচ্ছিল, ক্ষিপ্ত জনসাধারণ চারিদিক থেকে ছুটে এসে তাকে আক্রমণ করলে, তার কয়েকজন অনুচরকে মেরে ফেললে এবং তাকেও যে নির্দয় ভাবে হত্যা করত সে বিষয়ে কোনওই সন্দেহ নেই। কেবল সদলবলে কোতোয়াল এসে পড়াতে কোনওক্রমে সে প্রাণে বেঁচে গেল।

॥ দশম ॥

শেষ দৃশ্য

আবার হল বিচার প্রহসন। জ্যেষ্ঠ দারার উপরে প্রাণদণ্ডের হুকুম দিলেন সেজোভাই ঔরংজীব।

রাত্রিবেলা। পুত্র সিপির সুকোর সঙ্গে কারাগৃহে বসে ছিলেন দারা; এমন সময় সেখানে এসে দাঁড়াল সশস্ত্র নজর বেগ ও তার অনুচরেরা।

তাদের মুখ দেখেই দারা বলে উঠলেন, 'বুঝেছি, তোমরা আমাকে হত্যা করতে এসেছ।'

নজর বেগ বললে, 'না, আমরা সিপির সুকোকে এখান থেকে নিয়ে যেতে এসেছি।'

কিন্তু বালক সিপির বাবাকে ছেড়ে কিছুতেই যাবে না, সে কাঁদতে কাঁদতে দারার দুই পা জড়িয়ে ধরলে। দারাও সক্রন্দনে পুত্রকে বদ্ধ করলেন আলিঙ্গনের মধ্যে, কিন্তু নির্মম ঘাতকরা সিপিরকে জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে বাইরে চলে গেল।

দারা তখন একখানা কলম-কাটা ছুরি নিয়ে আততায়ীদের একজনকে আহত করলেন এবং অন্যান্য সকলের উপরেও করতে লাগলেন ঘন ঘন মুষ্টির আঘাত—ভেড়ার মতো তিনি প্রাণ দিতে নারাজ!

কিন্তু একদল সশস্ত্রের সঙ্গে একজন নিরস্ত্রের যুদ্ধ কতক্ষণ চলতে পারে? দারার দেহের উপরে হতে লাগল ঘন ঘন শাণিত ছোরার আঘাত।

পাশের ঘর থেকে ভেসে আসছিল সিপিরের যন্ত্রণাপূর্ণ তীব্র ক্রন্দনধ্বনি, কিন্তু তার

মধ্যেই দারার কারাকক্ষ হয়ে পড়ল একেবারে নিস্তব্ধ। সেখানে ঘরের দেওয়ালে দেওয়ালে রক্তের লেখন, মেঝের উপরে রক্তগঙ্গার ঢেউ, দিকে দিকে কেবল রক্ত আর রক্ত আর রক্ত! এবং এই বীভৎস ও ভয়াল রক্তোৎসবের মাঝখানে আড়ষ্ট হয়ে পড়ে আছে সম্রাটপুত্রের ছিন্নভিন্ন মৃতদেহ!

সিপিরের বুকফাটা কান্না আর থামল না। আজও পাষাণ কারাগারের অন্দরে বন্দি হয়ে আছে সেই মৌন ক্রন্দনরব! প্রাণের কানে শোনা যায় সেই নীরব ক্রন্দন!

ওদিকে দাদার ছিন্ন মুণ্ড স্বচক্ষে না দেখে ঔরংজীব নিশ্চিন্ত হতে পারছিলেন না। তাঁর কাছে দারার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন মুণ্ড প্রেরিত হল।

সেই কাটা মুণ্ড দেখে ছোটোভাই ঔরংজীব কী বলেছিলেন ইতিহাসে তা লেখা নেই। তবে তিনি যে কিছুমাত্র অনুতপ্ত হননি, এমন প্রমাণ পাওয়া যায়।

চতুর্ভুজের স্বাক্ষর

'চতুর্ভুজের স্বাক্ষর' গ্রন্থটি দেবসাহিত্য কুটীরের বিচিত্রা সিরিজের তৃতীয় গ্রন্থ। এই সিরিজের প্রথম ও দ্বিতীয় গ্রন্থ 'গুপ্তধনের দুঃস্বপ্ন' ও 'বাঘরাজের অভিযান' হেমেন্দ্রকুমার রায় রচনাবলীর যথাক্রমে ঊনবিংশ ও বিংশ খণ্ডভুক্ত হয়েছে। সিরিজের চতুর্থ গ্রন্থ 'নিশাচরী বিভীষিকা' সংকলিত হবে রচনাবলীর দ্বাবিংশ খণ্ডে।

॥ প্রথম ॥

পরিবীক্ষণের ম্যাজিক

আমি এবং ভারত চৌধুরি ছোটোবেলা থেকেই সহপাঠী। প্রথমে পাঠশালা থেকে ইস্কুল; তারপর ইস্কুল থেকে কলেজ; তারপর এম এ ডিগ্রির অধিকারী হয়ে আমরা দুজনেই ছাত্রজীবনের পালা সাঙ্গ করে দিলুম।

না, ছাত্রজীবনের পালা সাঙ্গ করলুম বলা চলে না। কারণ মেডিকেল কলেজে ঢুকে আরও কয়েকটা বৎসর ছাত্রজীবন যাপন করবার পর এম ডি উপাধি নিয়ে ডাক্তার হয়ে বেরিয়ে এলুম। কিন্তু উপাধি লাভ করলেই কেউ বড়ো ডাক্তার হতে পারে না, রোগীরা যদি তাকে স্বীকার না করে নেয়। ডিসপেনসারিও খুললুম এবং ধড়াচুড়ো পরে রোজ সেখানে হাজিরাও দিতে লাগলুম, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যক্রমে রোগীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারতুম কালেভদ্রে কদাচিৎ।

কিন্তু সেজন্যে আমার দুশ্চিন্তার কোনও কারণ ছিল না। কেননা, পৈতৃক সম্পত্তির দিক দিয়ে আমি ছিলুম রীতিমতো ভাগ্যবান। তারই দৌলতে আমার দৈনন্দিন জীবন কাটতে লাগল উপভোগ্য সব দিবাস্বপ্ন দেখতে দেখতে রীতিমতো আনন্দের ছন্দে।

এবং বন্ধুবর ভারতও ছিল আলালের ঘরের দুলালের মতো—অর্থাৎ প্রচুর পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। কাজেই স্বাভাবিক ভাবেই আমরা হয়ে পড়লুম মানিকজোড়ের মতো, কেউ কারুকে ছেড়ে থাকতে পারতুম না। তারই বৈঠকখানায় বসে আমার কেটে যেত সকাল থেকে প্রথম রাত পর্যন্ত। বাইরের লোক মনে করত, আমরা দুজনে এক বাড়িরই বাসিন্দা। এমনকি ভারতের বসবার ঘরের এক প্রান্তে ছিল আমারও নিজস্ব টেবিল চেয়ার ও কাগজপত্র পর্যন্ত। আমরা প্রায় অভেদাত্মা আর কী!

ভারতের ছিল এক অদ্ভুত শখ—এদেশে যাকে উদ্ভট বাতিক বলাও চলতে পারে। সে হতে চাইলে শৌখিন গোয়েন্দা। বাল্যকাল থেকেই এদিকে ছিল তার প্রাণের টান, সে কেবল রাশি রাশি ইংরেজি গোয়েন্দা কাহিনি ও অপরাধতত্ত্ব সম্বন্ধে অসংখ্য পুস্তকই পাঠ করত না, সেই সঙ্গে ব্যবহারিক জীবনেও নিজের লব্ধ জ্ঞানকে কাজে খাটাবার চেষ্টা করত। ছাত্রজীবনেই সে, তুচ্ছ হলেও, অনেক জটিল মামলার কিনারা করে সকলের বিস্মিত দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারত।

এদিকে তার আদর্শ স্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন আমেরিকার অ্যাল্যান পিঙ্কার্টন সাহেব। তিনি ছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর লোক। আমেরিকায় তিনি যখন তাঁর বিখ্যাত ডিটেকটিভ এজেন্সির প্রতিষ্ঠা করেন, তখন সেখানে সরকারি পুলিশ বাহিনীর কোনও অস্তিত্বই ছিল না। পিঙ্কার্টনের দলই তখন দেশের শান্তিরক্ষার ভার গ্রহণ করেছিল। আজ আমেরিকার বিরাট পুলিশ বাহিনীর খ্যাতি সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে, কিন্তু এখনও বহু বড়ো

বড়ো মামলার ভার দেওয়া হয় পিঙ্কার্টনের এজেন্সির উপরেই। এমনকি আমেরিকার প্রত্যেক বড়ো বড়ো শহরে পিঙ্কার্টনের ডিটেকটিভ এজেন্সির শাখাপ্রশাখা আছে। আজ পর্যন্ত পিঙ্কার্টনরা যে কত কুখ্যাত ও ভয়াবহ অপরাধীকে গ্রেপ্তার করেছেন তার আর সংখ্যা হয় না।

ভারত বলে, 'কেবল আমেরিকায় নয়, ইউরোপেরও প্রত্যেক দেশে বড়ো বড়ো শহরে পিঙ্কার্টনের মতো বেসরকারি গোয়েন্দাদের আস্তানা আছে। তাদেরও কোনও-কোনওটির নামডাক খুব বেশি। পাশ্চাত্য দেশে যা সম্ভব হয়েছে, আমাদের দেশেও তা সম্ভবপর হবে না কেন? যার যোগ্যতা আর অভিজ্ঞতা আছে এখানেও সে অনায়াসে বেসরকারি গোয়েন্দার কাজ করতে পারে। অবশ্য এদেশে প্রথম প্রথম বেসরকারি গোয়েন্দার পেশা নিশ্চয়ই অর্থকরী হবে না। কিন্তু আমার তো অর্থের অভাব নেই, তাই শৌখিন গোয়েন্দা রূপে আমি আমার কল্পনাকে বাস্তব রূপ দিতে চাই। এ চেষ্টাকে তোমরা অনায়াসেই পরীক্ষা বলে মনে করতে পারো।'

তার সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তির দু-একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে।

একদিন সে কথায় কথায় বললে, 'সাধারণ মানুষ চোখ দিয়ে যা দেখে মন দিয়ে তা গ্রহণ করে না। আর মন দিয়ে যা গ্রহণ করা হয় না, তাকে ভালো করে দেখাও বলা যেতে পারে না। এই যে চোখের সঙ্গে মন মিলিয়ে দেখা, একেই বলে পরিবীক্ষণ বা পর্যবেক্ষণ। গোয়েন্দা হতে গেলে আর-সবের আগে অর্জন করতে হবে এই পর্যবেক্ষণ করবার শক্তি। তোমার কথাই ধরো। তোমার বাড়ি তিনতলা। সিঁড়ি বেয়ে রোজ তুমি একতলা থেকে তিনতলায় গিয়ে ওঠো, তারপর আবার নীচে নেমে আসো—এই ভাবে রোজ তুমি বারকয়েক ওঠানামা করো। আচ্ছা, এখন বলো দেখি তোমার বাড়ির সিঁড়িতে কয়টা ধাপ আছে?'

খানিকক্ষণ ভেবে দেখবার পর আমি হতাশ ভাবে ভারতের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলুম।

—'কী হল, পারলে না তো?'

—'উঁহু!'

—'কিন্তু আমি লক্ষ করেছি, তোমার বাড়ির সিঁড়িতে ধাপ আছে আটাশটি। ভালো গোয়েন্দাদের এইসব খুঁটিনাটি ব্যাপার লক্ষ করবার শক্তি থাকে। আর সেই শক্তি থাকে বলেই তাঁরা অনেক সময় খুব ছোটো ছোটো তুচ্ছ জিনিস দেখেই বড়ো বড়ো মামলার কিনারা করে ফেলতে পারেন। এই পদচিহ্নের কথাই ধরো। মাটির উপরে পায়ের ছাপ পড়ে আসছে পৃথিবীর আদিকাল থেকেই, এবং আজ পর্যন্ত তা দৃষ্টিগোচর হয়েছে সকলেরই। কিন্তু সে দেখা হচ্ছে ভাসা ভাসা। কারণ মনের সঙ্গে তার যোগ নেই। অথচ অপরাধের ক্ষেত্রে এই পদচিহ্নের ইতিহাস অতিশয় বিচিত্র। যাদের পর্যবেক্ষণ শক্তি আছে, এই পদচিহ্ন দেখে তারা হাজার হাজার অপরাধীকে গ্রেপ্তার করতে পেরেছে। সভ্যদেশের শিক্ষিত গোয়েন্দাদের কথা স্বতন্ত্র; একেবারে বন্য অসভ্য জাতির মধ্যেও অনেক পদচিহ্ন বিশারদের সন্ধান পাওয়া যায়। পদচিহ্ন দেখেই তারা বলে দিতে পারে, কোনও লোক

রোগা না মোটা, ঢ্যাঙা না বেঁটে, সে ছুটে গিয়েছে কি ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়েছে কিংবা চলবার সময় তার পিঠের উপরে কোনও বোঝা ছিল কি না প্রভৃতি। সাধারণ দৃষ্টিও যেখানে অচল, সেখানেও তারা পদক্ষেপকারীর পদচিহ্ন আবিষ্কার করতে পারে। হয়তো ঘাসজমির উপরে কোথাও কতকগুলো কচি কচি ঘাস থেঁতলে গিয়েছে কিংবা ঝোপেঝাপে ডালপালার টুকরোটাকরা গিয়েছে ভেঙে। এমনি আরও সব সূত্র। গোয়েন্দার চোখে পড়ে আরও কত ব্যাপারই। আজ একটু আগেই তুমি কোথায় গিয়েছিলে আমি সে কথাও বলতে পারি।'

আমি অবিশ্বাসের স্বরে বললুম, 'অসম্ভব। সে কথা আমি তোমাকে বলিনি।'

—'বলোনি, কিন্তু আমি জানি। তুমি একটু আগে পোস্ট অফিসে গিয়েছিলে। টেলিগ্রাম করতে।'

সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলুম, 'তুমি তো আমার সঙ্গে যাওনি, তবে কেমন করে জানতে পারলে?'

—'পর্যবেক্ষণ শক্তির দৌলতে। আমার সামনেই ওই তো তোমার টেবিল রয়েছে। খানিক আগে ওই টেবিলের সামনে চেয়ারের উপরে তুমি চুপ করে বসেছিলে। তারপর হঠাৎ উঠে বাইরে বেরিয়ে গেলে। মিনিট পনেরো পরে যখন ফিরে এলে তখন দেখলুম তোমার জুতোর গোড়ালিতে লেগে রয়েছে সুরকির চিহ্ন। আমার বাড়ি থেকে পোস্ট আপিসটা হচ্ছে পাঁচ মিনিটের পথ। খুব সকালেই আমি দেখে এসেছি, ডাকঘরের সামনের ফুটপাথটা মেরামত করবার জন্যে সুরকি ঢালা রয়েছে। আজ ডাকঘরে কারুকে ঢুকতে হলে ওই সুরকি না মাড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই। তাইতেই আন্দাজ করলুম, নিশ্চয়ই তুমি আজ এখনই ডাকঘরে গিয়ে ফিরে এসেছ।'

আমি বললুম, 'সেটা যেন মানলুম, কিন্তু তুমি টেলিগ্রামের কথা জানলে কেমন করে?'

—'আন্দাজে ভাই, আন্দাজে। এ আন্দাজ সঠিক না হলেও হতে পারত।'

—'তবু আন্দাজটা কী শুনি না।'

—'আমি দেখলুম, তোমার টেবিলের উপরে পড়ে রয়েছে এক বান্ডিল নতুন পোস্টকার্ড আর খানকয়েক নতুন খাম। সুতরাং বুঝলুম খাম কি কার্ড কেনবার জন্যে তুমি ডাকঘরে যাওনি। তুমি কোনও চিঠিও লিখলে না, সুতরাং ডাকঘরে তোমার যাওয়ার উদ্দেশ্য চিঠি ফেলবার জন্যেও নয়। তবে তুমি কেন সেখানে গিয়েছিলে? খুব সম্ভব টেলিগ্রাম করতে।'

আমি চমৎকৃত কণ্ঠে বললুম, 'সাধু!'

ঠিক সেই সময় ভৃত্য ঘরে প্রবেশ করে বললে, 'বাবু, একটি মেয়েছেলে আপনাকে খুঁজতে এসেছে।'

ভারত বললে, 'কী রকম মেয়েছেলে রে?'

—'সোমত্ত মেয়ে বাবু, হাতে ব্যাগ, পায়ে জুতো।'

ভারত বললে, 'আচ্ছা, তাকে এইখানে নিয়ে আয়।'

॥ দ্বিতীয় ॥

কুমারী চিত্রা রায়

সিঁড়ির উপরে জুতো পরা পায়ের শব্দ শোনা গেল। দরজার দিক থেকে বাতাস আসছিল; ঘরের কাছ বরাবর পায়ের শব্দ থেমে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই হাওয়ায় ভেসে এল এসেন্সের মিষ্ট গন্ধ। তারপরই ঘরের ভিতরে দরজার কাছে দেখা গেল একটি তরুণীর মূর্তি। সুন্দরী তরুণী, বয়স একুশ-বাইশের বেশি হবে না। দুধে আলতা মাখানো রং, নাক মুখ চোখ যেন তুলি দিয়ে আঁকা। সাজগোজ একেবারে হাল ফ্যাশনের।

সেইখানে দাঁড়িয়ে আমাদের দুজনের মুখের পানে দ্বিধাভরা চোখ বুলিয়ে নিয়ে মহিলাটি বললেন, 'আমি ভারতবাবুর সঙ্গে দেখা করতে চাই। ভারতকুমার চৌধুরি।'

ভারত উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'আসুন, আসন গ্রহণ করুন।'

সে একখানা চেয়ার এগিয়ে দিলে। মহিলাটি চেয়ারের উপরে বসে ধীরে ধীরে বললেন, 'বিশেষ এক কারণে আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।'

ভারত শুধোলে, 'আপনার নাম?'

—'চিত্রা রায়।'

—'আমি আপনার কোন কাজে লাগতে পারি, বলুন?'

—'কুসুমপুরের বিমলাদেবীকে আপনি চেনেন তো?'

ভারত একটু ভেবে বললে, 'আমি কুসুমপুরের এক বিমলাদেবীকে চিনি, তিনি ওখানকার জমিদারের স্ত্রী, এখন বিধবা।'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ, তাঁর কথাই বলছি। তিনি আমার বিশেষ বন্ধু। তাঁর মুখেই শুনেছি, গেল বছরে আপনি কী একটা মামলার কিনারা করে তাঁর অত্যন্ত উপকার করেছিলেন।'

ভারত হেসে বললে, 'না, সে-মামলাটা বিশেষ কিছুই নয়। খুব সহজেই তার কিনারা করতে পেরেছিলুম।'

চিত্রাদেবী বললেন, 'কিন্তু বিমলাদেবীর মুখে অন্য কথা শুনেছি। সে নাকি বিশেষ রহস্যময় মামলা, পুলিশ কিছুই করতে পারেনি, আপনি না থাকলে তার কোনও কিনারাই হত না।'

ভারত বললে, 'আমার সম্বন্ধে এই উচ্চ ধারণার জন্যে বিমলাদেবীকে ধন্যবাদ। কিন্তু সে-মামলার সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কী?'

চিত্রাদেবী বললেন, 'কোনওই সম্পর্ক নেই। আপনার হাতে একটি নতুন মামলার ভার দেওয়ার জন্যে আমি এখানে এসেছি।'

—'মামলাটি কী?'

—'তাহলে গোড়া থেকেই শুনুন। আমার বাবার নাম নরেন্দ্রনাথ রায়। তিনি ছিলেন সামরিক বিভাগের একজন ডাক্তার। সেই কাজের জন্য তাঁকে বেশ কিছুকালের জন্যে বাস

করতে হয়েছিল আন্দামান দ্বীপে। তারও আগে বারবার বদলি হয়ে তাঁকে ভারতবর্ষের এদেশে-ওদেশে ঘুরে বেড়াতে হয়েছিল। বালিকা বয়সেই আমি মাতৃহীনা হই। আমি ছিলুম বাপ-মায়ের একমাত্র সন্তান। বাবাকে প্রবাসী জীবন যাপন করতে হত বলে আমি মানুষ হয়েছি চন্দননগরের এক 'কনভেন্টে'। ঠিক দশ বছর আগে বাবার কাছ থেকে একখানা পত্র পাই। তাতে তিনি আমাকে জানিয়েছিলেন, কলকাতায় ফিরে এসে তিনি এক হোটেলে গিয়ে উঠেছেন, আমি যেন অবিলম্বে তাঁর সঙ্গে দেখা করি। চিঠি পেয়ে যথাসময়ে আমি তাঁর ঠিকানায় গিয়ে হাজির হলুম। কিন্তু সেখানে গিয়ে হোটেলের ম্যানেজারের মুখে শুনলুম, আমার বাবা আগের রাত্রে বাইরে বেরিয়ে তখনও পর্যন্ত হোটেলে ফেরেননি। সারাদিন আমি তাঁর অপেক্ষায় বসে রইলুম, কিন্তু বাবা সেদিনও ফিরলেন না। তখন হোটেলের ম্যানেজার আমাকে উপদেশ দিলেন নিশ্চয়ই কোনও দুর্ঘটনা ঘটেছে, আমি যেন অবিলম্বে পুলিশে খবর দি। আমি তাঁর কথামতোই কাজ করলুম। কিন্তু পুলিশ বাবার কোনও সন্ধানই পেলে না। খবরের কাগজে অনেক বিজ্ঞাপন দিয়েছি তাতেও কোনও ফল হয়নি। আজ পর্যন্ত তিনি নিরুদ্দেশ হয়েই আছেন। চাকরি ছেড়ে তিনি কলকাতায় এসেছিলেন শান্তিময় শেষজীবন যাপন করবার জন্যে, কিন্তু—'

শেষ কথাগুলো বলতে বলতে চিত্রাদেবীর গলার আওয়াজ ভারী হয়ে এল।

ভারত তার নোটবুক বার করে জিজ্ঞাসা করলে, 'আপনার বাবা নিরুদ্দেশ হয়েছেন কোন তারিখ থেকে?'

—'উনিশশো চুয়াল্লিশ খ্রিস্টাব্দের পাঁচ ডিসেম্বর থেকে।'

—'তাঁর সঙ্গের মোটঘাট?'

—'হোটেলেই ছিল। সে-সবের ভিতর থেকে কোনও সূত্রই পাওয়া যায়নি। ছিল কিছু জামাকাপড়, খানকয়েক বই, আর আন্দামানের কতকগুলো টুকিটাকি জিনিস।'

—'কলকাতায় আপনার বাবার কোনও বন্ধু আছেন?'

—'বাবার এক বিহারি বন্ধুও চাকরি নিয়ে আন্দামানে গিয়েছিলেন। তাঁর নাম রামচন্দ্র সিংহ। তিনি ছিলেন পুলিশের একজন পদস্থ কর্মচারী। জাতে বিহার দেশের লোক হলেও তিনি বাস করেন কলকাতা শহরে। সেখানেও আমি খবর নিয়েছিলুম কিন্তু বাবার কোনও খবরই তিনি দিতে পারলেন না। এমনকি বাবা যে কলকাতায় ফিরে এসেছেন সে কথাও তাঁর জানা ছিল না।'

ভারত বললে, 'অদ্ভুত মামলা!'

চিত্রাদেবী বললেন, 'কিন্তু সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপারটা এখনও আপনার কাছে বলা হয়নি। প্রায় ছয় বৎসর আগে তিন-চারখানা ইংরেজি কাগজে একটি বিজ্ঞাপন দেখে জানতে পারি যে, আন্দামানের ডাক্তার নরেন্দ্রনাথ রায়ের কন্যা চিত্রাদেবী খবরের কাগজে তাঁর ঠিকানা প্রকাশ করলে তিনি বিশেষ ভাবে উপকৃত হবেন। সেই বিজ্ঞাপন পাঠ করে আমি বিস্মিত হলেও কাগজে আমার ঠিকানা প্রকাশ করেছিলুম। তারপরেই ডাকযোগে আমি ছোটো একটি প্যাকেট পেলুম। প্যাকেট খুলে সবিস্ময়ে দেখলুম, তার ভিতরে রয়েছে মস্ত একটি

দামি মুক্তো। সেরকম উজ্জ্বল মুক্তো আমি জীবনে আর দেখিনি। প্যাকেটের ভিতরে প্রেরকের কোনও নাম কি ঠিকানা কি চিঠিপত্র কিছুই ছিল না। আরও আশ্চর্যের কথা হচ্ছে, তারপর প্রতি বৎসরে ঠিক একই তারিখে আমি একটি করে বড়ো মুক্তা উপহার পেয়ে আসছি। জহুরির কাছে যাচাই করে জানতে পেরেছি, মুক্তাগুলিকে অমূল্য বলাও চলতে পারে। আপনারাও স্বচক্ষে দেখলে সেকথা বুঝতে পারবেন।'

চিত্রাদেবী আমাদের সামনে একটি ছোটো বাক্স খুলে ধরলেন। তার ভিতরে ঠিক ছয়টি মুক্তা পাশাপাশি সাজানো রয়েছে। সত্য-সত্যই তাদের অমূল্য বললে কিছুমাত্র অত্যুক্তি করা হয় না। এর চেয়ে চমৎকার মুক্তা আমরাও কখনও চোখে দেখিনি।

ভারত বললে, 'আপনার মামলা কেবল অদ্ভুত নয়; অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। এরপর আর কোনও ঘটনা ঘটেছে?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ, আজকেই ঘটেছে। সেইজন্যেই আমি আপনার কাছে এসেছি। আজ সকালে আমি এই চিঠিখানা পেয়েছি, আপনি নিজে পড়ে দেখতে পারেন।'

চিঠিখানা হাত বাড়িয়ে নিয়ে ভারত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বললে, 'খামের ওপর ভবানীপুরের ডাকঘরের ছাপ। হুঁ, এক কোণে একটা আঙুলেরও ছাপ রয়েছে—খুব সম্ভব ডাকপিয়নের। কোনও ঠিকানা নেই। দামি আর পুরু চিঠির কাগজ—পত্রলেখক নিশ্চয়ই সাধারণ লোক নয়। লিখেছে—'আজ সন্ধ্যা সাতটার সময় জেনারেল পোস্ট অফিসের সামনেকার ডান দিক থেকে তৃতীয় থামের পাশে উপস্থিত থাকবেন। যদি কোনও দুশ্চিন্তা হয় সঙ্গে দুইজন পুরুষ বন্ধুকেও নিয়ে যেতে পারেন। আপনার উপরে অত্যন্ত অন্যায় অবিচার করা হয়েছে, তার প্রতিকার করা উচিত। পুলিশে খবর দেবেন না। পুলিশে খবর দিলে সমস্তই ব্যর্থ হবে। ইতি—আপনার অজানা বন্ধু।' বিলক্ষণ! এ যে রীতিমতো রহস্যময় ব্যাপার! আপনি কী করতে চান চিত্রাদেবী?'

—'আমার কী করা উচিত, তাই জানবার জন্যেই তো আপনার কাছে এসেছি। কিন্তু প্রথমেই শুনে রাখুন, বন্ধু বলে আমার কেউ নেই।'

ভারত হাসতে হাসতে বললে, 'আমরা দুজনে যদি আপনার বন্ধুর স্থান গ্রহণ করি, তাহলে আপনি আপত্তি করবেন না তো?'

—'নিশ্চয়ই নয়! সে হবে আমার পরম সৌভাগ্য!'

ভারত বললে, 'তাহলে আমি আর ভাস্কর আজ যথাসময়ে আপনার সঙ্গে যথাস্থানেই হাজির থাকতে পারি। কেমন, এই বন্দোবস্তে আপনার কোনও অসুবিধে হবে না তো?'

—'না, আমার কোনও অসুবিধাই নেই।'

ভারত উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'বেশ তাহলে এই কথাই রইল। আপনি সন্ধ্যার আগে ঠিক ছয়টার সময় আমার এখানে এসে হাজির হবেন। তারপর কী হয় দেখা যাবে!'

চিত্রাদেবী গাত্রোত্থান করে বললেন, 'আমি যথাসময়েই আসব। নমস্কার।'

চিত্রাদেবী চলে যাবার পর আমি বললুম, 'মেয়েটি অপরূপ সুন্দরী!'

ভারত একটা সিগারেট ধরিয়ে বললে, 'তাই নাকি? আমি লক্ষ করিনি।'

আমি ক্ষুব্ধস্বরে বললুম, 'ভারত, ক্রমেই তুমি একটি মেশিন হয়ে উঠছ, তোমার কোনও অনুভূতিই নেই! মেয়েটির অমন রূপও তোমার চোখে পড়ল না?'

ভারত কী যেন ভাবতে ভাবতে বললে, 'আমার কাছে মক্কেল বড়ো নয় ভাস্কর, আমার কাছে বড়ো হচ্ছে মামলা। তার অতিরিক্ত কোনও ব্যক্তিগত কথা নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না।'

আমি কিন্তু চিত্রাদেবীকে এত সহজে ভুলতে পারলুম না। মনে মনে ভাবতে লাগলুম তাঁর সেই মিষ্ট হাসি আর শিষ্ট ভাবভঙ্গির কথা। তাঁর যে এখনও বিবাহ হয়নি, এটুকু অনুমান করতে পারলুম। কিন্তু এমন স্বর্গীয় সৌন্দর্য যে আজ পর্যন্ত উপেক্ষিত হয়ে আছে, এও বড়ো আশ্চর্য কথা। আমার মনে গোড়া থেকেই তিনি একটি ছাপ রেখে গেলেন। জীবনের যাত্রাপথে বারবার দেখেছি, কোনও কোনও মানুষের সঙ্গে হয়তো চকিতের জন্যে দেখা হল, কিন্তু সেই দেখার স্মৃতি বহু দিন পর্যন্ত মন থেকে আর মুছে গেল না। তবে এখানে একটি আশার কথা এই যে, ভবিষ্যতেও চিত্রাদেবী জনতার ভিতরে আর হারিয়ে যাবেন না, অনতিবিলম্বেই তাঁর সঙ্গে আবার দেখা হবার সম্ভাবনা আমার আছে।

সেই অদূরবর্তী সৌভাগ্যকে লাভ করবার জন্যে উন্মুখ হয়ে রইল আমার মন।

॥ তৃতীয় ॥

অজানা রহস্যের সন্ধানে

বৈকালে ঘরের ভিতরে ভারতকে দেখতে পেলুম না। ভারতের পুরাতন ভৃত্য মাধবের নিকট শুনলুম, খাওয়া দাওয়ার পরেই তার বাবু কোথায় বেরিয়ে গিয়েছে, তার কাছে কোনও কথা বলে যায়নি।

প্রায় আধঘণ্টাকাল বসে থাকবার পর ভারত আবার ফিরে এল, তার মুখচোখের ভাব বেশ প্রফুল্ল। গলা চড়িয়ে বললে, 'মাধব! ওরে মাধু, ঠিক চায়ের সময়ে এসে হাজির হয়েছি, আমাদের আর বসিয়ে রাখিসনি।'

আমি বললুম, 'খবর কী?'

ভারত একখানা চেয়ারের উপরে ধুপ করে বসে পড়ে বললে, 'খবর শুভ। ছোটোখাটো একটা তদন্তে গিয়েছিলুম। জানতে পারলুম, চিত্রাদেবীর বিহারি পিতৃবন্ধু, পুলিশের ভূতপূর্ব অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার রামচন্দ্র সিংহ গত উনিশশো উনপঞ্চাশ সালের তেসরা জানুয়ারি ইহলোক ত্যাগ করেছেন। ভাস্কর হে, এটা একটা মস্ত বড়ো সুখবর।'

—'তার মানে?'

ভারত বললে, 'তোমার স্মৃতির পরমায়ু অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। ভুলে বসেছ যে, চিত্রাদেবী ডাকযোগে প্রথম মুক্তা উপহার পান উনিশশো উনপঞ্চাশ সালের পনেরোই জানুয়ারি

তারিখে—অর্থাৎ রামচন্দ্র সিংহের মৃত্যুর প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই। এইবারে কিঞ্চিৎ মস্তিষ্ক চালনা করো। চিত্রাদেবীর পিতা নরেন্দ্রবাবু দশ বছর আগে কাজ থেকে অবকাশ নিয়ে কলকাতায় ফিরে এসেছিলেন। কলকাতায় তাঁর সবচেয়ে বড়ো বন্ধু ছিলেন রামচন্দ্রবাবু। এখন নরেন্দ্রবাবুর পক্ষে স্বাভাবিক কী? নিশ্চয়ই তাঁর ওই প্রিয় বন্ধুর সঙ্গে দেখা করা। কিন্তু রামবাবু বলেছিলেন তাঁর সঙ্গে নরেনবাবুর দেখাই হয়নি। নরেনবাবু অদৃশ্য হলেন। তার চার বৎসর পরে রামবাবু মারা গেলেন। তারপর পক্ষকাল কাটতে না কাটতেই নরেনবাবুর কন্যা একটি মহামূল্যবান মুক্তা উপহার পেলেন। পরে পরে পাঁচ বৎসরে চিত্রাদেবীর হস্তগত হল আরও পাঁচ-পাঁচটি মুক্তা। তারপর চিত্রাদেবীকে কেউ জানিয়েছে যে, তাঁর উপর অবিচার করা হয়েছে। এখানে প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে, কী সেই অবিচার? কেউ তাঁকে পিতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত করেছে, তাই কি? দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, রামবাবুর মৃত্যুর ঠিক পর থেকেই মুক্তা উপহার দেওয়া শুরু হল কেন? তবে কি বুঝতে হবে যে, রামবাবুর কোনও উত্তরাধিকারী ভিতরের সব রহস্য জানতে পেরে তথাকথিত অবিচারের কোনও প্রতিকার করতে চান? তুমি কী বলো?'

আমি বললুম, 'তোমার যুক্তি মানলে বলতে হয় যে, কী বিচিত্র ক্ষতিপূরণ। আর কী আশ্চর্যভাবেই সে প্রস্তাবটা করা হয়েছে! তারপর ভেবে দ্যাখো, এই প্রস্তাবটা ছয় বৎসর আগেই বা করা হল না কেন?'

ভারত বললে, 'নিশ্চয়ই কোনও বাধা ছিল। বাধাটা যে কী আজকেই জানতে পারা যাবে। তবে আপাতত এক বিষয়ে আমি নিশ্চিত। রহস্যের অন্ধকারের মধ্যে কয়েক পদ অগ্রসর হতে পেরেছি।'

এই সময় মাধু চা নিয়ে এল। চা পানের পর খানিকক্ষণ যেতে না যেতেই আবির্ভাব হল চিত্রাদেবীর।

ভারত চুপি চুপি আমাকে বললে, 'আমি আমার রিভলভার নিয়ে যাচ্ছি, তুমিও কোনও অস্ত্র সঙ্গে রেখো। কী জানি গুরুতর কিছু ঘটলেও ঘটতে পারে।' তারপর চিত্রাদেবীর দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করলে, 'আপনার বাবার বন্ধু রামবাবু সম্পর্কে আর-কোনও খবর আমাকে দিতে পারেন?'

চিত্রা বললেন, 'তিনি যে বাবার শ্রেষ্ঠ বন্ধু এইটুকুই আমি জানি। আর শুনেছি আন্দামান দ্বীপে তাঁদের দুজনকে সর্বদাই একসঙ্গে দেখা যেত। হ্যাঁ, আর একটা কথা। বাবার মোটঘাটের ভিতর থেকে একখানা অদ্ভুত কাগজ পাওয়া গেছে যার অর্থ কেউ বুঝতে পারেনি। আপনার দরকার হতে পারে ভেবে সেখানা আমি সঙ্গে নিয়ে এসেছি।'

কাগজখানা নিয়ে টেবিলের উপর বিছিয়ে রেখে ভারত একমনে তা পরীক্ষা করতে লাগল। তারপর ধীরে ধীরে বললে, 'এই কাগজখানা এক সময়ে একটা বোর্ডের উপরে পিন দিয়ে আঁটা ছিল। মনে হচ্ছে, এখানা কোনও বাড়ির নকশা—অট্টালিকার মতো প্রকাণ্ড বাড়ি। তার মধ্যে আছে বড়ো বড়ো হল্‌ঘর, লম্বা লম্বা দালান, আরও অনেক কিছু। এক জায়গায় লাল কালি দিয়ে লেখা রয়েছে—চতুর্ভুজের স্বাক্ষর। বাঁ কোণে আছে পরে পরে

চারটে ঢ্যারা চিহ্ন, তার পাশে লেখা পরে পরে চারটে নাম—সুজন সাহু, আবদুল্লা খাঁ, দোস্ত মহম্মদ, আর হাজি মহম্মদ। না, আপাতত এর মানে আমিও কিছু বুঝতে পারছি না। কিন্তু কাগজখানা নিশ্চয়ই খুব দরকারি। বেশ পুরাতন, তবু খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। বোঝা যায়, এখানা যত্নের সঙ্গে রক্ষা করা হয়েছে।'

চিত্রা বললেন, 'ওখানা ছিল বাবার পকেট বুকের ভিতরে।'

—'তাহলে আপনিও এখানা খুব সাবধানে রেখে দিন। হয়তো আমাদের কাজে লেগে যাবে। মামলাটাকে এখন আরও বেশি রহস্যময় বলে মনে হচ্ছে।'

সন্ধ্যা সাতটার খানিক আগেই আমরা জেনারেল পোস্ট আপিসে গিয়ে পৌঁছলুম। সেদিন শীতের সন্ধ্যা, চারিদিকে বিছানো কুয়াশার চাদর, তারই ভিতর থেকে এদিকে-ওদিকে ফুটে উঠেছে রাস্তার আলোগুলো; কতক স্পষ্ট কতক অস্পষ্ট। সন্ধ্যার পর এদিকটা নির্জন ও নিরালা হয়ে পড়ে। কিন্তু এখন যানবাহনের সংখ্যা কমে গেলেও, পথিকের সংখ্যা বিশেষ কমেনি। ডাকঘরের ঘড়িতে ঢং ঢং করে সাতটা বাজার ঠিক সঙ্গে-সঙ্গেই একখানা কালো রঙের মোটরগাড়ি আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। গাড়ির ভিতর থেকে নেমে এল ড্রাইভার।

লোকটা সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে ঠিক তৃতীয় স্তম্ভের কাছে এসে আমাদের জিজ্ঞাসা করলে, 'আপনারা কি চিত্রাদেবীর সঙ্গে এসেছেন?'

ভারত বললে, 'হ্যাঁ। ইনিই হচ্ছেন চিত্রাদেবী।'

চিত্রাদেবীকে একটা সেলাম ঠুকে লোকটা বললে, 'আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি, আমাকে মাপ করবেন। আপনার সঙ্গে পুলিশের কোনও লোক নেই তো?'

চিত্রা বললেন, 'না, এঁরা আমার বিশেষ বন্ধু।'

—'তাহলে আপনারা গাড়িতে এসে বসুন।'

মোটর চলতে লাগল। গাড়ির ভিতরে চুপ করে বসে আছি আমরা তিনজনই। আর কারুর কথা বলতে পারি না, কিন্তু আমি মনের ভিতরে বিশেষ স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করছিলুম না। অদ্ভুত একটা মামলার ভার ঘাড়ে নিয়ে যাচ্ছি কোনও অজানা জায়গায়, দেখা হবেও অচেনা লোকজনের সঙ্গে। তারা যে নিম্নশ্রেণির লোক নয়, এই দামি ও প্রকাণ্ড গাড়িখানা দেখেই সেটা বেশ বুঝতে পারছি। কিন্তু তাদের প্রকৃতি দুর্দান্ত হওয়াও অসম্ভব নয়। চিত্রাদেবীর বাবাও নিশ্চয়ই কোনও বিপদে পড়েই অদৃশ্য হয়েছেন। আজ চিত্রাদেবীকেও বিপদে ফেলবার জন্য নতুন কোনও ফাঁদ পাতা হয়েছে কি না, কে বলতে পারে?

গাড়ি লালবাজার ছাড়িয়ে, বউবাজার স্ট্রিটের মাঝ বরাবর মোড় ফিরে ঢুকল গিয়ে কলেজ স্ট্রিটের ভিতরে। তারপর সোজা হ্যারিসন রোডের মোড় ও শ্যামবাজারের মোড়ের পর খালের পোল পার হয়ে প্রবেশ করল ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের ভিতরে। আরও খানিকক্ষণ চলবার পর গাড়ি গিয়ে ঢুকল একটা বাগানের ফটকের ভিতরে এবং তারপর গিয়ে দাঁড়াল একখানা বাড়ির গাড়িবারান্দার তলায়।

সদরের সামনে দারোয়ান বসেছিল, সে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল এবং সঙ্গে-সঙ্গেই ভিতর থেকে একটা দুর্বল, রুগ্ন কণ্ঠস্বর শোনা গেল—'ওঁদের একেবারে ভিতরে পাঠিয়ে দাও।'

॥ চতুর্থ ॥

গুপ্তধন আবিষ্কার

বাড়ির ভিতরে ঢুকলুম। চারিদিকে আধা অন্ধকারের আভাস, দেওয়ালগুলো ভিজে স্যাঁতসেঁতে, তার উপর কতদিন আগে চুনকাম করা হয়েছে কেউ বলতে পারে না এবং কোথাও নেই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বালাই।

হঠাৎ একদিকের একটা দরজা খুলে গেল এবং বাইরে এসে পড়ল একটা উজ্জ্বল আলোকের উচ্ছ্বাস।

দেখলুম দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে একটি খুব ছোটোখাটো মূর্তি। আরও ইঞ্চি দুয়েক মাথায় খাটো হলে অনায়াসেই তাকে বামনের মূর্তি বলা যেতে পারত। শ্যামবর্ণ, একহারা, সর্বাঙ্গে জড়ানো পুরু শীতের কাপড়।

মূর্তির মাথার আগাগোড়া চকচকে টাকে ভরা, কোথাও একগাছা চুলেরও আভাস নেই। মাথার মাঝখানটা আবার নৈবেদ্যের মতো উঁচু ও সূচালো হয়ে উঠেছে—যেন কোনও ন্যাড়া পাহাড়ের শিখর। তার মুখ কখনও হাস্যময় ও কখনও ভ্রূকুটিপূর্ণ এবং ক্ষণে ক্ষণে হচ্ছে তার ভাবপরিবর্তন। তার বয়স বোধ হয় তিরিশ বৎসরের বেশি হবে না।

মূর্তি দুইপদ এগিয়ে এসে বললে, 'নমস্কার চিত্রাদেবী, অধীনের নাম শ্যামলাল সিংহ। নমস্কার মহাশয়গণ, ঘরের ভিতরে আসুন। বিশেষ উল্লেখযোগ্য না হলেও, এ ঘরখানি আমার নিজের রুচি অনুসারে সাজানো। এমন বাড়ির ভিতরে আমার এই ঘরখানাকে মরুভূমির মাঝখানে ওয়েসিসের মতোই মনে হতে পারে, কী বলেন?'

সত্য, ঘরখানা দেখে আমাদের মনে জাগল অত্যন্ত বিস্ময়। এই বিশ্রী বাড়ির ভিতরে এমন সুশ্রী ঘর—এ যেন দস্তার আংটির উপরে দামি হিরা বসানো! জানলায় জানলায় ঝুলছে কারুকার্য করা পুরু মখমলের পর্দা, দেওয়ালে দেওয়ালে শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের আঁকা তৈলচিত্র এবং ঘরের কোণে কোণে ছোটো ছোটো মার্বেলের টেবিলের উপর বসানো মূল্যবান ও সুচিত্রিত চিনেমাটির ভৃঙ্গার। কক্ষতলে বিস্তৃত এমন স্থূল কার্পেট যে, তার ভিতরে আমাদের পা বসে যেতে লাগল।

গদিমোড়া চেয়ারের উপরে আমরা তিনজনে বসে পড়লুম।

শ্যামলাল বললে, 'নিশ্চয়ই আপনি চিত্রাদেবী, আর এই দুটি ভদ্রলোক—'

তাঁর মুখের কথা শেষ না হতেই চিত্রা বললে, 'এঁরা দুজনেই আমার বন্ধু—শ্রীভারতকুমার চৌধুরি আর ডাক্তার শ্রীভাস্করচন্দ্র সেন।'

শ্যামলাল সাগ্রহে উত্তেজিত কণ্ঠে বললে, 'কী বললেন! ডাক্তার? বটে! আপনার স্টেথস্কোপ সঙ্গে এনেছেন? বেশ, তাহলে মন দিয়ে আমাকে পরীক্ষা করে দেখুন দেখি!'

তাই করলুম। পরীক্ষার পর বললুম, 'শ্যামলালবাবু, আপনি এমন থরথর করে কাঁপছেন কেন? আপনার শরীরে কোনও রোগ আছে বলে তো মনে হল না, আপনি সম্পূর্ণ সুস্থ।'

শ্যামলাল বললে, 'কাঁপছি, কারণ আমি উত্তেজিত। আমার মানসিক অবস্থা মোটেই আশাপ্রদ নয়। যাক, আমার কোনও রোগ নেই শুনে নিশ্চিন্ত হলুম। চিত্রাদেবী, উত্তেজনা ব্যাপারটা স্বাস্থ্যের পক্ষে মোটেই অনুকূল নয়। আপনার বাবা যদি উত্তেজিত না হতেন, তাহলে নিশ্চয়ই আজ পর্যন্ত জীবিত থাকতেন।'

চিত্রা কাতর কণ্ঠে বললে, 'আমার বাবার মৃত্যুর কারণ তো আমি জানি না!'

শ্যামলাল বললে, 'অপেক্ষা করুন। একে একে সব কথাই আপনি জানতে পারবেন। কেবল তাই নয়, আপনার উপরে যাতে সুবিচার হয়, সেই চেষ্টাই আমি করব। অবশ্য কামলাল ভায়া যে আমার উপরে খুশি হবে না, সেটা আমি বেশ বুঝতে পারছি।'

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'কামলাল কে?'

—'আমার ছোটোভাই। চিত্রাদেবীর সঙ্গে আপনারাও এখানে এসে ভালোই করেছেন। এরপর আমি যা বলব আর যা করব, তার সাক্ষী থাকবেন আপনারাও। আমরা কয়জনে একজোট হয়ে কাজ করলে কামলাল মনে যা ভাবুক, মুখে কিছু বলতে পারবে না। কিন্তু স্মরণ রাখবেন, এর মধ্যে পুলিশ কি টিকটিকি এসে যেন মাথা না গলায়। তাহলে কাজটা কিন্তু সমস্তই ভেস্তে যাবে।'

ভারত বললে, 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, পুলিশের কোনও প্রশ্নই এখানে উঠবে না।'

শ্যামলাল চেয়ারের উপর ভালো করে গুছিয়ে বসে বললে, 'তাহলে কামলালের সঙ্গে দেখা হবার আগে কাহিনিটা সংক্ষেপে আপনারা শ্রবণ করুন। আমার বাবা পুলিশ বিভাগের পদস্থ কর্মচারী ছিলেন। তাঁর শেষ কর্মস্থল ছিল আন্দামান দ্বীপ। বাবা বিহারের লোক হলেও বাংলা দেশকেই বেশি পছন্দ করতেন। তাই পেনশন নিয়ে দক্ষিণ কলিকাতায় চলে আসেন। সেইখানে একখানি নিজস্ব বাড়ি তুলে তিনি বাস করতে থাকেন। সেই বাগানওয়ালা বাড়িখানির নাম দেন 'সাগরস্মৃতি'। আন্দামানের সমুদ্রের সৌন্দর্য তিনি ভুলতে পারেননি, সেইজন্যেই বাড়ির এই নাম। কামলাল আর আমি হচ্ছি যমজ ভাই, আমাদের মা অনেকদিন আগেই পরলোকে গিয়েছেন। বাবার সঙ্গে সেই বাড়িতে আমরা বেশ নিশ্চিন্তভাবেই জীবনযাত্রা নির্বাহ করছিলুম। ডাক্তার নরেন্দ্রনাথ রায়—অর্থাৎ চিত্রাদেবীর বাবা যখন নিখোঁজ হন, আমাদের পরিবারের ভিতর বেশ একটা উত্তেজনার সাড়া পড়ে গিয়েছিল। বাবার সঙ্গে আমরা প্রায়ই সে ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করতুম। কিন্তু বাবা যে কোনও কথা গোপন করেছেন, এ সন্দেহ একবারও আমরা করতে পারিনি।

'কিন্তু একটা ব্যাপার আমরা লক্ষ করতুম। বাবা যেন কোনও বিপজ্জনক রহস্যের মধ্যে বাস করতেন। সহজে তিনি বাড়ির বাইরে যেতে চাইতেন না। যখন বাইরে যেতে বাধ্য

হতেন, তখন তাঁর সঙ্গে সর্বদাই থাকত দুজন দেহরক্ষী। তাদের একজনকে আজ আপনারা দেখেছেন, সে এখন আমার মোটর চালায়। দেহরক্ষীদের আর-একজন আছে আমার ভাই কামলালের বাড়িতে। আগে এরা দুজনেই ছিল পেশাদার পালোয়ান।

'আর-একটা অদ্ভুত উদ্ভট ব্যাপার হচ্ছে, কাঠের পাওয়ালা কোনও লোককে দেখলে বাবা একেবারে ভয়ে আত্মহারা হয়ে যেতেন। আগে আমরা এটা তাঁর বিশেষ বাতিক বলেই মনে করতুম। কিন্তু এখন তাঁর ভয়ের কারণ বুঝতে পেরেছি।

'উনিশশো উনপঞ্চাশ খ্রিস্টাব্দের কথা বলছি। একদিন হঠাৎ বাবার নামে একখানি চিঠি এল। সেই চিঠি পড়েই বাবা প্রায় অজ্ঞানের মতো হয়ে গেলেন। চিঠিতে কী লেখা ছিল তা আমরা কোনও দিনই জানতে পারিনি। এইটুকু খালি মনে আছে, চিঠিখানা খুব ছোটো, আর লেখকের হাতের লেখা প্রায় হিজিবিজির সামিল। পেনসন নেবার পর থেকেই বাবার স্বাস্থ্য বিশেষ ভালো যাচ্ছিল না, কিন্তু সেই চিঠি পাবার পর থেকেই তিনি দিনে দিনে যেন শুকিয়ে যেতে লাগলেন। ক্রমে তাঁর অবস্থা এমন সঙ্গীন হয়ে উঠল যে বড়ো বড়ো ডাক্তার এনে দেখাতে হল। কিন্তু কোনও ফলই ফলল না। অবশেষে ডাক্তাররা একেবারেই জবাব দিয়ে গেলেন।

'তাঁর শেষ দিনের কথা আমার মনে লেখা আছে আগুনের অক্ষরে। বাবার শয়নগৃহ ছিল একতলায় বাগানের ধারেই। একদিন আমাদের দুই ভাইকেই তিনি একসঙ্গে ডেকে পাঠালেন। তাঁর আদেশে আমরা ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলুম। তারপর তিনি যা বললেন তা হচ্ছে সংক্ষেপে এই :

'বাবা বললেন, 'শ্যামলাল, কামলাল, আমার সময় হয়ে এসেছে। আমি সুখেই মরতে পারতুম, কিন্তু এই অন্তিম মুহূর্তেও বিশেষ এক কারণে আমার অন্তরাত্মা অশান্ত হয়ে উঠেছে। দ্যাখো, নরেনবাবুর কন্যার প্রতি আমি সুবিচার করিনি।' বাবার কথার অর্থ আমরা কিছুই বুঝতে পারলুম না।

'আমরা হতভম্বের মতো তাঁর মুখের পানে তাকিয়ে আছি দেখে বাবা করুণ হাসি হেসে বললেন, 'গোড়ার ইতিহাস জানলে আমার কথা বুঝতে তোমাদের কোনওই কষ্ট হবে না। বহুকাল আগে আমরা এক গুপ্তধনের অধিকারী হয়েছিলুম। আর সেটা গচ্ছিত ছিল আমার কাছেই। নরেনবাবু আন্দামান থেকে ফিরেই আমার সঙ্গে দেখা করে নিজের অংশ দাবি করে বসলেন। গুপ্তধনের ভাগ বাঁটোয়ারা নিয়ে নরেনবাবুর সঙ্গে আমার বচসা হল। আমি বরাবরই জানতুম তাঁর হৃৎপিণ্ডের অবস্থা ভালো নয়। তর্ক করতে করতে হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে তিনি রেগে দাঁড়িয়ে উঠলেন, তার পরমুহূর্তেই দুই হাতে বুকের কাছটা চেপে ধরে জ্ঞান হারিয়ে মাটির উপরে পড়ে গেলেন, এবং পড়ে যেতে যেতে টেবিলের কোণে মাথা লেগে বিষম আঘাত পেলেন। আমি যখন তাঁর উপরে হেঁট হয়ে পড়লুম, তখন তিনি বেঁচে নেই, আর তাঁর কাটা মাথা দিয়ে হু হু করে রক্ত বেরুচ্ছে।

'বহুক্ষণ আমি আচ্ছন্নের মতো সেইখানে বসে রইলুম। ব্যাপারটা প্রকাশ হলে পুলিশ আসতে দেরি লাগবে না। আর পুলিশ এলে আমাকেই যে খুনি বলে গ্রেপ্তার হতে হবে,

সে-বিষয়েও কোনও সন্দেহ নেই। নিরুপায় হয়ে তখন আমি যা করলুম, তার জন্যে তোমরা আমাকে দোষ দিয়ো না।

'বাগানের ভিতরেই এককোণে আমি নরেনের দেহকে সমাধিস্থ করতে বাধ্য হলুম। তারপরে গুপ্তধনের সিন্দুকটা তাড়াতাড়ি লুকিয়ে ফেললুম। কিন্তু তারপরে আমার যা করা উচিত ছিল, আমি তা করিনি। নরেনবাবুর অংশটা আমি তাঁর কন্যার হাতেই সমর্পণ করতে পারতুম, কিন্তু কতকটা লোভের বশবর্তী হয়ে আর কতকটা লোকজানাজানির ভয়ে আমি সে কর্তব্যও পালন করতে পারিনি। আশা করি এইবারে তোমরা আমার বক্তব্য বুঝতে পারছ?'

'এই সময়ে কামলাল জিজ্ঞাসা করলে, 'সেই গুপ্তধনের সিন্দুকটা আপনি কোথায় রেখেছেন?'

'বাবা বললেন, 'সে কথাও তোমাদের কাছে চুপিচুপি বলে রাখছি। তোমরা আরও কাছে এগিয়ে এসো—'

'ঠিক সেই মুহূর্তে বিষম আতঙ্কে বাবার মুখ একেবারে রক্তশূন্য হয়ে গেল। বিদ্যুতাহতের মতন তিনি বিছানার উপর সোজা হয়ে উঠে বসলেন এবং জানলার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বিকটস্বরে বলে উঠলেন, 'ওকে তাড়িয়ে দাও, ওকে তাড়িয়ে দাও, ওকে তাড়িয়ে দাও!'

'আমরা সচমকে ফিরে দেখি, বাগানের দিককার একটা জানলার শার্সির ওপাশে দেখা যাচ্ছে একখানা বীভৎস মুখ। তার মাথায় ঝাঁকড়া চুল, মুখে রাশিকৃত দাড়ি এবং দুটো দীপ্ত চক্ষুর ভিতর দিয়ে ফুটে বেরুচ্ছে বন্য হিংসার ভয়াবহ ভাব।

'আমি আর কামলাল দুজনেই দৌড়ে জানলার কাছে গেলুম, কিন্তু মুখখানা সাঁৎ করে সরে গেল অপচ্ছায়ার মতো। তারপর বিছানার কাছে ফিরে এসে দেখলুম, বাবার দেহে আর প্রাণের অস্তিত্ব নেই।

'বাগানের ভিতরে ও বাহিরে অনেক খোঁজাখুঁজির পরও কোনও শত্রুকে আবিষ্কার করা গেল না। কিন্তু সেই অজ্ঞাত শত্রুর শনির দৃষ্টি তখনও যে আমাদের মুক্তি দেয়নি, পরের দিন সকালেই তার জ্বলন্ত প্রমাণ পাওয়া গেল।

'আমরা সকলেই যখন সেই রাত্রে শোকে মুহ্যমান, সেই ফাঁকে সেই অদৃশ্য শত্রু আমাদের বাড়ির ভিতরেও প্রবেশ করেছিল। কারণ আমি বাবার শয়নগৃহে ঢুকে দেখলুম, ঘরের সমস্ত জিনিস তছনছ হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে। কেউ যেন সমস্ত বাক্স ড্রয়ার আর আলমারি খুলে তন্ন তন্ন করে কী খুঁজে দেখেছে। টেবিলের উপরে কাগজ চাপার তলায় পাওয়া গেল একখানা কাগজ, তার উপরে চারটে ঢ্যারা চিহ্নের তলায় লেখা রয়েছে,—'চতুর্ভুজের স্বাক্ষর।' এই অদ্ভুত কথাগুলোর অর্থ আজ পর্যন্ত আমি বুঝে উঠতে পারিনি।'

শ্যামলাল কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। তারপর আবার ধীরে ধীরে বলতে লাগল, 'গুপ্তধনের কাহিনি শুনে আমাদের দুজনেরই মন যে কৌতূহলে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিল, তা

না বললেও চলে। কিন্তু হপ্তার পর হপ্তা, মাসের পর মাস ধরে চেষ্টা আর অন্বেষণ করেও আমরা সেই রত্নসিন্দুক আবিষ্কার করতে পারিনি। কেবল বাবার মৃত্যুর পর তাঁর মাথার বালিশের তলায় পেয়েছিলুম একগাছা আশ্চর্য মুক্তার মালা। তেমন বড়ো বড়ো আর দামি মুক্তা জীবনে কখনও চোখে দেখিনি। মুক্তাগুলি যে অনেক কালের পুরোনো, সে-বিষয়েও কোনও সন্দেহ নেই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস হল, সেই রত্নসিন্দুক থেকেই এসেছে এই মুক্তার মালা, আর বাবা তা মাথার বালিশের তলায় রেখেছিলেন চিত্রাদেবীর জন্যেই। আমার এ বিশ্বাস সত্য কি মিথ্যা জানি না, কিন্তু আমি স্থির করলুম, বাবার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্যে, এই মালা থেকে একেকটি মুক্তা নিয়ে বছরে বছরে চিত্রাদেবীকে উপহার দেব। একেবারে সমস্ত মুক্তার মালাগাছা পাঠিয়ে দিতে আমাদের ভরসা হল না, কী জানি এই ব্যাপার নিয়ে যদি কোনও নতুন হাঙ্গামা হয়। এটুকু বদান্যতা প্রকাশ করতে আমার কোনওই আপত্তি হল না কারণ গুপ্তধন না পেলেও আমাদের কোনওই অর্থের অভাব ছিল না।

'কিন্তু কামলালের মত ছিল অন্যরকম। আর সেই মতবিরোধের ফলেই আমি পৈতৃক বাড়ি ছেড়ে এখানে এসে নতুন বাসা বেঁধেছি।'

ভারত বললে, 'আপনি যথার্থ ভদ্রলোকের মতোই কাজ করেছেন। কিন্তু আজ হঠাৎ আপনি কেন আমাদের এখানে ডেকে পাঠিয়েছেন, এইবারে অনুগ্রহ করে সেই কথাই বলুন।'

শ্যামলাল বললে, 'সম্প্রতি বাবার রত্ন সিন্দুকটা আবিষ্কৃত হয়েছে। কামলাল হচ্ছে অতিশয় চালাক ছেলে, বারবার তার সন্ধান ব্যর্থ হলেও, সে হতাশ হয়ে হাল ছাড়েনি। তারপর সে আবিষ্কার করে ফেলেছে—বাবার শয়নগৃহে টঙে আছে উপর-উপরি দুটো ছাদ। প্রথম ও দ্বিতীয় ছাদের মাঝখানে আছে তিন হাত ফাঁক। বাহির থেকে দেখলে এই রহস্যটা আবিষ্কার করা যায় না, কিন্তু কামলাল রীতিমতো মাথা খাটিয়ে এই গুপ্ত ব্যাপারটা ধরে ফেলেছে। সেই দুটো ছাদের ভিতরেই লুকানো ছিল গুপ্তধনের সিন্দুক। এই খবরটা জানাবার জন্যেই চিত্রাদেবীকে এখানে আসবার জন্যে আমন্ত্রণ করেছি।'

ভারত বললে, 'আপনার সাধুতা দেখে শ্রদ্ধা হয়, কিন্তু এরপর আপনি কী করতে চান?'

শ্যামলাল বললে, 'এরপর আমরা সকলে মিলে একজোট হয়ে কামলালভায়ার সঙ্গে দেখা করতে চাই। নিজেকে আমি চিত্রাদেবীর সম্পত্তির অছি বলেই মনে করি। যতদিন না তাঁর প্রাপ্য অংশ তাঁকে ফিরিয়ে দিতে পারি ততদিন আমার শান্তি নেই। কিন্তু কামলাল মন্দ লোক না হলেও প্রথমটা হয়তো আমার মত সমর্থন করবে না। সেইজন্যেই চিত্রাদেবীর সঙ্গে আপনাদেরও দরকার হয়েছে। আপনারাও আমার পক্ষ অবলম্বন করলে অনিচ্ছা থাকলেও শেষ পর্যন্ত কামলাল আপত্তি করতে পারবে না।'

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, গুপ্তধনের পরিমাণ কত, সে সম্বন্ধে আপনি কিছু শুনেছেন?'

—'আন্দাজ দুই কোটি টাকার কম হবে না।'

সম্পত্তির পরিমাণ শুনে আমার মাথা রীতিমতো ঘুরতে লাগল। এরই এক তৃতীয়াংশ যদি চিত্রার অংশ বলে গণ্য হয়, তাহলে বৈষয়িক দিক দিয়ে আমাদের মতন লোককে নগণ্য

বলেই মনে করতে হবে। চিত্রার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলুম, তার মুখ একেবারে ভাবহীন, তার দেহ মাটির মূর্তির মতো স্থির।

ভারতের কোনও ভাবান্তর হল না। সে উঠে দাঁড়িয়ে সহজ কণ্ঠেই বললে, 'শ্যামলালবাবু, এখন যদি আমাদের কামলালবাবুর বাড়িতে যেতে হয়, তাহলে আর দেরি করবার দরকার নেই। কারণ ক্রমেই রাত বেড়ে উঠছে।'

শ্যামলালও আসন ত্যাগ করে দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, 'হ্যাঁ, আর দেরি করা উচিত নয়। সঙ্গে নারী, ওঁর কষ্ট হতে পারে। আমার গাড়ি নীচেই প্রস্তুত আছে।'

আমাদের নিয়ে মোটর আবার ছুটল দক্ষিণ দিকে, পরে পরে পার হয়ে গেলুম উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ কলিকাতার বালিগঞ্জ পর্যন্ত। বিদ্যুতালোকের সমারোহ আর তরঙ্গায়িত জনস্রোতের কোলাহল আর নেই। বেড়ে উঠতে লাগল আবছায়া, কমে আসতে লাগল ইষ্টক স্তূপের কঠোরতা এবং পাওয়া যেতে লাগল একটু একটু করে বন্য প্রকৃতির ইঙ্গিত। নির্জন ও নিরালা টালিগঞ্জের প্রায় শেষপ্রান্তে এসে আমাদের গাড়িখানা হঠাৎ থেমে দাঁড়িয়ে পড়ল।

জানলা থেকে বাইরের দিকে মুখ বাড়িয়ে শ্যামলাল বললে, 'এই হচ্ছে বাবার সাধের 'সাগরস্মৃতি'। এই জঙ্গলের মাঝখানে 'সাগরস্মৃতি' নামটা কষ্টকল্পনা বটে, কিন্তু বাবা বোধ করি এইখানে বসে-বসেই প্রাণের কানে শুনতে পেতেন, সুদূর আন্দামানের বালুকা শয্যার উপরে এসে ঝাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে অনন্ত নীলসাগরের ফেনিল তরঙ্গোচ্ছ্বাস! আসুন, নেমে পড়ি।'

॥ পঞ্চম ॥

সাগর স্মৃতির বিভীষিকা

আজকের অ্যাডভেঞ্চারের প্রায় শেষের দিকে যখন এসে পৌঁছলুম, রাত এগারোটা বাজতে তখন আর বেশি দেরি নেই।

সামনেই বেশ উঁচু খাড়া পাঁচিল দাঁড়িয়ে আছে, চাঁদের আলোয় তার মাথায় চকচক করছে ভাঙা কাচের টুকরো। পাঁচিলের মাঝখানে একটা বন্ধ ফটক।

শ্যামলাল এগিয়ে গিয়ে নিজের হাতের লাঠি দিয়ে ফটকের উপরে ঠকঠক করে কয়েকবার আঘাত করলে।

ফটকের ওপার থেকে বাজখাঁই গলায় আওয়াজ এল, 'কে গোলমাল করে?'

শ্যামলাল বললে, 'আমি, সুন্দর সিং! আমার গলা চিনতে পারছ তো!'

কে একজন বকবক করে বকতে বকতে ফটকের একখানা পাল্লা টেনে খুলে ফেললে সশব্দে। বাইরে এসে দাঁড়াল একটা মূর্তি। দস্তুরমতো লম্বা-চওড়া জোয়ান ও চোয়াড়ে মূর্তি।

শ্যামলাল চুপিচুপি আমাদের দিকে ফিরে বললে, 'সুন্দর সিং এখন হয়েছে দারোয়ান, আগে ছিল বাবার দেহরক্ষী।'

আমাদের সকলকার মুখের উপরে একবার সন্দেহজনক দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে সুন্দর সিং বললে, 'আপনি তো দেখছি বড়োবাবু। কিন্তু আপনার সঙ্গে ওঁরা কে? জানেন তো আপনি ছাড়া আর কারুর ভিতরে আসবার হুকুম নেই?'

শ্যামলাল বললে, 'হুকুম নেই? সে কী কথা, আমি তো কালই বলে গিয়েছিলুম আমার সঙ্গে অন্য লোকও আসতে পারে!'

সুন্দর সিং অবিচলিত কণ্ঠে বললে, 'ছোটোবাবু আজ সারাদিন নিজের ঘরের বাইরে আসেননি। তাঁকে গিয়ে আমি যদি বিরক্ত করি তাহলে তিনি রেগে খাপ্পা হয়ে উঠবেন। তবে আপনি অনায়াসেই ভিতরে যেতে পারেন। কিন্তু আপনার সঙ্গীদের ওইখানেই দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।'

বিপদে পড়ে শ্যামলাল বললে, 'সুন্দর সিং, তুমি অন্যায় কথা বলছ, অন্তত আমার কথায় তোমার বিশ্বাস করা উচিত। দেখছ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন একজন মহিলা, উনি কি এই রাত্রে পথের উপরে দাঁড়িয়ে থাকবেন?'

সুন্দর সিং কিন্তু অটল। মাথা ঝাঁকি দিয়ে বললে, 'ওসব আমি জানি না। আমাকে ক্ষমা করবেন। যাঁর মাইনে খাই তাঁর হুকুম আমাকে তামিল করতেই হবে। আপনাকে আমি চিনি, কিন্তু আপনার বন্ধুদের তো চিনি না।'

এইবারে ভারত এগিয়ে ফটকের সামনে গিয়ে দাঁড়াল, তারপর মৃদু হাসতে হাসতে বললে, 'সুন্দর সিং, বোধ হয় এরই মধ্যে তুমি আমাকে ভুলে যাওনি? বছর দুই আগে গোবরবাবুর আখড়ায় তোমার সঙ্গে একদিন আমি শখ করে কুস্তি লড়েছিলুম, মনে আছে কি?'

সুন্দর সিং মুখ নামিয়ে তীক্ষ্ণ নেত্রে ভারতের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করে বললে, 'আপনাকে ভারতবাবু বলে মনে হচ্ছে যে! হ্যাঁ, তাই তো! আরে মশাই, আপনাকে কি আমি ভুলতে পারি? সেই 'দঙ্গলে' আপনি এক মিনিটের ভিতরেই আমাকে চিত করে দিয়েছিলেন! আসুন, আসুন, আপনাকে তো আমি চিনি!'

ভারত আমার ও চিত্রার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললে, 'আর এঁদের দুজনকে আমি চিনি। তুমি কি আমার কথায় নির্ভর করতে পারবে না?'

সুন্দর সিং হাসতে হাসতে বললে, 'নির্ভর না করে উপায় কী, ভারতবাবু? আমি বাধা দিলে আপনি তো জোর করেই ভিতরে ঢুকে পড়তে পারেন। তার চেয়ে ভালোয় ভালোয় পথ ছেড়ে দেওয়াই ভালো, আসুন আপনারা।'

বাগানের ভিতরে ইট দিয়ে বাঁধানো পথ, দিকে দিকে ফুলের চারার ঝোপঝোপ, ছোটোবড়ো ঝুপসি গাছের ভিড়, কোথাও হালকা আর কোথাও নিরেট অন্ধকারের লীলা এবং চারিদিকে বিরাজ করছে একটা রুপোলি নিরবচ্ছিন্ন নিস্তব্ধতা। যেখানে ফাঁকা সেইখানেই চাঁদের আলোর প্রলেপ। কিন্তু সে আলো মড়ার মতো পাণ্ডুর, দেখলে মনে প্রসন্নভাব জাগে না। এরই মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে আলোছায়া মাখা মস্তবড়ো একখানা বাড়ি, তারও কোথাও নেই জীবনের কোনও সাড়া বা চিহ্ন।

কেন জানি না, এইসব দেখতে দেখতে কেমন একটা অজানা উদ্বেগে আমার বুকের কাছটা ছাঁৎ ছাঁৎ করতে লাগল। সঙ্গীদের দিকে তাকালুম, তারাও নীরবে গম্ভীর মুখে পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছে, তারাও বোধ করি মনে মনে আমারই মতন উদ্বেগের ভাব অনুভব করছিল।

হঠাৎ শ্যামলাল নীরবতা ভঙ্গ করে বললে, 'ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না। কামলালকে আমি ভালো করেই জানিয়ে দিয়েছিলুম যে, আজ রাত্রে আমরা নিশ্চয়ই এখানে আসব। অথচ দেখছি বাড়ির কোথাও একটা আলো পর্যন্ত জ্বলছে না। সবাই যেন এর মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েছে।'

ভারত বললে, 'কামলালবাবু বাড়ির কোথায় থাকেন?'

শ্যামলাল উপর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললে, 'তেতলার ওই ঘরে। ওই যে, ঘরের একটা জানলার উপরে খানিকটা চাঁদের আলো এসে পড়ছে। কিন্তু ঘরের ভিতর থেকে কোনও আলো আসছে না।'

ভারত বললে, 'না। কিন্তু ওই ঘরের ঠিক পাশেই একটা জানলার ভিতর দিয়ে আমি একটুখানিক আলোর ফিনিক দেখতে পাচ্ছি।'

শ্যামলাল বললে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, ওটা হচ্ছে বুড়ি ক্ষান্তমণির ঘর, এ বাড়ির প্রধানা দাসী। ক্ষান্ত তাহলে জেগেই আছে। আচ্ছা, তার মুখ থেকেই সব খবর পাওয়া যাবে, আপনারা এইখানে একটু দাঁড়ান। আমি ভিতরে গিয়ে সব খবর নিয়ে আসি।' শ্যামলাল দুই পা অগ্রসর হয়েই থমকে আবার দাঁড়িয়ে পড়ে ত্রস্ত কণ্ঠে বললে, 'ও কী ও! শুনছেন?'

আমরাও শুনতে পেলুম। চিত্রা সচমকে আমার একখানা হাত সজোরে চেপে ধরলে, ভারতও উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগল।

সেই প্রকাণ্ড অট্টালিকার ভিতর থেকে বাইরের একান্ত নিস্তব্ধ আকাশ বাতাসের মাঝখানে ভেসে ভেসে আসছে অত্যন্ত করুণ আর্তনাদ—ভীত নারীর কণ্ঠনিঃসৃত তীক্ষ্ণ আর্তস্বর। রহস্যময় রাত্রির নিরালা পরিস্থিতির মধ্যে সেই বুকভাঙা ক্রন্দনধ্বনি কেমন অপার্থিব বলে মনে হতে লাগল।

শ্যামলাল বললে, 'ক্ষান্তমণি কাঁদছে! তার গলা আমি চিনি, কিন্তু ব্যাপার কী? আপনারা অপেক্ষা করুন, আমি এখনই ফিরে আসছি।' এই বলেই সে দ্রুতপদে বাড়ির ভিতরে চলে গেল—সিঁড়ির উপর থেকে শোনা গেল তার পায়ের শব্দ। একটু পরেই শুনতে পেলুম নারীকণ্ঠে এক আশ্বস্ত স্বর—'বড়োবাবু, বড়োবাবু? আঃ বাঁচলুম, তুমি এসেছ!' তারপরেই একটা দরজার শব্দ এবং কিছুক্ষণ আবার সব চুপচাপ।

আমরা তিনজনে সেইভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলুম। চিত্রা তখনও আমার হাত ছাড়লে না এবং আমি অনুভব করতে পারলুম তখনও তার দেহ থরথর করে কাঁপছে। আর সেই ভয়ের কম্পন কিন্তু আমার মনের মাঝে এনে দিলে কেমন এক মধুর ভাবের স্পন্দন। স্বীকার করতে বাধা নেই, আমার দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল—বলা বাহুল্য, আতঙ্কে নয়, অন্য কারণে!

ভারত কিন্তু চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চতুর্দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সঞ্চালন করতে লাগল, তারপর ধীরে ধীরে মৃদুস্বরে বললে, 'চেয়ে দ্যাখো। বাংলা দেশের সমস্ত উইপোকার দল একজোট হয়ে যেন এখানে এসে নিজেদের বাসা বেঁধে নিয়েছে। বাগানের জমির উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে যেন সারি সারি উইঢিবির পর উইঢিবি!'

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'ওগুলো কী হতে পারে?'

—'উইঢিবি নয়, মাটির ঢিবি। অর্থাৎ সারি সারি মাটির স্তূপ। শুনেছ তো, কামলাল আজ দীর্ঘ ছয় বৎসর ধরে এখানে গুপ্তধন আবিষ্কার করবার চেষ্টা করেছে? দিকে দিকে সে মাটি খুঁড়ে দেখেছে গুপ্তধনের সন্ধান পাওয়া যায় কি না!'

ঠিক সেই মুহূর্তে দুড়দাড় শব্দে চারিদিক কাঁপিয়ে, আমাদের কাছে ছুটে এসে শ্যামলাল সভয়ে বলে উঠল, 'ভয়ানক কাণ্ড, ভয়ানক কাণ্ড! কামলালের কী হয়েছে জানি না, কিন্তু ভয়ে আমার বুক শিউরে উঠছে!'

বাস্তবিক শ্যামলালের চোখ দুটো যেন মুখের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছিল এবং থরথর করে কাঁপছিল তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত সর্বাঙ্গ।

তৎক্ষণাৎ সজাগ হয়ে ভারত আমার দিকে ফিরে বললে, 'চল, আমরাও বাড়ির ভিতরে যাই।'

শ্যামলাল মাটির উপরে উবু হয়ে বসে পড়ে বললে, 'তাই যান, তাই যান! আমি কিন্তু আপনাদের সঙ্গে আর সেখানে যেতে পারব না!'

শ্যামলালকে হাত ধরে টেনে তুলে ভারত বললে, 'শান্ত হোন, আমাদের সঙ্গে চলুন।'

বাড়ির ভিতরে ঢুকে সামনেই দেখতে পেলুম দোতলায় উঠবার সোপানশ্রেণি। সিঁড়ির রেলিং এবং প্রত্যেক ধাপের উপরে বাঁ হাতে টর্চের আলো ফেলে এবং ডান হাতে একখানা আতশিকাচ ধরে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সব পরীক্ষা করতে করতে ভারত উপরের দালানে গিয়ে উঠল।

সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল এক বৃদ্ধা স্ত্রীলোক, বয়সের ভারে তার মাথা ও কাঁধ সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। আন্দাজে ধরে নিলুম তারই নাম ক্ষান্তমণি।

সে ভয়স্তম্ভিত চক্ষে থেমে থেমে যেন হাঁপাতে-হাঁপাতেই বললে, 'সারাদিন আমি ছোটোবাবুর জন্যে খাবার নিয়ে বসেছিলুম। কিন্তু সকাল থেকে সারাদিনই তিনি আর ঘরের বাইরে এলেন না। তখন আমি দায়ে পড়ে দরজা ঠেলতে ঠেলতে তাঁকে ডাকতে লাগলুম, কিন্তু তবু তাঁর সাড়া পেলুম না। দরজার গায়ে, একটা ফুটো ছিল সেইখানে চোখ দিয়ে কী যে আমি দেখলুম, তা বুঝিয়ে বলতে পারব না। এখনও ভাবতে গেলে গা শিউরে ওঠে, ছোটোবাবুর জন্ম থেকেই তাঁকে দেখে আসছি, কিন্তু তাঁর এরকম চোখ-মুখ আর-কখনও দেখিনি গো, আর-কখনও দেখিনি—বাপ রে!' বুড়ি কম্পমান হাত তুলে ইঙ্গিতে সামনের একটা দরজা দেখিয়ে দিলে।

শ্যামলাল পাথরের মূর্তির মতো নির্বাক ও স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। চিত্রা ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে সিঁড়ির রেলিংটা দুই হাতে চেপে ধরলে।

ভারত এগিয়ে গেল দরজার সামনে। ফুটোটা খুঁজে নিতে তার দেরি লাগল না। হেঁট

হয়ে ছিদ্রপথে চোখ চালিয়ে সে কী দেখলে জানি না, কিন্তু হঠাৎ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সশব্দে একটা নিশ্বাস ফেললে।

আমি শুধোলুম, 'ব্যাপার কী ভারত?'

—'এর মধ্যে কোনও শয়তানি আছে, তুমিও একবার দেখবার চেষ্টা করো।'

আমিও হেঁট হয়ে দৃষ্টি সংলগ্ন করলুম ছিদ্রপথে। কিন্তু সে কী দেখলুম! সত্য, না দুঃস্বপ্ন?

উপরে অন্ধকার, নীচে অন্ধকার এবং তারই মাঝখান দিয়ে চলে এসেছে চাঁদের আলোর একটা দীর্ঘ রেখা। সেই আলোটুকুর মধ্যেই ঠিক যেন শূন্যে জেগে রয়েছে কী এক ভয়াবহ হাসিমাখা মুখ! আশ্চর্য, সে মুখ আর কারুর নয় আমাদেরই সঙ্গী শ্যামলালবাবুর!

আমি সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে উঠলুম সচমকে। এমন অসম্ভবও কি সম্ভবপর? তারপরেই ধাঁ করে মনে পড়ে গেল, শ্যামলাল আর কামলাল হচ্ছে যমজ ভাই। বললুম, 'এ যে রোমাঞ্চকর ব্যাপার। এখন আমাদের কী করা উচিত হবে?'

—'কী আবার, দরজাটা ভেঙে ফেলতে হবে।'

সে-দরজাটা সহজে ভাঙবার নয়। কিন্তু আমাদের দুজনের প্রাণপণ ধাক্কার পর ধাক্কায় দরজাটা দুম করে খুলে গেল অবশেষে। আমরা কামলালের ঘরের ভিতরে গিয়ে দাঁড়ালুম। আলো জ্বালবার পর বোঝা গেল, কামলাল ছিল শখের রাসায়নিক। কারণ ঘরের চারিদিকে দেওয়াল জোড়া শেলফের তাকে তাকে সাজানো রয়েছে রাসায়নিক পদার্থে ভরা ছোটো-বড়ো শিশি-বোতল। ঘরের মাঝখানে টেবিলের উপরেও রাসায়নিক পরীক্ষার নানান সরঞ্জাম। ঘরের এককোণে বেতে মোড়া বড়ো বড়ো কয়েকটা নীল রঙের বোতল। সেগুলোর মধ্যে একটা বোতল মাটির উপরে ভেঙে পড়ে আছে এবং তার ভিতর দিয়ে নির্গত হয়েছে খানিকটা কালো রঙের তরল পদার্থ; পদার্থটা কী জানি না, কিন্তু আলকাতরার মতো একটা ঝাঁঝালো গন্ধে বাতাস ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে। ঘরের আর এক পাশে দাঁড় করানো একখানা কাঠের মই। যেখানে মইখানা শেষ হয়েছে ঠিক সেইখানেই ছাদের প্রান্তে দেখা যাচ্ছে একটা চোরা দরজা। মইখানার নীচের দিকে মেঝের উপরে পড়ে রয়েছে একগাদা লম্বা দড়ির কুণ্ডলী।

টেবিলের সামনে চেয়ারের ধারে একখানা বড়ো আরামকেদারার উপরে উপবিষ্ট প্রাণহীন কামলালের মূর্তি। তার সেই অপার্থিব হাসিমাখা রক্তহীন মুখখানা ঝুলে পড়েছে কাঁধের উপরে। তারই পাশে পড়ে আছে অদ্ভুত একটা দণ্ড।

আমি ডাক্তার। নিজের হাতে বিস্তর মড়া কেটেছি আর ঘেঁটেছি, সুতরাং নানাভাববিশিষ্ট মৃতদেহ আমার কাছে সুপরিচিত। কিন্তু মৃত কামলালের মতো বীভৎস হাসিমাখা মুখ আর কখনও আমার চোখে পড়েনি। এই মৃত্যুস্থির ভয়াল হাসি যেন জল করে দেয় বুকের রক্ত!

টেবিলের উপর থেকে একখানা কাগজ তুলে নিয়ে অর্থপূর্ণ স্বরে ভারত বললে, 'দ্যাখো।'

একটুখানি লেখা। মুখ নামিয়ে শিউরে উঠে পাঠ করলুম—'চতুর্ভুজের স্বাক্ষর!' চেঁচিয়ে বলে উঠলুম, 'হায় ভগবান, এর মানে কী?'

—'এর মানে হচ্ছে হত্যাকাণ্ড।'

মৃতদেহের উপর অঙ্গুলি নির্দেশ করে সে আবার বললে, 'এইখানে দ্যাখো!'

কামলালের ঠিক কানের উপরে বিঁধে রয়েছে কী একটা জিনিস। ভালো করে দেখে বললুম, 'এটা কাঁটা বলেই তো মনে হচ্ছে।'

—'এটা কাঁটাই বটে। তুমি কাঁটাটা উপড়ে ফ্যালো দেখি। কিন্তু সাবধান, ওটা বিষাক্ত কাঁটা!'

একটু টানতেই কাঁটাটা খুব সহজে উঠে এল। চামড়ার উপরে জেগে রইল রক্তাক্ত আঁচড়ের মতো এমন একটা ছোটো ক্ষত, সহজে যা দৃষ্টি আকর্ষণ করে না।

হতভম্বের মতো আমি বললুম, 'কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। রহস্য ক্রমেই ঘনীভূত হয়ে উঠছে।'

ভারত মাথা নেড়ে বললে, 'ঠিক তার উলটো। আমার কাছে সমস্ত রহস্য একেবারে সাফ হয়ে গিয়েছে! আরও কিছু কিছু তথ্য সংগ্রহ করে ছিন্নসূত্র মাঝে মাঝে জুড়ে নিতে পারলেই সমস্ত মামলাটা জলের মতন সহজ হয়ে যাবে।'

শ্যামলালের কথা আমরা একেবারে ভুলেই গিয়েছিলুম। এতক্ষণ পরে হঠাৎ সে নিজের অস্তিত্ব প্রমাণিত করে চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'সর্বনাশ, রত্নসিন্দুকটা কোথায় গেল! খুনিরা নিশ্চয় সিন্দুক নিয়ে পালিয়ে গেছে। কাল সন্ধের পর কামলালের সঙ্গে আমি নিজে রত্ন সিন্দুকটা ওই চোরা দরজা দিয়ে নীচে নামিয়ে মেঝের উপরে এইখানে এনে রেখেছিলুম। আমি যখন চলে যাই কামলাল তখন ঘরের ভিতর থেকেই দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল।'

ভারত জিজ্ঞাসা করলে, 'ঘড়িতে তখন ক-টা বেজেছিল?'

—'ঠিক সাড়ে দশটা। হায় হায়, এখন কী হবে? কামলালকে কে খুন করে গেছে, ঘরের ভিতরে রত্নসিন্দুক নেই, এখনই পুলিশ এসে পড়বে, আর পুলিশ সন্দেহ করবে আমাকেই! নিশ্চয়ই, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহই নেই। কিন্তু মশায়, আপনারা অন্তত আমাকে খুনি বলে ভাবছেন না? আমি খুনি হলে নিশ্চয়ই আপনাদের যেচে এখানে ডেকে আনতুম না! কী বলেন, ডেকে আনতুম কি? হায়রে আমার কপাল, এখন কী করি, কোথা যাই, শেষটা পাগল হয়ে যাব না তো!' সে দুই হাতে নিজের মাথার চুলগুলো মুঠো করে ধরে টানাটানি করতে লাগল।

শ্যামলালের দুই কাঁধের উপরে দু-খানা হাত রেখে ভারত সান্ত্বনাভরা কণ্ঠে বললে, 'আমি বলছি, আপনার কোনওই ভয় নেই। এখন তাড়াতাড়ি পুলিশে খবর দেবার ব্যবস্থা করুন। পুলিশ না আসা পর্যন্ত আমরা এইখানেই অপেক্ষা করব।'

নাচারের মতো মাথা নাড়তে নাড়তে শ্যামলাল জড়িতপদে ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে গেল।

বলতে ভুলে গেছি, চিত্রাদেবীকে আর এই ঘরে আনা হয়নি। তিনি ক্ষান্তমণির কাছে আছেন।

॥ ষষ্ঠ ॥

শ্যামলালের দুর্ভাগ্য

ভারত যেন হঠাৎ জাগ্রত হয়ে উঠে বললে, 'এসো ভাস্কর, অতঃপর আমাদের হাতে থাকবে অন্তত আধঘণ্টা সময়। এর মধ্যেই এই সময়টার সদ্ব্যবহার করতে হবে। আগেই আমি বলেছি, আমার মামলাটা একরকম তৈরি হয়েই গিয়েছে। কিন্তু নিজের উপরে অতিরিক্ত বিশ্বাস থাকা ভালো নয়, কারণ এখনও সূত্রগুলো কতক কতক জায়গায় জট পাকিয়ে আছে। তবু মামলাটাকে সহজ বলে স্বীকার করতেই হবে।'

আমি সবিস্ময়ে বললুম, 'সহজ!'

—'নিশ্চয়ই! ঘরের মেঝেয় বেশি পায়ের ছাপ ফেলো না। ওইখানে চুপ করে বসে বসে আমার 'লেকচার' শোনো : প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে, আততায়ীরা কেমন করে এসেছে আর কেমন করেই বা গিয়েছে? মনে রাখতে হবে, কাল রাত সাড়ে দশটার পর থেকে এই ঘরের দরজাটা ভিতর থেকেই বন্ধ ছিল। আচ্ছা, ওই জানলাটা একবার দেখা যাক।' বাগানের দিকের একমাত্র জানলাটার কাছে গিয়ে সে যেন নিজের মনে-মনেই বলে যেতে লাগল—'জানলাটাও দেখছি ভিতর থেকেই বন্ধ আছে। উত্তম, এখন এটা খুলে দেখা যাক। কই, জানলার আশেপাশে কোনও জলের পাইপ কি এমনি কিছু নেই যা বেয়ে নীচে থেকে উপরে লোক উঠে আসতে পারে। কিন্তু তবু দেখছি জানলার বাইরে নীচের ফ্রেমের ওপাশে রয়েছে একটা পদচিহ্ন। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে এই শীতকালেও কাল রাত্রে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। বোঝা যাচ্ছে বৃষ্টির পরে কোনও লোক এইখানে এসে পদক্ষেপ করেছিল, ওই কাদার ছোপটাই তার প্রমাণ। ঘরের ভিতরেও দেখছি মেঝের এদিকে-ওদিকে আর টেবিলের কাছে রয়েছে কাদামাখা পায়ের চিহ্ন। হুঁ, চিহ্নটা আবার গোলাকার। ভাস্কর হে, এই চিহ্নটা কী বলো দেখি?'

আমি ভালো করে দেখে বললুম, 'এটা পায়ের দাগ নয়।'

—'কিন্তু এটা সাধারণ পায়ের দাগের চেয়েও বেশি চিত্তাকর্ষক। এটা কী জানো? কোনও একঠেঙো লোকের হাঁটুতে বাঁধা কাঠের খোঁটার দাগ! লক্ষ করে দ্যাখো, জুতোপরা প্রত্যেক পদচিহ্নের পাশে-পাশেই রয়েছে এইরকম একটা করে কাঠের খোঁটার দাগ।'

আমি বলে উঠলুম, 'শ্যামলালের বাবা এইরকম কাঠের খোঁটা পরা একঠেঙো লোক দেখলে ভয় পেতেন। এখানেও কি তাহলে সেইরকম কোনও লোকের আবির্ভাব হয়েছিল?'

—'নিশ্চয়ই তাই। কিন্তু তার সঙ্গে এসেছিল আর একটা লোকও। ভাস্কর, জানলার কাছে গিয়ে মুখ বাড়িয়ে একবার নীচেটা দেখে এসো, তারপরে বলো, তুমি কি দেওয়াল বেয়ে উপরে উঠতে পারো?'

জানলার কাছে গিয়ে বাইরে মুখ বাড়িয়ে দেখলুম। চাঁদের আলো তখনও জ্বলজ্বল করছে। নীচে থেকে আমরা প্রায় তিরিশ ফুট উপরে আছি। কিন্তু টিকটিকি কি মাকড়সা

প্রভৃতি ছাড়া মনুষ্যজাতীয় কোনও জীবই নীচে থেকে দেওয়াল বেয়ে কিছুতেই উপরে উঠে আসতে পারে না। দেওয়ালের গায়ে পা রাখবার কোনও জায়গাই নেই।

আমি বললুম, 'বাগান থেকে দেওয়াল বেয়ে উপরে আসা অসম্ভব।'

—'না, একেবারে অসম্ভব নয়, অন্য একটা উপায় অবলম্বন করলে সেটা সম্ভবপর হতে পারে। দেখছ, মইখানার তলায় পড়ে আছে একগাছা লম্বা মোটা দড়ি! দেওয়ালের গায়ে ওই মস্ত হুকের সঙ্গে ওই দড়িগাছা বেঁধে কেউ যদি জানলা গলিয়ে নীচে ঝুলিয়ে দেয় আর তুমি যদি বলবান হও, তবে একঠেঙো হলেও সেই দড়ি বেয়ে উপরে উঠে আসতে পারো। তারপরে সেই উপায়েই ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে যেতেও বেগ পেতে হবে না। তারপর তোমার সঙ্গী দড়িগাছা হুক থেকে খুলে, আবার জানলা বন্ধ করে অন্য কোনও উপায়ে ঘর ছেড়ে অদৃশ্য হতে পারবে।'

আমি বললুম, 'তোমার কথার রহস্য একটুও কমল না। তুমি আবার এক অদ্ভুত সঙ্গীর কথা তুলছ। কে সে? কেমন করে সে ঘরের ভিতরে এল?'

ভারত ঘাড় নাড়তে নাড়তে বললে, 'হ্যাঁ, আততায়ীর একজন সঙ্গীও ছিল। সেই সঙ্গীই এই সাধারণ মামলাটাকে করে তুলেছে রীতিমতো অসাধারণ।'

আমি আবার বললুম, 'কিন্তু কেমন করে সে ঘরের ভিতরে এল? সে দরজা দিয়ে আসেনি, জানলা দিয়েও আসেনি। তবে?'

—'কিন্তু সে যে ঘরের ভিতরে এসেছিল, এ বিষয়ে কোনওই সন্দেহ নেই। এখানে দেখতে হবে, প্রথম দৃষ্টিতে যা অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে, যে-কোনও উপায়ে নিশ্চয়ই তা সম্ভবপর হয়েছে।'

আমি বললুম, 'তবে কি তুমি বলতে চাও যে ছাদ ফুঁড়ে সে ঘরের ভিতরে এসে আবির্ভূত হয়েছে?'

—'নিশ্চয় বলতে চাই! হ্যাঁ, নিশ্চয়ই সে ছাদ থেকে নীচের দিকে এসেছে। বেশ, তুমি আমার সঙ্গে এদিকে এসো দেখি—এইবারে ওই চোরা দরজা দিয়ে উপরের ওই চোরা কুঠরির মধ্যে ঢুকে আমাদের গবেষণা কার্য আরম্ভ করা যাক।'

মই বেয়ে আমরা উপরে উঠে সেই চোবা কুঠরির ভিতরে গিয়ে দাঁড়ালুম। ঘরখানা লম্বায় পাঁচ ফুট আর চওড়ায় ছয় ফুটের বেশি হবে না। আসল ছাদের তলায় একটা হালকা নকল ছাদ বানিয়ে ঘরখানা তৈরি করা হয়েছে। কোথাও কোনও আসবাবপত্র নেই, মেঝের উপরে জমে রয়েছে আধ ইঞ্চি পুরু ধুলোর আস্তরণ।

ভারত উপরদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললে, 'দ্যাখো, বাইরেকার আসল ছাদের উপরে রয়েছে আর একটা চোরা দরজা। এখানে প্রথম যে ব্যক্তির আবির্ভাব হয়েছিল সে প্রবেশ করেছে ওই চোরা দরজার ভিতর দিয়েই। নিশ্চয়ই বাড়ির অন্য কোনও দিক থেকে জলের পাইপ বা আর কিছু অবলম্বন করে ছাদের উপরে উঠেছিল। এখন দেখা যাক, তার আর কোনও বিশেষত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় কি না।'

ভারতের সঙ্গে সঙ্গে আমিও ইতস্তত ইলেকট্রিক টর্চের আলো ফেলে চারিদিক পরীক্ষা

করছিলুম। আমার চোখে পড়ল কতকগুলো নগ্ন পদের ছাপ—কিন্তু সেগুলো সাধারণ মানুষের পদচিহ্নের চেয়ে ঢের ছোটো! বিস্মিত কণ্ঠে বললুম, 'ভারত, প্রথমে যে এখানে এসেছিল নিশ্চয়ই সে বালক!'

মুখের উপর রহস্যময় হাসি ফুটিয়ে তুলে ভারত বললে, 'সেজন্যে বিস্মিত হবার দরকার নেই। এ ঘরের কাজ আমাদের ফুরিয়েছে। চলো, এইবারে আবার নীচের ঘরে ফিরে যাই।'

নীচের ঘরে এসে পকেট থেকে একটা মাপের ফিতের চাকতি এবং আতশিকাচ বের করে ভারত মেঝের উপরে হুমড়ি খেয়ে বসে পড়ল। তারপর কখনও উঠে, কখনও বসে, আবার কখনও-বা হামাগুড়ি দিয়ে মাপতে মাপতে ও আতশিকাচের ভিতর দিয়ে দেখতে দেখতে সে ঘরময় চরকির মতো ঘুরে বেড়াতে লাগল! দেখে মনে হতে লাগল সে যেন মানুষের আকারে দস্তুরমতো একটা ব্যাকহাউন্ড, শিকারের গন্ধ পেয়ে দুনিয়ার আর সব কিছু কথা একেবারে ভুলে গিয়েছে।

তারপর হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়িয়ে সে সানন্দে বলে উঠল, 'ভাস্কর হে, আমাদের বরাত খুব ভালো! আর আমাদের বেশি বেগ পেতে হবে না। ঘরের মেঝেয় কী গড়াচ্ছে দেখতে পাচ্ছ তো! ক্রিয়োজোট! আমি যে প্রথম ব্যক্তির কথা বলেছি, নিজের দুর্ভাগ্যক্রমে সে ওই তরল ক্রিয়োজোটের উপরে পা দিয়ে ফেলেছে। এর গন্ধ কতটা উগ্র জানো তো? পৃথিবীর মাটির উপরে এই গন্ধ মাখাতে মাখাতে তাকে এখন বহুদূর পর্যন্ত যেতে হবে।'

আমি বললুম, 'তাতে আমাদের উপকার? সে তো দিব্যি লম্বা দিয়েছে।'

—'কিন্তু লম্বা দিয়েও সে পার পাবে না', বলেই কণ্ঠস্বর বদলে ভারত আবার বললে, 'ওই শোনো পায়ের শব্দ! নিশ্চয় শান্তিরক্ষকের দল এইবারে মহাসমারোহে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করবে। আসুক তারা, আমার কাজ ফুরিয়ে গিয়েছে।'

ঘরের বাইরে কতকগুলো ভারী ভারী পায়ের শব্দ শোনা গেল। তারপরেই ভিতরে প্রবেশ করলে প্রথমে একটি লম্বা চওড়া, হৃষ্টপুষ্ট পুলিশের উর্দি পরা মূর্তি; তারপরেই দেখলুম পোশাকপরা আর এক মূর্তিকে এবং তাদের পিছনে পিছনে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে হাজির হল আমাদের শ্যামলাল।

প্রথম মূর্তি ঘরে ঢুকেই বিরক্তিভরে বলে উঠল, 'আবার একটা খুনের মামলা ঘাড়ে চাপল! জ্বালাতন! আরে, এরা আবার কে বাবা? শ্যামলালবাবু, অকুস্থলে এমন জনতা কেন?'

মুখ টিপে একটুখানি হেসে ভারত বললে, 'আপনাকে যেন চিনি চিনি করছি! মনে হচ্ছে আপনি যেন ইনস্পেকটার গোবিন্দরাম গাঙ্গুলি। তাহলে আপনারও আমাকে চেনা উচিত!'

গোবিন্দরাম মুরুব্বির মতো মাথা নেড়ে বললে, 'তা আর চিনতে পারব না? আপনি তো হচ্ছেন ভারত চৌধুরি, স্বপ্ন দেখা আপনার পেশা। আমার বেশ মনে আছে, বড়োবাজারের সেই গয়না চুরির মামলায় সরকারি পুলিশের সামনে দাঁড়িয়ে আপনি খুব লম্বা একটা লেকচার ঝেড়েছিলেন।'

ভারত তেমনই হাস্যমুখে বললে, 'কিন্তু এটাও আপনার মনে আছে তো, আমার সে লেকচার ব্যর্থ হয়নি? চোর ধরা পড়েছিল তারই ফলে।'

—'ধেৎ, চোর ধরা পড়েছিল নিতান্ত দৈবগতিকে! কিন্তু দৈবের খেলা সব সময় জমে না, বুঝছেন ভারতবাবু? যাক সেকথা, আজকের ব্যাপারটা কী শুনি? খুনের খবর পেয়ে আমরা এখানে এসেছি। সামনে একটা লাশও পড়ে আছে দেখছি। তা লোকটা মারা পড়ল কেমন করে? আপনি কী অনুমান করেন?'

ভারত বিনীত ভাবে বললে, 'এমন সব খুনোখুনির মামলায় আমার অনুমানের মূল্য কী?'

গোবিন্দরাম বললে, 'না, না, আপনার অনুমানগুলো কাজে লাগুক আর না লাগুক শুনতে মন্দ লাগে না। মামলাটা বড়ো যা তা নয় বলেই মনে হচ্ছে। শুনছি ঘরের দরজাটা নাকি ভিতর থেকে বন্ধ ছিল। অথচ এখানেই হয়েছে খুন আর চুরি। খুনি চোর কি আকাশ থেকে খসে পড়ে আবার মিলিয়ে গেছে হাওয়ার সঙ্গে?'

—'হঠাৎ দেখলে তাই মনে হয় বটে।'

—'উঁহু, ও-কথার মানেই হয় না! আমিও একটা অনুমান করেছি, আর আমার অনুমানে বড়ো একটা ভুল হয় না।'

—'আপনি কী অনুমান করেছেন?'

—'পুলিশের কাজে মাথার চুল পাকিয়ে ফেললুম, আমার চোখে ধুলো দেওয়া কি সহজ কথা? আসল ব্যাপারটা আমি শুনেই ধরে ফেলেছি। ওহে সার্জেন্ট, শ্যামলালবাবুর সঙ্গে তুমি একবার ঘরের বাইরে যাও তো!'

সার্জেন্ট ও শ্যামলালের প্রস্থান। গোবিন্দরাম আমাদের আরও একটু কাছে এগিয়ে এসে গলা নামিয়ে বললে, 'শ্যামলাল নিজেই বলে, কাল রাত্রে সে নাকি তার ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। আমার কী অনুমান জানেন? তার ভাই হঠাৎ হার্ট ফেল করে মারা যায় আর রত্নসিন্দুক নিয়ে সে নিজেই এই ঘর থেকে সরে পড়ে। উপস্থিত ক্ষেত্রে এইটেই স্বাভাবিক নয় কি?'

—'খুবই স্বাভাবিক, তবে একটা কিন্তু আছে। শ্যামলাল চলে যাবার পর মৃত ব্যক্তি বোধহয় নিজেই উঠে ঘরের দরজা আবার ভিতর থেকে বন্ধ করে দিয়েছিল?'

গোবিন্দরাম সশব্দে নিশ্বাস ফেলে বললে, 'ও কিছু নয়, সামান্য একটু গোড়ায় গলদ মাত্র। মামলাটা ভালো করে তদন্ত করার পর ও গলদটুকু আমি শুধরে নিতে পারব। সম্পত্তি নিয়ে ঝগড়ার ফলেই এই ব্যাপারটা হয়েছে, শ্যামলাল কিছুতেই আর রক্ষা পাবে না।'

ভারত মৃতব্যক্তির ক্ষতস্থান থেকে পাওয়া সেই কাঁটাটা তুলে ধরে বললে, 'এটা কী দেখছেন?'

—'কোনও কাঁটাগাছের কাঁটা বলেই মনে হচ্ছে।'

—'হ্যাঁ, কোনও অজানা কাঁটাগাছ। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এ হচ্ছে বিষাক্ত কাঁটা। এটা বিঁধে

ছিল মৃতব্যক্তির মাথার উপরে। ক্ষতচিহ্নটাও দেখুন। ঘরের মেঝের উপরে পড়ে আছে একটা লম্বা দণ্ড, ভিতরটা তার ফাঁপা, আর টেবিলের উপরে দেখা যাচ্ছে একখানা কাগজ তার উপরে লেখা—'চতুর্ভুজের স্বাক্ষর'। এগুলো কি আপনার অনুমানের সঙ্গে খাপ খায়?'

—'খুব খায়, ভাইকে খুন করবে বলে শ্যামলালই ওই বিষাক্ত কাঁটাটা সঙ্গে নিয়ে এসেছিল, আর ওই কাগজখানার কথা বলছেন? ওটা হচ্ছে ফালতো কাগজ—আমাদের মাথা ঘুলিয়ে দেবার জন্যে শ্যামলালই ওখানা এখানে ফেলে রেখে গিয়েছে। কিন্তু কথা হচ্ছে, এই বন্ধ ঘর থেকে শ্যামলাল চম্পট দিলে কেমন করে? ওহো হো, বোঝা গেছে! ছাতের উপরে আছে একটা চোরা দরজাও! তাহলে তো আর কিছুই বলতে হবে না!'

তারপরেই সে চেঁচিয়ে ডাক দিলে—'সার্জেন্ট! শ্যামলালবাবুকে এখানে নিয়ে এসো।'

সার্জেন্ট ও শ্যামলালের পুনঃপ্রবেশ।

গোবিন্দরাম বললে, 'শ্যামলালবাবু, অতঃপর ভেবেচিন্তে কথা বলবেন, কারণ আপনার মুখের কথা আপনারই বিরুদ্ধে যেতে পারে। ভাইকে খুন করেছেন বলে আপনাকে আমি গ্রেপ্তার করছি।'

শ্যামলাল কাতর ভাবে ভারতের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'দেখলেন মশায়, যা ভেবেছি তাই!'

ভারত বললে, 'ভয় নেই শ্যামলালবাবু, আপনাকে আমি রক্ষা করব।'

বিরক্ত কণ্ঠে গোবিন্দরাম বললে, 'অঙ্গীকার করবেন না মশাই, শেষটা কথা রাখতে পারবেন না।'

ভারত বললে, 'গোবিন্দরামবাবু, আমি কেবল শ্যামলবাবুকে রক্ষাই করব না, খুনির সঙ্গে আপনাকেও পরিচিত করে দেব।'

গোবিন্দরাম ব্যঙ্গপূর্ণ স্বরে বললে, 'বটে, বটে, বটে?'

—'আমার যতদূর বিশ্বাস, খুনির নাম হচ্ছে সুজন, তার ডান পা হাঁটুর নীচে থেকে কাটা, তাই একটা কাঠের খোঁটা দিয়ে সে পায়ের অভাব নিবারণ করে। সেই কাঠের খোঁটার ভিতর দিকটা ক্ষয়ে গিয়েছে। তার বাঁ পায়ে আছে গোড়ালিতে লোহার নলি লাগানো জুতো, সে মাঝবয়সি লোক, মুখে লম্বা দাড়ি, মাথায় অন্তত সাড়ে পাঁচ ফুট লম্বা, জেল ফেরতা আসামি। এই তথ্যগুলো পরে আপনার কাজে লাগবে। তার সঙ্গে ছিল আর-একজন লোক—'

বাধা দিয়ে গোবিন্দরাম অবজ্ঞাভরে বললে, 'বটে, সঙ্গে আবার আর-একজন লোকও ছিল?'

তার দিকে আর ভ্রূক্ষেপমাত্র না করে পায়ে পায়ে দরজার দিকে এগুতে এগুতে ভারত বললে, 'হ্যাঁ, আর-একজন লোক ছিল বই কি! আমার আশা আছে, এই মানিকজোড়কে একসঙ্গে আপনার হাতে উপহার দিতে পারব। চলে এসো ভাস্কর।'

ভারতের সঙ্গে সঙ্গে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এলুম। বলা বাহুল্য, চিত্রাও এল আমাদের পিছনে পিছনে।

বাড়ির বাইরে এসে ভারত আমাকে বললে, 'ভাস্কর, রাত এখন অনেক, তুমি চিত্রাদেবীর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বাড়ি পর্যন্ত যাও। তাঁকে পৌঁছে দেবার পর তোমাকে আর একটা কাজ করতে হবে।'

—'কী কাজ বলো?'

—'দশ নম্বর মণিলাল বসু স্ট্রিটে আমার এক বন্ধু থাকে, তার নাম মোহিনী মল্লিক, ধনী ব্যক্তি। তার ভারী কুকুর পোষার শখ। মোহিনীর খুব ভালো একটা কুকুর আছে। আমার নাম করে সেই কুকুরটা তার কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে আসবে। এই নাও, আমার কার্ডের উপর দু-লাইন লিখেও দিলুম।'

আমি বললুম, 'কুকুরটা নিয়ে আমি কোথায় যাব? তোমার বাড়িতে তো?'

—'না, এইখানেই। তুমি না আসা পর্যন্ত এইখানেই আমি বেড়াতে বেড়াতে নৈশ বায়ু সেবন করব।'

॥ সপ্তম ॥

ক্রিয়োজোটের গন্ধ

সৌভাগ্যক্রমে চিত্রাকে তাদের বাড়িতে পৌঁছে দেবার জন্যে পুলিশের একখানা গাড়ি পেলুম। চিত্রাদের বাসার ঠিকানা হচ্ছে ভবানীপুরে। গাড়ি সেই দিকেই চলল।

আজকের ঘটনার পর ঘটনাগুলো ছিল আমার পক্ষেই অভাবিত ও বিস্ময়কর। চিত্রা তো হচ্ছে তরুণী নারী মাত্র, এমন সব ভয়াবহ ঘটনার আবর্তে সে আগে আর কখনও গিয়ে পড়েনি। এতক্ষণ সে আত্মসংবরণ করে অনেকটা স্তম্ভিতের মতো হয়েছিল, কিন্তু গাড়িতে উঠে তার সমস্ত আত্মসংযমের বাঁধ গেল একেবারে ভেঙে। আমার কাঁধের উপরে হেলে পড়ে সে বালিকার মতোই কাতর স্বরে কাঁদতে শুরু করে দিলে।

তার সেই পেলব তনুর তপ্ত স্পর্শ পেয়ে আমার সর্বাঙ্গের উপর দিয়ে বয়ে গেল একটা বৈদ্যুতিক শিহরন। জীবনে সুন্দরী তরুণী দেখেছি অনেক এবং অনেকের সঙ্গে আলাপ পরিচয়ও হয়েছে যথেষ্ট, কিন্তু এর আগে আর কোনও নবযৌবনা এমন একান্ত ও নিবিড় ভাবে আমাকে অবলম্বন করেনি। এমন বিচিত্র অভিজ্ঞতা আমার জীবনে এই প্রথম। আমি যেন মুহ্যমান হয়ে পড়লুম।

তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে চিত্রার একখানি হাত ধরে বললুম, 'শান্ত হও চিত্রা, এতটা কাতর হলে চলবে না।'

চিত্রা তাড়াতাড়ি গাড়ির কোণে সরে বসে যেন লজ্জা সঙ্কোচেই স্তব্ধ হয়ে রইল কিছুক্ষণ।

চলন্ত গাড়ির ভিতরে থেকে থেকে রাস্তার আলোগুলো এসে পড়ছিল এবং সেই আলোতে দেখা যাচ্ছিল চিত্রার গৌরবর্ণ কপালের উপরে মুক্তার মতো ঝকমকিয়ে উঠছে

অশ্রুবিন্দুগুলো। আমার ইচ্ছা হল, নিজের রুমাল বার করে তার অশ্রুভেজা মুখখানি মুছিয়ে দিই। কিন্তু সহসা এতটা স্বাধীনতা নেবার ভরসা হল না। তার অনেকদিন পরে চিত্রা আমার কাছে কবুল করেছিল যে, সেদিন রুমাল দিয়ে মুখ মুছিয়ে দিলে মনে মনে সে একটুও রাগ করত না। সে সময় তার মন চেয়েছিল বাহির থেকে একটুখানি সহানুভূতি।

গাড়ির ভিতরে একসঙ্গে বসে আছি আমরা দুটি প্রাণী, কিন্তু কারুর মুখে নেই একটিমাত্র কথা। বোধকরি সেদিন মৌখিক ভাষণের উপরে প্রাধান্য বিস্তার করেছিল আমাদের মানসিক আকর্ষণই। মুখ বন্ধ, কিন্তু মন খোলা। দুজনের সেই মুক্তহৃদয়ের দ্বার দিয়ে আনাগোনা করছিল যে মৌন বাণী, তা শুধু অনুভূতির বিষয়, ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

আমি কী ভাবছিলুম, আর চিত্রাই বা কী ভাবছিল তার ইতিহাস রাখা হয়নি। কতক্ষণ এইভাবে ছিলুম তাও জানি না, কিন্তু চিত্রা হঠাৎ সজাগ হয়ে বলে উঠল, 'আমাদের বাড়ির কাছে এসে পড়েছি।'

তার একটু পরেই একখানা বাড়ির সামনে এসে মোটর দাঁড় করানো হল।

মনে মনে ভাবলুম, চিত্রার বাড়িখানা আরও দূরে থাকলেই ছিল ভালো। এত তাড়াতাড়ি দুজনের একত্রে থাকার স্বপ্নভঙ্গ হল বলে আমার মন খুঁত খুঁত করতে লাগল। কিন্তু নামতেই হল, কারণ গাড়িখানা তখন দাঁড়িয়ে পড়েছে।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'তোমাদের বাড়িতে আর কে কে আছেন?'

—'কেবল আমার ছোটোপিসিমা, তাঁর নাম কমলাদেবী।'

আমি গাড়ি থেকে নেমে দু-চার বার সদর দরজার কড়া নাড়তেই একটি প্রৌঢ়া মহিলা এসে দরজা খুলে দিলেন।

চিত্রাকে গাড়ির ভিতর থেকে নামতে দেখে তিনি বলে উঠলেন, 'এতক্ষণ তুই কোথায় ছিলি মা, আমি যে ভেবে সারা হচ্ছিলুম।'

চিত্রা দরজার কাছে এসে বললে, 'সে অনেক কথা পিসিমা, পরে সব বলব অখন। ভাস্করবাবু, আপনি কি একবার বাড়ির ভিতরে আসবেন না?'

মন তো তাই-ই চায়,—কিন্তু উপায় নেই, উপায় নেই! একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমি বললুম, 'আজ না চিত্রাদেবী, আমার হাতে এখনও একটা বড়ো কাজ আছে।'

গাড়ি যখন মণিলাল বসু স্ট্রিটে গিয়ে উপস্থিত হল, রাত তখন প্রায় তিনটে বাজে। দশ নম্বর বাড়ি খুঁজে নিতে দেরি লাগল না, রেলিং ঘেরা জমির ভিতরে মস্ত একখানা বাড়ি। ফটক বন্ধ। বাড়ির কোথাও আলোকের বিন্দুমাত্র চিহ্নও নেই।

এ সময় কারুকে ডাকাডাকি করে জাগানো উচিত নয় বটে, কিন্তু আমি এসেছি জরুরি কাজে। বেশ কিছুক্ষণ গলাবাজি করবার পর জনৈক ক্রুদ্ধ দারোয়ানের সাড়া ও দেখা পাওয়া গেল। দুই হাতে তন্দ্রাজড়িত চক্ষু রগড়াতে রগড়াতে কাছে এসে রুক্ষস্বরে সে জানতে চাইলে, আমার কী দরকার?

তার হাতে ভারতের কার্ডখানা দিয়ে বললুম, 'এটা তোমার বাবুর কাছে দিয়ে এসো।'

প্রথমটা সে তো কিছুতেই আমার প্রস্তাবে রাজি হয় না, তারপর মিষ্ট কথা বলে ও বকশিশের লোভ দেখিয়ে কোনওক্রমে তাকে বাড়ির ভিতরে পাঠিয়ে দিলুম। মিনিট দশেক পরেই বাড়ির কর্তা বেরিয়ে এলেন, তাঁর সঙ্গে সঙ্গে শিকল বাঁধা একটা কুকুর। তিনি বললেন, 'এই শেষ রাতে? ভারতের এ কী খেয়াল? নতুন কোনও মামলা বুঝি?'

আমি মাথা নেড়ে জানালুম, হ্যাঁ।

মোহিনীবাবু বললেন, 'আমার ঝুমি হচ্ছে আশ্চর্য জীব। দোআঁশলা বটে, কিন্তু ব্লাকহাউন্ডও এর কাছে হার মানবে।'

ঝুমির দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলুম। নিতান্ত নির্লিপ্তের মতো একদিকে তাকিয়ে সে দাঁড়িয়েছিল, তাকে দেখতে খানিকটা স্প্যানিয়েল ও খানিকটা হাউন্ডের মতো। ঝুলো ঝুলো লটপটে কান, গায়ে বড়ো বড়ো লোম, লাঙ্গুলও বেশ লোমশ। কিন্তু তার চেহারা কোনওই বিশেষ শক্তির পরিচয় দেয় না।

মোহিনীবাবু হেসে বললেন, 'ঝুমির দিকে তাকিয়ে দেখছেন কী, ও হচ্ছে বর্ণচোরা, চোখে দেখে কিছুই বোঝবার জো নেই। কিন্তু ওর যা বাহাদুরি ভারত তা ভালো করেই জানে।'

ঝুমি বুঝতে পারলে, তাকে নিয়েই আমাদের আলোচনা হচ্ছে। সে দূর থেকেই নাক তুলে আমাদের আঘ্রাণ নেবার চেষ্টা করলে।

মোহিনীবাবু বললেন, 'আপনাকে দেখে ঝুমি লেজ নাড়ছে না, তার কারণ ও এখনও আপনাকে বন্ধু বলে মেনে নেয়নি। আপনি তাড়াতাড়ি যদি ওর বন্ধুত্ব চান তো মাঝে মাঝে ওকে ঘুষ দিতে হবে।'

আমি বললুম, 'এত রাত্রে ঝুমির উপযোগী ঘুষ কোথায় পাই?'

মোহিনীবাবু বললেন, 'ভবিষ্যৎ ভেবে ঘুষ আমিই সঙ্গে করে এনেছি। এই বিস্কুটের মোড়কটা নিন।'

তার মিনিট তিনেক পরেই কয়েক টুকরো বিস্কুট উপহার পেয়ে প্রবলবেগে লাঙ্গুল আন্দোলন করতে করতে ঝুমি আমার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে এমন ভাব দেখাতে লাগল, যেন সে আমার সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধুত্ববন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে।

'সাগর স্মৃতির' বাগানে ফিরে এসে প্রথমেই খবর পেলুম, শ্যামলালকে গ্রেপ্তার করে গোবিন্দরাম থানায় প্রত্যাগমন করেছে।

অত্যন্ত নির্বিকার মুখে ভারত দাঁড়িয়েছিল বাগানের ফটকের উপরে হেলান দিয়ে। তার সঙ্গে আগে থাকতেই ঝুমির ঘনিষ্ঠতা ছিল, তাই ভারতকে দেখেই সে দুই কান খাড়া করে ঘন ঘন লেজ নাড়তে শুরু করে দিলে।

ভারত বললে, 'কী রে ঝুমি, চিনতে পেরেছিস যে! বেশ, বেশ, আজ আমাদের পথ দেখাতে হবে তোকেই।' তারপর আমার দিকে ফিরে বললে, 'ভাস্কর, যে-ঘরে কামলাল খুন হয়েছে, ঝুমিকে নিয়ে তুমি তার তলায় গিয়ে দাঁড়াও। একটু পরেই আবার আমার দেখা পাবে।' বলতে বলতে সে দ্রুতপদে বাড়ির ভিতরে পুনঃপ্রবেশ করলে।

চাঁদ কখন অস্ত গিয়েছে, কিন্তু আকাশে জেগে উঠেছে অল্প আলোর আভাস। পাখির ঘুম এখনও ভাঙেনি বটে, কিন্তু ভোর হতে বোধহয় আর দেরি নেই। আবছায়ার মধ্যে পদসঞ্চালন করে আমি ধীরে ধীরে অগ্রসর হলুম, তারপর ভারতের নির্দেশ অনুসারে যথাস্থানে গিয়ে দাঁড়িয়ে তার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলুম।

একে একে কেটে গেল প্রায় মিনিট পনেরো। একটা উঁচু গাছের উপর থেকে পাখিদের ডানা ঝাড়া দেওয়ার শব্দ শোনা গেল। বুঝলুম এইবারে তারা প্রভাতি কণ্ঠসাধনার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে।

হঠাৎ একটু তফাতেই একটা ভারী দেহপতনের শব্দ হল। চমকে ফিরে দেখি, আবছায়ার ভিতর দিয়ে আরও ঘন ছায়ার মতো একটা মূর্তি হনহন করে আমার দিকে এগিয়ে আসছে।

বিস্মিত কণ্ঠে বললুম, 'কে, কে তুমি?'

পরিচিত কণ্ঠে শুনলুম, 'মাভৈঃ, আমি তোমার বন্ধু ভারত। আপাতত শূন্য থেকে হল আমার সদ্যপতন!'

—'ব্যাপার কী হে?'

—'মোটেই রোমাঞ্চকর নয়। বাড়ির টঙে চোরাকুঠরির মধ্যে তথাকথিত বালকের পায়ের দাগগুলো যেখানে গিয়ে শেষ হয়েছে, সেইখানকার জানলা দিয়ে খুব সম্ভব তারই মতন একটা জলের নল বেয়ে উপর থেকে আমি নীচে নেমে এসেছি। এখানে ঘাসের উপরে কারও পায়ের দাগ দেখা যাচ্ছে না বটে, কিন্তু সে যে এখানকার খুব কাছাকাছি কোনও জায়গা দিয়েই মাটি মাড়িয়ে প্রস্থান করেছে, সে বিষয়ে আমার কোনওই সন্দেহ নেই। কারণ ভূতলে অবতীর্ণ হয়েই এখান থেকে আমি এই জিনিসটা আবিষ্কার করেছি। দ্যাখো।'

টর্চের আলো ফেলে দেখলুম, জামার বুকপকেটের মতো ছোটো একটি ব্যাগ। সেটা তৈরি কোনও রঙিন তৃণ দিয়ে। ভারতের নানা প্রদেশে বিভিন্ন মেলায় গিয়ে আদিবাসীদের হাতে তৈরি এইরকম ছোটো ছোটো ব্যাগ আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছে। সেই ব্যাগটার ভিতরে অঙ্গুলিচালনা করতেই ভারত ত্রস্ত কণ্ঠে বলে উঠল, 'সাবধান, সাবধান!'

—'সাবধান হব কেন ভারত?'

—'ওই ব্যাগের ভিতরে আছে গোটা ছয়েক কাঁটা। ওই রকমই একটা কণ্টকে বিদ্ধ হয়ে কামলালকে মৃত্যুমুখে পড়তে হয়েছে! এ কাঁটাগুলোও নিশ্চয়ই বিষাক্ত, খুনি যখন মাটির কাছ বরাবর এসে লাফিয়ে পড়েছিল, ব্যাগটা তখনই তার পকেট থেকে পড়ে গিয়েছে বলেই মনে হচ্ছে। ঝুমি, আমার দিকে একটু এগিয়ে আয় তো দেখি।' ভারত একখানা রুমাল নিয়ে ঝুমির নাকের কাছে ধরলে।

—'ও আবার কী?'

—'মনে আছে, ঘটনাস্থলে ক্রিয়োজোটের ভাঙা বোতলের কথা? ঘরময় গড়াচ্ছিল তার ধারা, আর তার মধ্যে পা পড়ে গিয়েছিল খুনির? আমিও এই রুমালে মাখিয়ে নিয়ে এসেছি খানিকটা ক্রিয়োজোট। আর তারই গন্ধের সঙ্গে ঝুমিকে এখন পরিচিত করতে চাই।'

ক্রিয়োজোটের গন্ধ পেয়েও ঝুমি প্রথমটা নিজের কর্তব্য স্থির করতে পারলে না।

বোকার মতো বারবার আমাদের মুখের পানে তাকাতে লাগল। তার ভাবটা যেন, খামোকা আমাকে একটা বাজে দুর্গন্ধ শোঁকাচ্ছ কেন বাপু?

ঝুমির বগলস্ ধরে টেনে এদিকে-ওদিকে পদচারণা করে ভারত বললে, 'মাটির উপর শুঁকে দেখ ঝুমি, মাটির উপরে শুঁকে দেখ! কোনও গন্ধটন্ধ পাচ্ছিস কি?'

এইবার ঝুমি কথা বুঝলে ও রাখলে। মাটির উপরে শুঁকতে শুঁকতে হঠাৎ তার লেজ ও কানদুটো খাড়া হয়ে উঠল এবং সে ঘেউ ঘেউ রবে চিৎকার করতে লাগল। সারমেয়ভাষায় বিশেষজ্ঞ না হলেও আমি বুঝতে পারলুম যে, ঝুমি মাটির উপরে ক্রিয়োজোটের গন্ধ আবিষ্কার করে ফেলেছে। আমার হাতের শিকলে প্রচণ্ড টান মেরে একদিকে সে অগ্রসর হতে চাইলে।

ভারত বললে, 'ঝুমির সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হও ভাস্কর, এইবারে আমাদেরও যেতে হবে ওর পিছনে পিছনে। আমার মুখে প্রাচীন পদচিহ্নকাহিনি তুমি অনেক বার শুনেছ তো? অতঃপর দেখতে হবে, এই বৈজ্ঞানিক যন্ত্রযুগেও সেই আদিম কালের পদচিহ্নের সূত্র আমাদের কতখানি এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে! অতএব 'আগে চল, আগে চল', ঝুমি!'

তখন ভোরের পাখিদের মিষ্ট গানের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়েছে কাকেদের কর্কশ চিৎকার। পৃথিবীর উপর থেকে সরে গিয়েছে অন্ধকারের পর্দা এবং নীলাকাশের উপর দিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে সূর্যকরধারার প্রথম ঢেউ।

বাগানের রেলিং এর কাছ পর্যন্ত গিয়ে ঝুমি আবার থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। খুনি নিশ্চয়ই এইখান দিয়ে রেলিং পার হয়ে গিয়েছে! ঝুমিকে আমরা দুজনে মিলে রেলিংয়ের ওপারে নামিয়ে দিলুম, তারপরে আবার আরম্ভ হল আমাদের অভিযান।

সাফল্য সম্বন্ধে আমার বিশ্বাস তখনও পর্যন্ত খুব দৃঢ় ছিল না। হত্যাকাণ্ডটা ঘটেছে প্রায় আটাশ ঘণ্টা আগে। কলকাতার রাজপথ দিয়ে চলাচল করে বৃহতী জনতা এবং অসংখ্য যানবাহন। এর মধ্যে কি হত্যাকারীর পায়ের গন্ধ এতক্ষণ ধরে বর্তমান থাকতে পারে? আমার সন্দেহের কথা ভারতের কাছে খুলে বললুম।

সে বললে, 'সাধারণ গন্ধ হলে এতক্ষণ তার অস্তিত্ব থাকত বলে মনে হয় না। তবে ক্রিয়োজোটের গন্ধ হচ্ছে অতিশয় উগ্র। মানুষের নাক বোধ হয় সে গন্ধও এখন ধরতে পারবে না, কিন্তু একে পশুদের ঘ্রাণশক্তি মানুষের চেয়ে ঢের বেশি, তার উপরে ঝুমি হচ্ছে, এ বিষয়ে বিশেষ ভাবে শিক্ষিত কুকুর। আমি জানি তার ক্ষমতা হচ্ছে বিস্ময়কর। ওই দ্যাখো না, মাটির উপরে নাক রেখে সে কত সহজে হন হন করে এগিয়ে যাচ্ছে! সে দৌড়ে যাবার চেষ্টা করছে, কেবল শিকলে বাঁধা আছে বলেই পারছে না।'

আমি এগুতে এগুতে বললুম, 'ঝুমিই তাহলে, এখন আমাদের একমাত্র ভরসা?'

—'মোটেই নয়। কেবল খুনি ক্রিয়োজোটের উপরে পা দিয়ে ফেলেছে বলেই আমাদের সুবিধা হয়েছে একটু বেশি। কার্যোদ্ধার করবার অন্য উপায়ও আমার হাতে আছে।'

—'খানিক আগে তোমার কথা শুনে আমি রীতিমতো অবাক হয়ে গিয়েছিলুম। সেই একঠেঙে লোকটার এমন হুবহু বর্ণনা তুমি কেমন করে দিলে?'

—'খুব সহজেই। গোড়া থেকে সব ব্যাপারটা একবার ভেবে দ্যাখো। একটু মাথা খাটালেই দেখবে সবই জলের মতো সোজা হয়ে গিয়েছে। নরেনবাবু আর রামচন্দ্র সিংহ দুজনেই ছিলেন আন্দামানের কয়েদি উপনিবেশের পদস্থ কর্মচারী। সেই ম্যাপখানা দেখে বেশ বোঝা যায়, তাঁরা কোনও গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছিলেন। স্মরণ আছে তো, সেই ম্যাপ বা নকশাখানার ভিতরেই আমরা চারজন লোকের নাম পেয়েছিলুম? গোড়াতেই ছিল সুজন সাহুর নাম। আন্দাজ করতে পারি হাতের লেখাটাও সুজন সাহুর। নরেনবাবু বাঙালি, রামচন্দ্র সিংহ বিহারি হলেও বাংলার সঙ্গেই তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। আর উপাধি দেখে মনে হচ্ছে সুজন সাহুও বিহার দেশের লোক, বাংলা ভালো লিখতে না পারলেও বাংলা ভাষাটা সে ভাসা ভাসা জানে। বাকি তিনটে নামই হচ্ছে একেবারে মুসলমানি; সুতরাং 'চতুর্ভুজের স্বাক্ষর' এ রকম কথা ব্যবহার করতে পারে সুজন সাহুর মতো কোনও হিন্দুই। ঘটনাস্থলেও আর একখানা কাগজে এই 'চতুর্ভুজের স্বাক্ষর' কথাগুলো আমরা পেয়েছি। আর সেখানেও দেখা গেছে যে ওই সুজন সাহুকেই, এ বিষয়ে আমার মনে কোনও সন্দেহই নেই। সুতরাং এই কাগজখানা বহন করছে তারই কীর্তি। চিত্রাদেবীর হাতে ওই কাগজখানা প্রথম দেখেই আমি অনুমান করেছিলুম, তার সঙ্গে জড়িত আছে কোনও গুপ্তধনের রহস্য। আমার এই অনুমান যে সত্য পরে তারও প্রমাণ পাওয়া গেছে। আসল ব্যাপারটা আমি মনে মনে সাজিয়ে নিয়েছি এই ভাবে। সুজন সাহু আর তার তিন সঙ্গী ভারতের কোথাও কোনও গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছিল। কিন্তু তার উপরে হস্তক্ষেপ করবার আগেই তারা পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। যে-কোনও রকমে তাদের গুপ্তধনের কথা জানতে পেরেছিলেন নরেনবাবু আর রামচন্দ্র সিংহ। সুজন সাহুর দল আন্দামানে যখন কয়েদি জীবন যাপন করছিল, সেই সময়ে অবকাশ আর পেনশন নিয়ে সর্বপ্রথমে দেশে ফিরে আসেন রামচন্দ্রবাবু। সুতরাং ধরে নেওয়া যেতে পারে, গুপ্তধন অধিকার করেন তিনিই সর্বপ্রথমে। তার কিছুকাল পরে দেশে ফেরেন নরেনবাবু, তারপর গুপ্তধনের উপরে নিজের অংশ দাবি করতে গিয়ে কেমন ভাবে তিনি মারা পড়েন সে কথা আমরা শুনেছি। রামচন্দ্রবাবু গুপ্তধন নিয়ে কিছুকাল নিরাপদে কাটিয়ে দেন। তারপর কোনও এক সময়ে সুজন সাহু কারাদণ্ড থেকে মুক্তি লাভ করে দেশে ফিরে আসে। তার যে একটা পা কাটা ছিল, এটা প্রথমে ছিল আমার কাছে সন্দেহ মাত্র। তার মুক্তির খবর পেয়ে পর্যন্ত রামচন্দ্রবাবু সর্বদাই অশান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করতেন, এবং পাছে কোনও পা কাটা লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় এই ভয়েই সর্বদা তটস্থ হয়ে থাকতেন। তারপর রামচন্দ্রবাবুর মৃত্যুদিনের কথা স্মরণ করো। শ্যামলাল আর কামলাল ঘরের জানলায় দেখেছিল একখানা দাড়িওয়ালা কদর্য মুখ। আর তাকে দেখেই রামচন্দ্রবাবু ভীষণ আতঙ্কে দম বন্ধ হয়ে মারা পড়েন। সহজ বুদ্ধিতেই বোঝা যায় সেই ভয়াবহ আগন্তুক সুজন সাহু ছাড়া আর কেউ নয়। সেই দিনই গুপ্তধনের লোভে কোন ফাঁকে সে ঘরে ঢুকে জিনিসপত্র তছনছ করে ফেলেছিল, কিন্তু কোনও খোঁজ না পেয়ে হতাশ হয়ে ফিরে যায়। তবু সে হাল ছাড়েনি। যে উপায়েই হোক, ওই বাড়ির সমস্ত খবর সে রেখেছিল নিজের নখদর্পণে। তাই কামলালের গুপ্তধনপ্রাপ্তির সংবাদও সে যথা সময়ে

সংগ্রহ করতে পেরেছিল। তারই ফলে কামলালের পঞ্চত্ব লাভ। ঘটনাস্থলে আমরা সুজন সাহুর পায়ের জুতোর সঙ্গে কাঠের পায়েরও ছাপ পেয়েছি। পদচিহ্ন সম্বন্ধে যাঁরা বিশেষজ্ঞ, প্রতি জোড়া পায়ের ছাপ কত তফাতে তফাতে পড়ে তা দেখে তাঁরা অনায়াসেই বলে দিতে পারেন যে কোনও লোকের মাথার প্রায় সঠিক উচ্চতা। সেই হিসাবেই আমি বলেছিলুম সুজন সাহুও মাথায় প্রায় সাড়ে পাঁচ ফুট উঁচু। তার মুখে যে দাড়ি আছে শ্যামলালের কাছেই শুনেছি। গুরুতর অপরাধের আসামিরাই যেত আন্দামানে। সুতরাং সুজনকে দীর্ঘকাল ধরেই জেল খাটতে হয়েছিল। সেইজন্যেই আমি অনুমান করেছি অন্তত সে মাঝবয়সি লোক।'

আমি বললুম, 'তোমার এ অনুমান কতটা যুক্তিসহ, হয়তো যথাসময়ে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। এখন কথা হচ্ছে, ঘটনার রাত্রে সুজনের সঙ্গে যে আর একজন লোক এসেছিল তারও প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। মনে হয় সে সাবালক নয়, বালক। ব্যাপারটা কি উদ্ভট নয়? কে সে?'

ভারত রহস্যময় হাসি হেসে বললে, 'আহা, কী মিষ্টি ভোরের হাওয়া বইছে। দ্যাখো আকাশের একখানা ভাঙা মেঘের একধারে সূর্যালোক কেমন সোনার পাড় বুনে দিয়েছে!'

ভারত কবিত্বপ্রকাশ করবার চেষ্টা করছে দেখে বুঝলুম, আপাতত সে আর কিছু প্রকাশ করতে রাজি নয়।

এদিকে ঝুমি এগিয়ে চলেছে তো এগিয়েই চলেছে, সে একবারও বাঁয়ে বা ডাইনে মুখ ফিরিয়ে তাকাচ্ছে না, মাটির উপরে নাক রেখে সোজাসুজি এগিয়েই চলেছে। ইতিমধ্যে বেলা বেড়ে উঠেছে, রাস্তার উপরেও ক্রমেই বেড়ে উঠছে পথিকের সংখ্যা এবং এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করছে নানাশ্রেণির যানবাহনও। মাঝে মাঝে ঝুমির ভাবভঙ্গি পথচারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল বটে, কিন্তু আমরা এমন সহজ, স্বাভাবিক ও নির্বিকার ভাবে অগ্রসর হচ্ছিলুম যে জনতা কোথাও কৌতূহলী হয়ে উঠবার অবকাশ পেলে না।

তারপর এক জায়গায় গিয়ে ঝুমি পড়ল রীতিমতো বেকায়দায়। সেখানটা হচ্ছে চৌমাথা। ঝুমি হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে কেমন যেন অসহায়ের মতো মুখ তুলে আমাদের দিকে বার বার তাকিয়ে দেখতে লাগল। তারপর একবার গেল ডান-দিকে, আবার ফিরে এসে গেল বাঁ-দিকে। তারপর আমাকে টানতে টানতে চারিদিকে একবার চক্কর দিয়ে এসে কান্নার সুরে কেঁউ কেঁউ করতে লাগল।

আমি বললুম, 'ভারত, দেখছ?'

—'হ্যাঁ, ঝুমি আর ক্রিয়োজোটের গন্ধ পাচ্ছে না, তাই অমন কাতর হয়ে পড়েছে! ব্যাপারটা বেশ বোঝা যাচ্ছে। আততায়ীরা এইখান থেকেই অদৃশ্য হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কেমন করে?'

ঠিক পথের পাশেই ছিল একখানা বড়ো মুদির দোকান। সেখানে বসে দোকানদার ঝুমির কাণ্ড-কারখানা দেখতে দেখতে কৌতূহলী স্বরে বললে, 'মশাই, আপনাদের কুকুর অমন ছটফট করে কাঁদছে কেন?'

ভারত হাসতে হাসতে বলল, 'বন্ধুদের শোকে। আমাদের ঝুমি যাদের খুঁজছে তাদের পাচ্ছে না। তবে তুমি হয়তো তাদের খবর দিতে পারো।'

দোকানি সবিস্ময়ে বললে, 'কুকুর কাদের খুঁজছে আমি কেমন করে বলব?'

ভারত বলল, 'রাত্রে তোমার এই দোকানে কে থাকে?'

—'কে আবার থাকবে মশাই, আমাকেই থাকতে হয়। যা দিনকাল পড়েছে, পাড়ায় রোজই চুরি হচ্ছে দোকানে দোকানে। পাহারা দেবার জন্যে রাত্রে আমিই এখানে থাকি।'

ভারত বললে, 'খুবই বুদ্ধিমানের কাজ করো। আচ্ছা বাপু, বলতে পারো, গেল পরশু রাত্রে এখানে কোনও সন্দেহজনক ঘটনা ঘটেছিল?'

দোকানি মাথা নেড়ে বললে, 'না মশাই, তেমন কোনও ঘটনাই ঘটেনি।'

ভারত বললে, 'তুমি এতটা নিশ্চিত হচ্ছ কেমন করে? রাত্রে তুমি তো জেগে ছিলে না?'

দোকানি বললে, 'ঘুমিয়ে ছিলুম বটে, কিন্তু আমার ঘুম খুব সজাগ। কোথাও খুট করে একটু শব্দ হলেই ঘুম আমার ভেঙে যায়। এই দেখুন না, পরশু অনেক রাতে একখানা চলতি ট্যাক্সি এসে ওই রাস্তার উপর থেমে দাঁড়ায়, সঙ্গে সঙ্গে আমার ঘুমও ভেঙে যায়। তারপর রাস্তার উপরে খটখট করে লাঠির শব্দ হয়। গেল পনেরো দিনের মধ্যে এ পাড়ায় তিনটে বড়ো বড়ো চুরি হয়ে গিয়েছে। কাজেই এত রাত্রে রাস্তায় ওই সব শব্দ শুনে বিছানার উপরে আমি উঠে বসি।'

ভারত বললে, 'কী বললে, রাত তখন অনেক?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ মশাই, ঠিক সেই সময় দোকানের ঘড়িতে ঢং ঢং করে তিনটে বাজল।'

—'বেশ, বিছানায় উঠে বসে তুমি কী করলে?'

—'জানলা দিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখলুম আর কী!'

—'কী দেখলে?'

—'বিশেষ কিছুই নয়। দেখলুম একখানা ট্যাক্সি স্টার্ট নিয়ে চলে গেল। এইটুকু খালি মনে আছে, ট্যাক্সিখানার নম্বর হচ্ছে ৫০।'

—'তারপর তুমি বুঝি আবার শুয়ে পড়লে?'

—'তা ছাড়া আর কী করব বলুন।'

—'হ্যাঁ, তা ছাড়া অত রাত্রে আর কিছু করবার ছিল না বটে! কিন্তু ধন্যবাদ, তোমাকে ধন্যবাদ!'

দোকানদার বিস্মিত কণ্ঠে বললে, 'আমাকে ধন্যবাদ দিচ্ছেন কেন?'

—'ট্যাক্সির নম্বরটা তুমি দেখতে ভুলে যাওনি বলে।'

কিছুই বুঝতে না পেরে দোকানদার ফ্যালফ্যাল করে ভারতের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। ভারত তার দিকে আর দৃকপাত না করে ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, 'চল রে ঝুমি, তোকে আর গন্ধ-টন্ধ শুঁকে হিল্লি-দিল্লি ঘুরে বেড়াতে হবে না। আমাদের কাজ হাসিল হয়েছে, এইবার ফিরে চল।'

অগ্রসর হতে হতে আমি বললুম, 'আমাদের কী কাজ হাসিল হয়েছে ভারত?'

ভারত বললে, 'এখনও তুমি কিছু বুঝতে পারোনি? ভেবে দ্যাখো, এই পর্যন্ত এসে ঝুমি যখন অপরাধীদের পায়ের গন্ধ আর পাচ্ছে না, তখন বুঝতে হবে যে এইখান থেকেই তারা অদৃশ্য হয়েছে। কিন্তু কেমন করে অদৃশ্য হবে? নিশ্চয়ই তারা আকাশে উড়ে যায়নি, সুতরাং ধরে নিতে হবে যে, এইখানে তারা কোনও গাড়ির উপরে আরোহণ করেছে। দোকানি বলে, পরশু রাত্রি তিনটের সময় এইখান থেকে একখানা ট্যাক্সির উপরে কেউ আরোহণ করেছিল। পরশু রাত্রেই কামলালকে খুন করা হয়। সুতরাং এটুকু অনুমান করা খুবই সঙ্গত যে, এখানে এসে গাড়ির উপরে উঠেছিল খুনিরাই।'

আমি বললুম, 'সবই তোমার অনুমান!'

—'আমার অনুমানের ভিত্তি আরও দৃঢ় হয়েছে কেন জানো?'

—'কেন?'

—'দোকানি বলে, পথের উপরে শুনেছিল সে ঠক ঠক করে লাঠির শব্দ। চোর কি খুনি পালাবার সময় কখনও লাঠি ঠকঠকিয়ে চলে না।'

—'তবে তুমি শব্দটা কীসের বলতে চাও?'

ভারত বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে বললে, 'সবই আমাকে ব্যাখ্যা করে বলে দিতে হবে? তুমি নিজে কিছুই আন্দাজ করে নিতে পারবে না? কোনও একঠেঙে লোক কাঠের পা ফেলে ফুটপাতের উপর দিয়ে চললে যে ঠকঠক করে শব্দ হয়, অন্তত এটাও তোমার জানা উচিত তো? হ্যাঁ, অপরাধীরাই যে সেদিন রাত্রে এখানে এসে ট্যাক্সির উপরে আরোহণ করেছিল, আমার এ অনুমান একটুও অসঙ্গত নয়। তারা পালিয়েছে বটে, তবে এখনও আমার নাগালের বাইরে যেতে পারেনি। যে-গাড়িতে উঠে তারা চম্পট দিয়েছে, তার নম্বর আমি পেয়েছি। দেখা যাক, অতঃপর আমরা কী করতে পারি। হ্যাঁ, ভালো কথা, তুমি এখন ঝুমিকে নিয়ে যথাস্থানে পৌঁছে দিয়ে নিজের বাড়ি চলে যাও। আমি এখন আমার নিজস্ব গোয়েন্দা বাহিনীকে একটা খবর দিতে যাব।'

॥ অষ্টম ॥

ফুকনির রহস্য

বৈকালে ভারতের ঘরে ঢুকে দেখি, মেঝের উপরে নিজের মনে সে পায়চারি করছে। তাকে আমি জানি, সে এখন একসঙ্গে করছে পদচালনা ও মস্তিষ্কচালনা। বললুম, 'কী খবর হে?'

—'ট্যাক্সি ড্রাইভারের জন্যে অপেক্ষা করছি।'

—'ট্যাক্সির ড্রাইভার!'

—'এর মধ্যেই ভুলে গেলে ভায়া? পরশু রাত্রে অপরাধীরা যে গাড়ির সওয়ার হয়ে লম্বা দিয়েছিল, তারই চালকের এখানে আসবার সম্ভাবনা আছে।'

—'তার কাছে খবর পাঠিয়েছ নাকি?'

—'আমার গোয়েন্দা বাহিনির সর্দার ছোকরাকে তুমি জানো তো? সেই যার নাম ফটিক। ট্যাক্সির নম্বর দিয়ে তাকেই আমি খোঁজ করতে পাঠিয়েছি। ফটিক হচ্ছে বাহাদুর ছেলে, ট্যাক্সির ড্রাইভারকে আবিষ্কার না করে ছাড়বে না।'

ভারত আবার পায়চারি করতে লাগল। আমি উচ্চৈঃস্বরে মাধবকে জানিয়ে দিলুম যে আমাদের চা পান করবার সময় নিকটবর্তী হয়েছে।

খানিক পরে শেষ হল চা পর্ব এবং সঙ্গে-সঙ্গেই সিঁড়ির উপরে শোনা গেল দ্রুত এলোমেলো পায়ের শব্দ; তারপরেই শুনলুম মাধব সক্রোধে চিৎকার করে বলছে, 'এই হতভাগা, লক্ষ্মীছাড়ার দল, কোথায় যাস? চুপ করে ওইখানে দাঁড়িয়ে থাক।'

কিন্তু যারা আসছিল তারা কেহই মাধবের ধমকানি গ্রাহ্যের মধ্যেই আনলে না, তেমনি সশব্দেই উপরে উঠে ঘরের মধ্যে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ে হঠাৎ একসঙ্গেই হেঁট হয়ে সেলাম ঠুকে দেওয়ালের সামনে সার বেঁধে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে গেল। সকলেরই দেহ দণ্ডবৎ সরল—যেন ফৌজের সেপাই!

আগেই বলেছি, এরা সব বস্তির ছেলে; কখনও চায়ের বা খাবারের দোকানে কাজ করে এবং কখনও বা রাস্তায় রাস্তায় হল্লা করে বেড়ায়। তাদের অধিকাংশেরই পরনে একটা করে আধময়লা গেঞ্জি আর একটা করে হাফ প্যান্ট। ওদের মধ্যে কেবল একজনের পায়ে আছে পাদুকার বিলাসিতা। খালি তাই নয়, তার গেঞ্জির উপরেও আছে একটা হাফ শার্ট এবং তার বুকপকেটও একটা ক্লিপলাগানো ফাউন্টেন পেন থেকে বঞ্চিত নয়। তারই নাম ফটিক, এই ভবঘুরে দলটির পুঁচকে সর্দার।

ভারত সিগারেট কেসের উপরে একটা সিগারেট ঠুকতে ঠুকতে বললে, 'কী হে ফটিকচাঁদ, কতদূর কী করতে পারলে?'

ফটিক একগাল হেসে বললে, 'আজ্ঞে, রামপ্রবেশ তেওয়ারিকে সঙ্গে করেই এনেছি।'

—'কে সে?'

—'সেই-ই ৫০ নম্বরের ট্যাক্সি চালায়। হুজুর, এই তেওয়ারির পো কি সহজে আসতে রাজি হয়? দস্তুরমতো ভয় দেখিয়ে তবে আনতে পেরেছি।'

—'চমৎকার। অতঃপর রামপ্রবেশকে এই ঘরে প্রবেশ করতে বলো। আর দ্যাখো, তোমার ওই পলটনটিকেও যখন-তখন ঘরের ভিতরে নিয়ে এসো না। ওদেরও তুমি নিয়ে যাও।'

চোখের পলক পড়তে না পড়তেই ঘরের ভিতর থেকে বালখিল্যের দল অদৃশ্য! প্রথমেই সিঁড়ির ধাপের উপরে উঠল দুদ্দাড় পায়ের শব্দ, তারপর বাড়ির বাইরেই রাস্তা থেকে শোনা গেল হো হো, খিলখিল হাসি, চটাপট হাততালির ধ্বনি এবং ঘন ঘন শিটি দেওয়ার তীব্র আওয়াজ! খুদে পলটনের দল স্বাধীনতার আনন্দ উপভোগ করছে।

মিনিট দুয়েক পরেই ঘরের ভিতর আবির্ভূত হল মার্কামারা ট্যাক্সি চালকের ঝোড়ো কাকের মতো মূর্তি। তার মুখের উপরে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে রাগ ও বিরাগের চিহ্ন।

ভারত শুধোলে, 'তুমিই রামপ্রবেশ?'

—'হ্যাঁ, হুজুর! কিন্তু এ কী হামলা? এই ছোঁড়াগুলো আমাকে পুলিশের ভয় দেখাচ্ছে। বলে এখানে না এলে আমায় নাকি থানায় যেতে হবে!'

ভারত বললে, 'ওরা ঠিকই বলেছে। তুমি যখন ভালোমানুষের মতো এখানে এসেছ, তখন আর তোমার কোনওই ভয় নেই। নইলে তোমাকে সত্য-সত্যই থানায় যেতে হত শেষ পর্যন্ত।'

—'কেন হুজুর, আমি কী করেছি?'

—'পরশু রাত প্রায় তিনটের সময় গাড়ি নিয়ে তুমি টালিগঞ্জে গিয়েছিলে?'

—'কেন যাব না হুজুর? আমার গাড়ি তো ভাড়া খাটাবার জন্যেই।'

—'রাত তিনটের সময় কেউ ওই অঞ্চলে গাড়ি নিয়ে ভাড়া খাটতে যায় কি?'

—'কলকাতার এক বিয়ে বাড়ি থেকে অনেক রাত্রে আমি টালিগঞ্জে গিয়েছিলুম। আমার কথা সত্য কি না আপনি সেখানে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারবেন।'

—'আচ্ছা, তারপর কী হয়?'

—'রাত তিনটের সময় ফেরবার পথে একজন লোক আমার গাড়ি থামায়।'

—'একজন?'

—'না, ঠিক একজন নয়, দুইজনই, কিন্তু সে হচ্ছে একটা বাচ্ছা ছোঁড়া। তার কথা ধর্তব্যই নয়।'

—'তাকে দেখতে কী রকম?'

—'হুজুর, অত আমি লক্ষ করে দেখিনি, আর দেখলেও বুঝতে পারতুম না, কারণ শীতের জন্যে সে মাথা থেকে পা পর্যন্ত একটা র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে ছিল।'

—'তবে যাক তার কথা। যে তোমার গাড়ি থামিয়েছিল তাকে কী রকম দেখতে?'

—'সে লোকটা ল্যাংড়া, তার একখানা পা কাঠের। তার মুখে ছিল লম্বা দাড়ি, আর বগলে ছিল একটা মাঝারি বাক্স। সেই-ই ভাড়া করলে আমার গাড়িখানাকে।'

—'তারপর?'

—'তারপর তাকে নিয়ে আমি আসি আহিরীটোলার কাছাকাছি গঙ্গার ধারে। সেইখানেই তারা গাড়ি থেকে নেমে যায়।'

—'নেমে তারা কোনদিকে যায়, দেখেছ?'

—'না হুজুর, তা দেখিনি। অতশত দেখবার ইচ্ছেও তখন আমার হয়নি, তখন শেষ রাত, বাসায় ফিরতে পারলেই বাঁচি। কেবল এইটুকু দেখেছিলুম, তারা রেললাইন পার হয়ে গঙ্গার দিকেই যাচ্ছে।'

ভারত বললে, 'আচ্ছা রামপ্রবেশ, তুমি যেটুকু খবর দিয়ে গেলে তার জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ। এখন তুমি যেতে পারো। আর ফটিকচাঁদ, এখন তুমিও তোমার দলবল নিয়ে

অদৃশ্য হতে পারো। আর দ্যাখো, আজ সন্ধ্যার সময় আহিরীটোলা ঘাটে আমার জন্যে তুমি সদলবলে অপেক্ষা কোরো।'

ফটিকচাঁদের সঙ্গে সঙ্গে রামপ্রবেশের প্রস্থান। তার একটু পরেই রাস্তার উপরে আবার শোনা গেল, খুব জোর শিটি, হাততালি, হো হো হাসি ও হট্টগোল। সারা পাড়া মাতিয়ে সেই বিষম গোলমেলে ব্যাপারটা ক্রমেই দূরে সরে যেতে লাগল।

ভারত হেসে ফেলে বললে, 'আমাদের খুদে বর্গীর দল বিদেয় হল, পাড়াও এইবারে জুড়োল। ভাস্কর, আজকের 'বঙ্গমিত্র' কাগজে হত্যাকাণ্ডের কী রিপোর্ট বেরিয়েছে দেখেছ?'

আমি বললুম, 'না।'

ভারত একখানা খবরের কাগজ আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে, 'তবে পড়ে দ্যাখো।'

আমি কাগজখানা হাত বাড়িয়ে গ্রহণ করলুম। বড়ো বড়ো হরফের শিরোনামার তলায় লেখা রয়েছে, 'হত্যাকাণ্ড ও রত্নলুণ্ঠন'—'গত ৩রা ডিসেম্বর তারিখে টালিগঞ্জের 'সাগর স্মৃতি' নামক উদ্যান বাটিকায় এক রহস্যময় চুরি ও ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। নিহত হইয়াছে বাবু কামলাল সিংহ এবং চুরি গিয়াছে একটি মাঝারি তোরঙ্গ ভরা বহুমূল্য জড়োয়া গহনা প্রভৃতি। এই হত্যাকাণ্ড প্রথমে আবিষ্কার করেন মৃত ব্যক্তির সহোদর শ্যামলাল সিংহ এবং শৌখিন গোয়েন্দা নামে বিখ্যাত ভারতভূষণ চৌধুরি ও তাঁহার সঙ্গী বাবু ভাস্কর সেন। তাহার পরেই সংবাদ পাইয়া পুলিশের ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের সুদক্ষ কর্মচারী বাবু গোবিন্দরাম গাঙ্গুলি লোকজন লইয়া ঘটনাস্থলে আবির্ভূত হন। তিনি অতিশয় চাতুর্য ও তৎপরতার সহিত তদন্ত করিয়া সমস্ত রহস্যের সমাধান করিয়া ফেলেন। তাহার ফলে হতব্যক্তির জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্যামলাল সিংহ ঘটনাস্থলেই পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হন। দুর্ভাগ্যক্রমে এখনও চোরাই মালের কোনও সন্ধান পাওয়া যায় নাই বটে, তবে গোবিন্দরামবাবুর মতো ধুরন্ধর পুলিশ কর্মচারীর হস্তে যখন মামলার ভার পড়িয়াছে, তখন এ ব্যাপারটা নিষ্পত্তি হইতে যে বিলম্ব হইবে না, ইহা আমরা অনায়াসেই আশা করিতে পারি। ইতিমধ্যেই তিনি যে বিস্ময়কর কর্মকুশলতা দেখাইয়াছেন, তাহার জন্য তাঁহার যশ যে সমধিক বর্ধিত হইবে তদ্বিষয়ে কোনওই সন্দেহ নাই। গোবিন্দরামবাবুর মুখেই আমাদের সংবাদদাতা খবর পাইয়াছেন যে, অদূর ভবিষ্যতে তিনি আরও কোনও কোনও সন্দেহজনক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিবার আশা রাখেন।'

কাগজখানা রেখে দিয়ে আমি বললুম, 'ওহে ভায়া, গোবিন্দবাবু যে আরও কোনও কোনও সন্দেহজনক ব্যক্তির সন্ধান পেয়েছেন! তাদের মধ্যে আমরা নেই তো?'

ভারত হাস্যমুখে বললে, 'পুলিশের কালো ফর্দে আমাদের নাম থাকলেও আমি বিস্মিত হব না। কিন্তু এসব কথা এখন থাক ভাই। জরুরি কাজে আমাকে এখুনি একবার বাইরে বেরুতে হবে।'

আমি বললুম, 'জরুরি কাজটা কী শুনি?'

ভারত গাত্রোত্থান করে বললে, 'আমি ফিরে এলেই আমার মুখে সব শুনতে পাবে। আমি এখন চললুম।'

আমি বসে বসে ভাবতে লাগলুম। আমার সমস্ত ভাবনা চিন্তাই এখন ছুটছে কেবল একদিকেই।

যে-রহস্যময় রক্তাক্ত ঘটনার আবর্তে এসে পড়েছি, সর্বদাই আমার মনকে আচ্ছন্ন করে রাখে সেই ব্যাপারটাই। আবার সেই ঘটনাগুলোর কথা স্মরণ করতে গেলেই সর্বাগ্রে আমার মনের ভিতরে ভেসে ওঠে একখানি সুন্দর কিন্তু কাতর মুখ! চিত্রা আমার মনের ভিতরটা করে তুলেছে বিচিত্র স্মৃতির আলিম্পনে উপভোগ্য। তার কথা ভেবে সুখ পাই, তার মুখ মনে পড়লে বুকে জাগে আনন্দের ছন্দ।

তারপরেই আর একটা কথা ভেবে আমার মন কেমন মুষড়ে পড়ে। চিত্রা আজ বিপদগ্রস্ত হয়ে আমাদের অবলম্বন করেছে বটে, কিন্তু দু-দিন পরে এই মামলাটার কিনারা হয়ে গেলে পর আর কি আমার কথা নিয়ে তার মাথা ঘামাবার দরকার হবে? সে হবে তখন বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী, তার অনুগ্রহ ভিক্ষা করবার জন্যে চারিদিক থেকে ছুটে আসবে দলে দলে লোক, সেই প্রলুব্ধ জনতার মাঝখান থেকে আমার মতো ক্ষণিকের অতিথি আর কি তার চিত্তকে অধিকার করতে পারবে? এই দুর্ভাবনাই আজকাল যখন-তখন আমার মনকে পীড়িত করে তোলে।

বৈকালের পরে কেটে গেল সন্ধ্যাকাল। তারপর রাত সাড়ে নয়টা বাজবার সঙ্গে-সঙ্গেই আবার পাওয়া গেল ভারতের দেখা।

তার দিকে তাকিয়ে বললুম, 'কী হে, তোমার মুখখানা বেশ উৎফুল্ল দেখছি যে! কেল্লা ফতে করেছ নাকি?'

ভারত একখানা চেয়ারের উপরে ধুপ করে বসে পড়ে বললে, 'এত সহজে কেল্লা ফতে হলে আর ভাবনা কী ছিল? তবে হ্যাঁ, দুর্গ এখনও অধিকার করতে পারিনি বটে, কিন্তু দুর্গ প্রাকারের উপরে আরোহণ করতে পেরেছি।'

আমি কৌতূহলী কণ্ঠে বললুম, 'সেও তো বিশেষ আনন্দের কথা! অতঃপর সন্দেশ পরিবেশন করলে সুখী হব।'

একটা সিগারেট বার করে হাতির দাঁতের লম্বা পাইপের ভিতরে ঢুকিয়ে তাতে অগ্নি সংযোগ করে ভারত কিছুক্ষণ নীরবে ধূমপানে নিযুক্ত হয়ে রইল। তারপর ধীরে ধীরে বললে, 'দ্যাখো ভাস্কর, যথেষ্ট পরিমাণে আরও কাঠখড় না পোড়ালে এ মামলাটার কিনারা হবে বলে মনে হচ্ছে না। এবারে কেবল সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তি নয়, বোধহয় আমাদের দৈহিক শক্তি প্রয়োগ করবারও দরকার হবে। কোথায় গিয়ে যবনিকা পড়বে জানি না, তবে নাটকের গতি কতখানি এগিয়েছে সেটা তোমায় বলতে আমার আপত্তি নেই।

'মনে আছে তো, ট্যাক্সির চালক রামপ্রবেশ বলেছিল, সুজন সাহু আর তার সঙ্গীকে কাল ভোরের দিকে, অর্থাৎ পরশু শেষ রাতে আহিরীটোলা ঘাটের কাছে নিয়ে গিয়ে নামিয়ে দিয়েছিল। এটাও তুমি শুনেছ যে, সুজনকে সে দেখেছিল রেল লাইন পার হয়ে গঙ্গার দিকে যেতে। এখন প্রশ্ন ওঠে, এত জায়গা থাকতে অপরাধীরা সুদূর টালিগঞ্জের প্রান্ত থেকে উত্তর কলকাতার নদীর ধারে বিশেষ এক ঘাটের কাছে গিয়ে নামল কেন?

সুজনের একটা পা কাটা, তার উপরে সে বহন করেছিল একটা রত্নপূর্ণ তোরঙ্গ। সে খুনি আর চোর, এ সময়ে সর্বপ্রথমে তার পক্ষে সকলের চোখে ধুলো দেবার চেষ্টা করাই হবে স্বাভাবিক। কিন্তু সে তা করেনি। অতএব ধরে নিতে হবে, ওই নদীর ধারেই তার কোনও আস্তানা আছে।

'কিন্তু সে কেমন আস্তানা? গঙ্গার ধারে রেল লাইনের এপাশে পাশাপাশি অনেক বাড়ি আছে বটে। কিন্তু সুজন নিশ্চয়ই এপাশের কোনও বাড়ির ভিতরে গিয়ে ঢোকেনি, সে অগ্রসর হয়েছিল রেল লাইনের ওপাশে নদীর দিকে। ওদিকে কোনও বসতবাড়ি নেই, আছে কেবল ঘাটের পরে ঘাট। তারপরই নদী। সেখানে কোনও অপরাধী আত্মগোপন করতে পারে এমন কোনও জায়গাই নেই। তবে সুজন ওই দিকে গেল কেন?

'এর একমাত্র জবাব হচ্ছে, সুজন গিয়েছিল কোনও নৌকার সন্ধানে। সেই নৌকার সঙ্গে তার যে আগে থাকতেই বন্দোবস্ত করা ছিল সে-বিষয়েও সন্দেহ করবার কিছু নেই। তবু আমার অনুমান যে সত্য, তার প্রমাণ পাওয়া দরকার।

'ভেবে দেখলুম, প্রভাত তখন আসন্ন, সুজনের পা কাটা আর তার সঙ্গে আছে বালকের মতো দেখতে এক সঙ্গী। তার উপরে সে করছে একটা তোরঙ্গের ভারবহন। তারা সহজেই লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

'শেষরাত অর্থাৎ সূর্যোদয়ের প্রক্কালে—হিন্দুপুণ্যার্থীরা যাকে বলে ব্রাহ্মমুহূর্ত। সেই সময় অনেকের গঙ্গাস্নান করার অভ্যাস আছে। আবার অনেকে সেই সময়েই প্রাতঃভ্রমণ করতে বেরিয়ে পড়ে। অপরাধীরা নিশ্চয়ই সেই রকম কোনও কোনও লোকের চোখে পড়েছিল, কিন্তু তাদের কারুরই ঠিকানা আমরা জানি না বা জানবারও উপায় নেই। তবে শেষ রাতে আর এক শ্রেণির লোক গঙ্গার ঘাটে সজাগ ভাবে বসে থাকতে বাধ্য হয়। তারা হচ্ছে ঘেটো ওড়িয়া বামুন। দু-এক পয়সার বিনিময়ে স্নানার্থীদের সাহায্য করাই হচ্ছে তাদের পেশা। তাদের পাত্তা পাওয়া মোটেই কঠিন নয়।

'আহিরীটোলার আশেপাশে ঘাটে ঘাটে এমনই সব ঘেটো বামুনদের কাছে আমি সন্ধান নিয়ে বেড়াতে লাগলুম। আমার চেষ্টা ব্যর্থ হল না। একজন ওড়িয়ার মুখে শুনলুম, কাল ঠিক ভোরের আগে এমন দুজন লোককে সে দেখেছে যাদের সঙ্গে আমার বর্ণনা হুবহু মিলে যায়। একজনের বগলে তোরঙ্গ, তার কেঠো পা; আর-একজনকে ছোকরার মতন দেখতে, কিন্তু সে ছোকরা নয়। ঝাপসা আলোয় তারা যায় গঙ্গার দিকে। দৃশ্যটা একটু অসাধারণ বলেই সে কৌতূহলী হয়ে তাদের উপরে দৃষ্টি রেখেছিল। তোরঙ্গ নিয়ে লোকদুটো ঘাটের দিকে নেমে যায়। তারপর সেখান থেকে ওঠে একখানা মোটরবোটে। তারপরেই বোটখানা সশব্দে ঘাট ছেড়ে চলে যায় গঙ্গার উত্তর দিকে। বোটখানার বিশেষ বর্ণনা দেবার জন্যে তাকে অনুরোধ করলুম—যদিও আমি জানতুম তখনও চারিদিক ছিল হালকা অন্ধকারে আচ্ছন্ন। সে-অবস্থায় কেউ কখনও ভালো করে কোনও জিনিস দেখতে পায় না। কিন্তু তার উত্তর হল আশাতীতরূপে আশাপ্রদ। বোটখানা নাকি তার আগের দিন বৈকাল থেকেই ঘাটের পাশে বাঁধা ছিল। আর সেটা হয়ে উঠেছিল এমন একটা দ্রষ্টব্য ব্যাপার যে, লোকের

চোখকে করেছিল সহজেই আকৃষ্ট; কারণ বোটখানা ছিল একেবারেই নতুন। টাটকা সবুজ রঙের বোট, উপরদিকে লাল রঙের পুরু ডোরাকাটা।

'ভাস্কর, আমি কি অনেকটা অগ্রসর হয়েছি বলে মনে হচ্ছে না?'

—'নিশ্চয়ই হয়েছ। কিন্তু ভারত, উত্তরবাহিনী নদী গিয়েছে কত দেশ-দেশান্তরে, তুমি পলাতকদের ঠিকানা জানতে পারবে কেমন করে?'

—'আর এক বিশেষ কারণে তাও পারব বলে মনে হচ্ছে। ভাস্কর, একে তারা অপরাধী, ধরা পড়লেই নিশ্চিত ভাবে ফাঁসিকাঠে তাদের দোল খেতে হবে; তার উপরে তাদের চেহারা হচ্ছে দস্তুরমতো মার্কা মারা। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আগে থাকতেই তারা এইসব বুঝে আটঘাট বেঁধেই কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছে। তারা বেশি দূর কোথাও যাবে বলে মনে হয় না। খুব সম্ভব কলকাতার কাছাকাছি কোনও জায়গায় গঙ্গাতীরের কোনও বাড়ির ভিতরেই এখন কিছুকাল তারা অজ্ঞাতবাস করবে। কিছুকাল পরে এই হাঙ্গামার জের যখন মিটে যাবে, তখন কতকটা নিশ্চিন্ত হয়ে নিজেদের গুপ্ত আস্তানা ছেড়ে বাংলার বাইরে কোথাও পিঠটান দেওয়ার চেষ্টায় থাকবে। আমার এই যুক্তি আমি নিজে অকাট্য বলে মনে করি।'

আমি বললুম, 'বেশ। তোমার যুক্তি না হয় অকাট্য বলেই মেনে নিলুম। কিন্তু নদীর ধারে এপারে-ওপারে আছে অসংখ্য বাড়ি। কোন বাড়ির ভিতরে তারা লুকিয়ে আছে এটা আবিষ্কার করা কি সহজ কথা?'

দগ্ধাবশিষ্ট সিগারেটটা ভস্মাধারে নিক্ষেপ করে ভারত বললে, 'আপাতদৃষ্টিতে ব্যাপারটা সহজ নয় বটে, কিন্তু কিঞ্চিৎ মাথা খাটালেই বুঝতে পারবে, এক কারণে এটা বেশ সহজ হয়ে এসেছে।'

—'কারণটা কী আমার মাথায় ঢুকছে না।'

—'বন্ধু, বাড়ির ভিতরে লুকিয়ে থাকা খুবই সহজ বটে। কিন্তু একখানা মোটরবোট লুকিয়ে রাখা কি সহজ ব্যাপার? ভালো করে সন্ধান নিলেই দেখতে পাবে, সেই বোটখানা এখন ভাসছে গঙ্গার ধারেই কোনও ঘাটে বা আঘাটায়। বোটের স্বধর্ম হচ্ছে তেলের মতো জলের উপর ভেসে থাকা। অপরাধীদের এই নৌকাখানা স্বধর্ম ত্যাগ করবে কেন? আমার বেসরকারি গোয়েন্দা বাহিনীর নায়ক ফটিকচাঁদ হচ্ছে অতিশয় সবজান্তা ছোকরা। আমার নির্দেশে সে আজ তার দলবল নিয়ে গঙ্গার দুই তীরে ছড়িয়ে পড়ে বেশ কিছুদূর পর্যন্ত তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখবে, নদীর কোথায় আছে সেই নতুন ও রংচঙে বোটখানা ভাসমান! আমার দৃঢ় বিশ্বাস আজ কাল পরশু বা হপ্তাখানেকের ভিতরেই সুজন সাহুর মোটরবোট আর তার গুপ্ত আস্তানার সঠিক খবর পাওয়া যাবে। অতএব শ্রীমান ফটিকচাঁদের কাছ থেকে রিপোর্ট না পাওয়া পর্যন্ত আমাদের আর কিছুই করবার নেই।'

আমি বললুম, 'তুমি ফটিকের উপরে বড়োই বেশি নির্ভর করছ! দেখা যাক তোমার এই নির্ভরতা ফলপ্রসূ হয় কি না? কিন্তু অন্ধকারের আর এক দিকে তুমি এখনও আলোকপাত করতে পারোনি।'

মুখ টিপে একটুখানি হেসে ভারত বললে, 'পারিনি নাকি?'

—'না, পারোনি। সুজন সাহুর সেই সঙ্গীটি কে? তার কথা কিছুই আমাদের জানা নেই, অথচ সে-ও হচ্ছে হত্যাকারীর সহকারী।'

ভারত বললে, 'সহকারী নয় ভায়া, সেই-ই হচ্ছে আসল হত্যাকারী, অন্তত আমার তাই বিশ্বাস।'

—'কিন্তু তার কথা তুমি কী জানো?'

—'তার অনেক কথাই আমি জানি। প্রথম কথা হচ্ছে সে বালক নয়।'

আমি বললুম, 'তবে সে কী?'

—'মাথায় সে বালকের মতো ছোটো বটে, কিন্তু সে বালক নয়। তার পায়ের মাপ যে বালকের মতোই ছোটো, এটা আমরা দেখেছি। তার নগ্ন পদচিহ্নের মধ্যে আর একটা বিশেষত্বও আমি আবিষ্কার করেছি। তার পায়ের আঙুলগুলো পরস্পর থেকে কতকটা বিচ্ছিন্ন—যারা জন্মাবধি জুতো না পরে খালি পায়ে চলাফেরা করে তাদেরই পায়ের আঙুলগুলো এইরকম হয়। অর্থাৎ সেই ছোট্ট মানুষটি জন্মাবধি পাদুকার সংস্পর্শেই আসেনি। ঘটনাক্ষেত্রে আর একটা অদ্ভুত জিনিস আমরা পেয়েছি, একটা ফাঁপা কাঠের দণ্ড। সাধারণত দণ্ড হয় নিরেট, কিন্তু এর ভিতরটা ফাঁপা কেন? এর কারণ তুমি কিছু বলতে পারো?'

—'হয়তো সেটা হচ্ছে কোনওরকম নলচের মতো জিনিস, তা বিশেষ কোনও কাজে ব্যবহৃত হয়।'

—'ধরো তাই। কিন্তু তা কী কী কাজে লাগতে পারে, জানো?'

—'উঁহু!'

—'শিকারে আর হত্যাকাণ্ডে!'

আমি বললুম, 'অসম্ভব!'

ভারত বললে, 'তোমার মাথাটি যে সাধারণ কাঠের দণ্ডের মতোই নিরেট, এটা আমার অজানা নেই। এই ফাঁপা দণ্ডটার ইংরেজি নাম কী জানো? 'ব্লো-পাইপ!' আমাদের ভাষায় যাকে বলা যেতে পারে 'ফুকনি'—অর্থাৎ যার ভিতরে সজোরে ফুৎকার দেওয়া চলে। এইরকম ফুকনি পৃথিবীর নানা দেশে আদিম বাসিন্দাদের ব্যবহার করতে দেখা যায়। যেমন সুমাত্রা, জাভা আর দক্ষিণ আমেরিকা প্রভৃতি জায়গায়। অসভ্য মানুষরা বন্য পশু কি শত্রুবধ করবার সময়ে এইরকম ফুকনির সাহায্য নেয়। আচ্ছা, এইবারে ইংরেজি 'গেজেটিয়ারে'র এক খণ্ডের মধ্যে দৃষ্টিপাত করা যাক। এখানে যা লেখা আছে, তার কিছু কিছু বাংলায় তর্জমা করে তোমার কর্ণকুহরে নিক্ষেপ করতে চাই :

'আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ : উত্তর সুমাত্রা থেকে তিনশো চল্লিশ মাইল দূরে বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত। আন্দামানের আদিবাসীদের পৃথিবীর বামন জাতিদের অন্যতম বলে গণ্য করা হয়। সাধারণত মাথায় তারা চার ফুটের চেয়ে নীচু। অনেকে আবার তার চেয়েও ঢের ছোটো। তারা অত্যন্ত হিংস্র ও বন্য মানুষ, যদিও কারুর সঙ্গে বন্ধুত্ব প্রগাঢ় হলে প্রাণ দিয়েও তার মর্যাদা রক্ষা করে। তাদের হাত আর পা দুই-ই এত ছোটো যে সহজেই দৃষ্টি

আকর্ষণ করে। জাহাজডুবি হয়ে নাবিক আর যাত্রীরা সেই দ্বীপে গিয়ে পড়লে ওই আদিবাসীরা পাথরের মাথাওয়ালা হাতুড়ি আর বিষাক্ত তিরের সাহায্যে হত্যা করে।'

'ভাস্কর, ওই আন্দামানেরই আদিবাসীদের কেউ হচ্ছে সুজন সাহুর সঙ্গী। সুজন যখন আন্দামানে বন্দি জীবন যাপন করত, তখন কোনও আন্দামানির সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা সুদৃঢ় হয়ে উঠেছিল, আর তাকেই সে সঙ্গে করে কলকাতায় নিয়ে এসেছে। সে-ও অন্যান্য আন্দামানিদের মতো 'ব্লো-পাইপ' বা ফুকনি ব্যবহার করতে সিদ্ধহস্ত। এই ফুকনি কেমন করে ব্যবহার করতে হয় তাও বোধহয় তুমি জানো না? নলচের মতো ফাঁপা দণ্ডের ভিতরে বিষাক্ত শলাকা বা কাঁটা রেখে জোরে ফুঁ দিলেই সেই শলাকা ছুটে গিয়ে লক্ষ্যস্থলে বিদ্ধ হয়। এই ভাবেই আহত হয়ে কামলাল বেচারা মারা পড়েছে। তার মাথায় বেঁধা ছিল একটি শলাকা, আর এইরকম শলাকা ভরতি একটা ছোটো ব্যাগও ঘটনাস্থল থেকে আমরা কুড়িয়ে পেয়েছি। আমার মত কী জানো? সুজন সাহু খুব সম্ভব কামলালকে হত্যা করত না, কারণ তার আক্রোশ ছিল কামলালের পিতার উপরেই। বিশেষ, ফুকনি ব্যবহারের অভিজ্ঞতাও তার থাকবার কথা নয়। সে নিজে পঙ্গু, বিনা সাহায্যে দেয়াল বেয়ে দোতলার উপরে গিয়ে উঠতে পারত না। তাই তার অবলম্বন রজ্জু নিয়ে ওই আন্দামানিটাই আগে উপরে উঠে তারপর দড়িগাছা নীচে সুজনের কাছে ফেলে দেয়। সুজন সেই দড়ি ধরেই যথাস্থানে গিয়ে হাজির হয়। কিন্তু তার আগেই আন্দামানিটা কামলালকে দেখতে পেয়েছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে জেগে উঠেছিল তার হিংস্র আর বন্য পশুর মতো মন! সে তৎক্ষণাৎ ফুকনি দিয়ে বিষাক্ত কাঁটা ছুড়ে কামলালের প্রাণবধ করে। আমার এই বিশ্বাস যে ভুল নয় পরে নিশ্চয়ই তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। ভাস্কর, দেহমন শ্রান্ত হয়ে পড়েছে, এইবারে আমি খানিকক্ষণের জন্যে নিদ্রাদেবীর আরাধনা করতে চাই। কিন্তু তুমি কী করবে?'

আমি বললুম, 'আমি এখন একবার কমলাদেবীর সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

ভারতের চোখমুখের উপর দিয়ে একটা নীরব হাসির ঢেউ খেলে গেল। সে বললে, 'ওহো, তাই নাকি? খালি কমলাদেবীর সঙ্গে দেখা করতে চাও? আর কারুর সঙ্গে নয়?'

মনে মনে উত্তপ্ত হয়ে আমি বললুম, 'হ্যাঁ, সেই সঙ্গে চিত্রাদেবীর সঙ্গেও আমি দেখা না করে আসব না। যেসব ঘটনা ঘটেছে সেগুলো তাঁদেরও জানা দরকার।'

—'না জানালেও দোষ হবে না। বন্ধু হে, মেয়েদের ধাতে গুপ্তকথা সয় না, তারা যার তার কাছে সব জাহির করে ফেলতে পারে। তবে তোমার যখন ইচ্ছে হয়েছে, আমি সে ইচ্ছায় বাধা দিতে চাই না। কারণ তোমার এ ইচ্ছা হচ্ছে দুরন্ত নদীর মতো এবং কে না জানে কবিরা বলেছেন যে, পর্বত গুহা ছেড়ে নদী যখন বাইরে বেরিয়ে পড়ে, তখন 'কার সাধ্য রোধে তার গতি'! অতএব 'শুভস্য শীঘ্রং', কারণ চিত্রাদেবীও হয়তো শুষ্ক বালুচরের মতো নদীর স্নিগ্ধ স্পর্শ পাবার আশায় আকুল হয়ে বসে আছেন।'

দুর্মুখ ভারত, বেকায়দায় পেলে কারুকে ছেড়ে কথা কয় না!

॥ নবম ॥

মাঝিমাল্লার ভূমিকায়

সব কথা শুনে কমলাদেবী হাসতে হাসতে বললেন, 'এ যে দেখছি রীতিমতো রোমান্স। গুপ্তধন, দুরাত্মা, নরখাদক অসভ্য, বিপন্না তরুণী, আবার উদ্ধারকর্তা বীরপুরুষ!'

চিত্রা একমুহূর্তের জন্যে আড়চোখে আমার দিকে তাকিয়ে সলজ্জ হাসি হেসে মুখ ফিরিয়ে নিলে অন্যদিকে। কমলাদেবী বললেন, 'চিত্রা, তোর ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে এই মামলার ফলাফলের উপরে। কিন্তু হাতে সাত রাজার ধন আসবার সম্ভাবনা থাকতেও তোর মুখে তো কোনওই আগ্রহের চিহ্ন দেখছি না! মনে ভেবে দেখ, এত টাকা হাতে এলে তোর পায়ের তলায় এসে পড়বে সারা পৃথিবী!'

চিত্রা অতিশয় সহজ ভাবেই বললে, 'পিসিমা, দুনিয়ায় টাকাই সব নয়। টাকার জন্যে আমার মনে কোনওই আগ্রহ নেই। কিন্তু শ্যামলালবাবুর জন্যে আমার অত্যন্ত দুশ্চিন্তা হচ্ছে। গোড়া থেকেই তিনি আমার প্রতি যে-রকম ভদ্র ব্যবহার করে আসছেন তার তুলনা নেই। আমার প্রতি সুবিচার করতে গিয়েই আজ তিনি এই বিপদে পড়েছেন। এখন তাঁর মঙ্গলের জন্যে আমাদের সকলেরই প্রাণপণ চেষ্টা করা উচিত।'

চিত্রার কথা শুনে তার প্রতি আমার শ্রদ্ধা আরও বেড়ে উঠল। আমি বললুম, 'চিত্রাদেবী, আপনার কোনও আশঙ্কা নেই। আমার বন্ধু ভারত বিপদ থেকে শ্যামলালবাবুকে নিশ্চয়ই উদ্ধার করবে।'

চিত্রা বললে, 'আপনাদের সদাশয়তাও কোনওদিন আমি ভুলতে পারব না। আমি কোথাকার কে, অথচ তবু আপনারা আমার জন্যে এত করছেন!'

আমি কোনও জবাব দিলুম না। কেবল একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলুম চিত্রার মোহনীয় মুখের দিকে। চিত্রা বলছে সে কোথাকার কে! কিন্তু সে যে আমার কতখানি, এ কথা যদি জানতে পারত!

পরদিন সকালবেলায় ভারতের বাড়িতে গিয়ে শুনলুম ঘুম থেকে উঠেই সে বাইরে বেরিয়ে গিয়েছে।

কী আর করি, খবরের কাগজখানা নিয়ে এককোণে গিয়ে বসে পড়লুম। মাধব চায়ের ট্রে হাতে করে ঘরে ঢুকে বললে, 'বাবু কাল সারা রাত ঘুমোননি।'

—'ঘুমোননি! কেন?'

—'জানি না, আমারও চোখে সারারাত ঘুম ছিল না। নীচের ঘরে শুয়ে শুয়ে কেবলই শুনতে পেয়েছি, এই ঘরের মেঝের উপরে বাবুর পায়ের শব্দ! মাঝে মাঝে আমাকে ডেকে জিজ্ঞেস করেছেন, ফটিক কি কোনও খবর নিয়ে ফিরে এসেছে? কিন্তু সেই ফচকে ছোঁড়া ফটকে, সে আবার এমন কী জবর খবর আনতে পারবে অনেক মাথা ঘামিয়েও আমি তা বুঝে উঠতে পারিনি। তারপর ভোরবেলায় উঠে বেরিয়ে যাবার সময় বাবু আমাকে বলে গেলেন, কোনও খবর নিয়ে যদি কেউ আসে তাকে যেন এইখানে বসিয়ে রাখা হয়।'

আমার চা-পান শেষ হতে না হতেই সিঁড়ির উপরে দুমদাম পায়ের শব্দ তুলে ঘরের ভিতরে হস্তদন্তের মতন প্রবেশ করলে গোবিন্দরাম। তারপর ইতস্তত চোখ বুলিয়ে বললে, 'ভারতবাবু কি বাড়িতে নেই?'

আমি বললুম, 'না, তাকে কি আপনার বিশেষ দরকার?'

—'হ্যাঁ, বিশেষ দরকার, জরুরি দরকার! একটু সবুর করুন মশায়। অনেকটা দৌড়ে এসেছি, খানিকটা হাঁপ ছেড়ে নিই।' এই বলে তার হৃষ্টপুষ্ট মেদবহুল বপুখানির ভার একখানা চেয়ারের উপরে ন্যস্ত করে মিনিট খানেক ধরে সে হাপরের মতো বেশ খানিকটা হাঁপিয়ে নিলে।

আমি বললুম, 'বড্ড যে হাঁপিয়ে পড়েছেন দেখছি। একটু চা-টা চলবে কি?'

গোবিন্দরাম উৎসাহিত হয়ে বললে, 'খুব চলবে! চায়ের সঙ্গে টা আছে তো?'

আমি গলা তুলে বললুম, 'ওহে মাধব, আমাদের গোবিন্দবাবু চা আর টা দুইই চান, শিগগির তার ব্যবস্থা করো।'

গোবিন্দরাম বললে, 'বাব্বাঃ, এতক্ষণে দম ফিরে পেলুম। দেখুন ভাস্করবাবু, এটা হচ্ছে অতিশয় ছ্যাঁচড়া মামলা! জাল ফেলে মাছ ঘাটের কাছে টেনে আনলুম, কিন্তু হঠাৎ সেই জাল ছিঁড়ে মাছ করলে পলায়ন! দুঃখের কথা বলব কী, আমার মাথা হেঁট হয়ে গিয়েছে মশাই।'

আমি বললুম, 'এতখানি আত্মনিন্দার কারণ কী?'

—'আরে মশাই, শ্যামলালকে তো থানায় গিয়ে গেলুম। সেই-ই যে খুনি সে বিষয়ে আমার কোনওই সন্দেহ ছিল না। কিন্তু তারপর ঘটনার রাত্রে কামলালের কাছ থেকে ফিরে গিয়ে সে যে একবারও বাড়ির বাইরে পা বাড়ায়নি, শ্যামলাল তার অসংখ্য প্রমাণ দাখিল করেছে। তারপরেও শ্যামলালকে ধরে রাখলে আমাকেই বিপদে পড়তে হত। কাজেই ভালোমানুষের মতো তাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছি। ব্যাপারটা হয়ে দাঁড়িয়েছে পর্বতের মূষিক প্রসবের মতো। এখন আমার একমাত্র ভরসা আপনাদের এই ভারতবাবু। সেইজন্যেই তাঁর কাছে ছুটে এসেছি। আপনি বলতে পারেন, তিনি কি নতুন কোনও সূত্র আবিষ্কার করেছেন?'

আমি বললুম, 'তা আবিষ্কার করেছে বই কি! ভারত অপরাধীদের পরিচয় পর্যন্ত জানতে পেরেছে।'

গোবিন্দরাম বলে উঠল, 'ও হরি, বুঝেছি! ভারতবাবু এইজন্যেই আমাকে এখানে আসতে বলেছেন!'

আমি একটু বিস্মিত স্বরে বললুম, 'ভারত আপনাকে এখানে আসতে বলেছে?'

—'হ্যাঁ, খুব ভোরেই একটা ছোকরা গিয়ে আমাকে একখানা চিঠি দিয়ে এল। ভারতবাবু জানিয়েছেন, আজ সকালে আমি যেন এখানে হাজির থাকি। তা নইলে, থানায় না গিয়ে আমি কি এখানে ভেরেন্ডা ভাজতে এসেছি?'

আমি হাসতে হাসতে বললুম, 'না, না, সে কী কথা, ভেরেন্ডা ভাজবেন কেন? ওই যে মাধু চা-টা নিয়ে এসেছে। এইবারে ওগুলোর সদ্ব্যবহার করুন।'

গোবিন্দরাম অমিতপরাক্রমে গরম গরম 'টোস্ট', সিদ্ধ ডিম ও চায়ের পেয়ালাকে আক্রমণ করলে, সেই অবসরে আমিও বসে বসে আবার খবরের কাগজ পড়তে লাগলুম।

হঠাৎ দরজার কাছে পায়ের শব্দ শুনে মুখ তুলে দেখি, ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়িয়েছে একটা সম্পূর্ণ অপরিচিত মূর্তি। টিকিওয়ালা মাথায় উশকোখুশকো চুল, পরনে জায়গায় জায়গায় ছেঁড়া একটা ময়লা গেঞ্জি ও মালকোঁচা মারা খাটো কাপড়, পাদুকাহীন ধূলিধূসরিত পা, বলিরেখাঙ্কিত মুখে আধপাকা দাড়িগোঁফ, গায়ে রোদপোড়া শ্যামবর্ণ, বয়স হবে ষাটের কাছাকাছি। কিন্তু এ বয়সেও তাকে বেশ শক্ত সামর্থ্য ও কর্মঠ বলেই মনে হয়।

এখানে এমন চেহারার আবির্ভাবের জন্যে প্রস্তুত ছিলুম না। সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলুম, 'কে হে বাপু তুমি?'

মুখের মধ্যে কয়েকটি দন্তহীন বিবর বার করে লোকটা বললে, 'আমি হচ্ছি বৃন্দা মাঝি। ভারতবাবুকে একটা জরুরি খবর দিতে এসেছি।'

আমি বললুম, 'কী রকম জরুরি খবর?'

—'ভারতবাবু কোনও মামলার এক আসামির ঠিকানা জানতে চান। সেই ঠিকানাটা জানাবার জন্যে আমি এখানে এসেছি।'

আমি বললুম, 'ভারতবাবু একটু কাজে বাইরে গিয়েছেন, ঠিকানাটা তুমি আমাকে বলে যেতে পারো।'

বৃন্দা মাঝি প্রবল মস্তক আন্দোলন করে বললে, 'না মশাই, সেটি হতেই পারে না! ভারতবাবু যখন নেই, আমি এখান থেকে চললুম।'

লোকটা প্রস্থানোদ্যত হল। গোবিন্দরামের মস্ত মুখগহ্বরের মধ্যে তখন ছিল একটা আস্ত ডিম, কাজেই কথা কইবার কোনও শক্তিই তার ছিল না। তবু সেই অবস্থাতেই সে বাঘের মতো লম্ফ ত্যাগ করে বৃন্দা মাঝি ও দরজার মাঝখানে গিয়ে পড়ল। তারপর ডিমটা কোনওরকমে গলাধঃকরণ করে বৃন্দার দুই হাত চেপে ধরে সে বললে, 'আরে চাঁদবদন, যাবে কোথায়? যতক্ষণ না ভারতবাবু ফিরে আসেন, ততক্ষণ এইখানেই তোমাকে অবস্থান করতে হবে। তোমার পেটে আছে আসামির ঠিকানা, আর আমরা তোমায় ছেড়ে দেব? মোটেই নয় স্যাঙাত, মোটেই নয়!'

বৃন্দা ক্রুদ্ধ স্বরে প্রতিবাদ করে বললে, 'আমি কি মগের মুল্লুকে এসেছি বাবু? আমাকে জোর করে ধরে রাখা হবে?'

পুলিশি চালে ভারিক্কে গলায় ধমক দিয়ে গোবিন্দরাম বললে, 'চোপরাও মাঝির পো! চুপ করে ওইখানে বসে থাকো!' বলেই এক ধাক্কায় তাকে বসিয়ে দিলে ঘরের মেঝের উপরে।

বৃন্দা কারপেটের উপরে উঁচু হয়ে বসে বসে নিজের মনেই গজগজ করতে লাগল।

গোবিন্দরাম টেবিলের কাছে ফিরে গিয়ে দ্বিতীয় ডিমটা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে রইল। আমিও আবার মনঃসংযোগ করলুম খবরের কাগজের দিকে।

আচম্বিতে পরিচিত কণ্ঠে শুনলুম,—'বন্ধুগণ, আজকের চা পর্বে আমার আমন্ত্রণ কি বন্ধ?' এ হচ্ছে ভারতের কণ্ঠস্বর!

মুখ তুলে কিন্তু ভারতকে দেখতে পেলুম না। চোখ নামিয়ে দেখি মেঝের উপরে বৃন্দা মাঝির পোশাক পরে বসে রয়েছে বন্ধুবর ভারতচন্দ্র—তখন তার মাথায় নেই টিকি ও উশকোখুশকো চুল এবং মুখেও নেই আধপাকা দাড়িগোঁফ!

বিপুল বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে উঠে গোবিন্দরাম দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে বললে, 'অ্যাঁ, এ কী! বৃন্দা মাঝির ছদ্মবেশে আমাদের ভারতবাবু! কী আশ্চর্য, আপনি আমার মতো ঝানু পুলিশ কর্মচারীকেও বোকা বানিয়ে ছাড়লেন?'

ভারত হাস্যমুখে গাত্রোত্থান করে বললে, 'আমাদের সবাইকেই কোনওদিন না কোনওদিন বোকা বনতেই হয় গোবিন্দরামবাবু। সময় সময় আমরা ঠাকুর দেবতাদেরও বোকা বানাবার চেষ্টা করি।'

—'সে আবার কী?'

—'এই দেখুন না, জাল উইল চালিয়ে দেবার জন্যে ঠাকুর দেবতার দ্বারে জোড়া পাঁঠা মানত করি।'

গোবিন্দরাম পরম কৌতুকে ঘর ফাটিয়ে হাসতে লাগল।

ভারত হঠাৎ মুখের উপরে গাম্ভীর্যের ভার নামিয়ে বললে, 'এখন আর হাসির সময় নেই গোবিন্দরামবাবু, এইবার এসেছে কোমর বেঁধে কাজে নামবার সময়।'

গোবিন্দরামও তৎক্ষণাৎ হাস্য সংবরণ করে গুরুগম্ভীর হয়ে বললে, 'কাজের সময় এসেছে নাকি? তাহলে আমিও এখনই কোমর বাঁধতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু আগে ব্যাপারটা একটু ব্যাখ্যা করে বলুন।'

ভারত ততক্ষণে ছদ্মবাস ত্যাগ করে নিজের জামাকাপড় পরে নিয়েছে। একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ে বললে, 'কাল শেষরাতে ফটিকচাঁদ এসে খবর দিয়ে গিয়েছে, আসামিরা বাসা বেঁধেছে বালি ব্রিজের কাছে একখানা বাগানবাড়িতে। সেই বাগানের সামনে গঙ্গার উপরে বাঁধা আছে সেই একেবারে নতুন মোটরবোটখানা। শুনেই ফটিকচাঁদের সঙ্গে আমিও সেই জায়গাটা পরিদর্শন করতে যাই। আসামিদের জগতে আমি নাকি এখন একজন পরিচিত ব্যক্তি, পাছে কেউ কিছু সন্দেহ করে, সেই ভয়েই মাঝির ছদ্মবেশ ধারণ করতে বাধ্য হয়েছিলুম। বাগানের কাছে গিয়ে যখন পৌঁছলুম, তখন ফুটে উঠেছে ভোরের আলো। বোটখানা চিনে নিতে কিছুমাত্র কষ্ট হল না,—লালপাড় বসানো সবুজ রঙের নতুন বোট। বোটের ভিতরে কেউ আছে কি না বোঝা গেল না, বাগানের ভিতরে বাড়িখানাকেও পোড়ো বাড়ি বলে মনে হল, বাহির থেকে তার কোথাও কোনও জীবনের লক্ষণ দেখলুম না। কিন্তু আমার দৃঢ়বিশ্বাস, ওইখানে গেলেই আসামিদের সন্ধান পাওয়া যাবে।'

গোবিন্দরাম সুদীর্ঘ এক চুমুকে পেয়ালার সবটুকু চা উদরস্থ করে উৎসাহিত কণ্ঠে বলে উঠল, 'তাহলে আর বিলম্ব করে লাভ কী? চলুন, এখনই সদলবলে যাত্রা শুরু করা যাক।'

ঠিক সেই সময় সদর দরজায় একখানা মোটর কি ট্যাক্সি থামার শব্দ। সিঁড়ির উপরে

দ্রুতপদধ্বনি এবং ঘরের মধ্যে ফটিকচাঁদের প্রবেশ। ব্যস্ত কণ্ঠে সে বলে উঠল, 'হুজুর, আসামিরা কিছু সন্দেহ করেছে কি না জানি না, কিন্তু তারা সে বাগান ছেড়ে সরে পড়েছে!'

ভারত উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললে, 'সরে পড়েছে কী রে? তুই কী দেখেছিস?'

—'আপনি চলে আসবার খানিক পরেই আমি দূর থেকে দেখলুম একটা দাড়িওয়ালা খোঁড়া লোক, আর একটা বাঁদরের মতো দেখতে কালো ছোঁড়া সেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে বোটে গিয়ে উঠল। খোঁড়া লোকটার কাঁকালে ছিল একটা তরঙ্গ। তারপরই তারা নোঙর তুলে বোটখানা ছেড়ে দিলে।'

—'ছেড়ে দিলে? বোটখানা কোন দিকে গেল রে?'

—'উত্তর দিকে হুজুর।'

চকিতে গোবিন্দরামের দিকে ফিরে ভারত বললে, 'তাহলে আমাদেরও এখনই আসামিদের পশ্চাদ্ধাবন করতে হবে। গোবিন্দরামবাবু খুব চটপট একখানা পুলিশ লঞ্চের ব্যবস্থা করতে পারবেন?'

—'বিলক্ষণ! তা আবার পারব না?'

—'আর চাই জনকয়েক সশস্ত্র সেপাই।'

—'আলবত! সে কথা বলাই বাহুল্য।'

॥ দশম ॥

পলাতকের পিছনে

লঞ্চে উঠে ভারত আমাকে শুধোলে, 'ভাস্কর, আমরা সকলেই সশস্ত্র। তুমিও কোনও অস্ত্রশস্ত্র সঙ্গে এনেছ নাকি?'

—'তোমাদের দেখাদেখি আমিও এনেছি বই কি! একটা রিভলভার।'

—'ভালো, ভালো, অধিকন্তুতে দোষ নেই। আচ্ছা গোবিন্দরামবাবু! আপনাদের এই লঞ্চখানা বেশ দ্রুতগামী তো?'

—'সে-বিষয়ে সন্দেহ নাস্তি, পোর্ট পুলিশের এই লঞ্চগুলো তৈরি হয় নদীর বুকে অপরাধীদের পশ্চাতে ধাবমান হবার জন্যেই।'

—'তাহলে লঞ্চখানা পূর্ণবেগে চালাবার ব্যবস্থা করুন। জানেন তো আমাদের যেতে হবে উত্তর দিকে?'

গঙ্গার জল কেটে লঞ্চ বেগে ছুটতে লাগল উত্তর দিকে। তখন বেলা প্রায় এগারোটা। গঙ্গার ঘাটে ঘাটে স্নানার্থীদের জনতা। ঘাটের পর ঘাট এবং বাগবাজারের খাল ছাড়িয়ে আমরা ক্রমেই অগ্রসর হতে লাগলুম বালি ব্রিজের দিকে। ক্রমে বাঁয়ে ঘুষুরির ট্যাংক ও বেলুড় মঠের মন্দির এবং ডাইনে ইলেকট্রিক কর্পোরেশনের কারখানা ও পরে বালির ব্রিজ

ও দক্ষিণেশ্বরের মন্দির ছাড়িয়ে লঞ্চ ছুটতে লাগল আরও উত্তর দিকে। লঞ্চের উপরে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়েছিল ছয়জন বন্দুকধারী সেপাই, তারা নদীর অন্যান্য জলযানের যাত্রীদের ত্রস্ত দৃষ্টি আকর্ষণ করতে লাগল। কিন্তু তখনও পর্যন্ত আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করতে পারলে না কোনও সন্দেহজনক পলায়মান নৌকা।

ইতস্তত ব্যগ্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে করতে গোবিন্দরাম বললে, 'আরে মশায়, খুনে বেটারা শেষ পর্যন্ত আমাদের চোখে ধুলো দেবে নাকি?'

ভারত স্থির ভাবে দাঁড়িয়েছিল, সহজ স্বরে বললে, 'সবুর করুন, মেওয়া ফলবেই ফলবে!'

আমি কিন্তু দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত নজর চালিয়েও নদীর উপরে সবুরে মেওয়া ফলবার কোনও লক্ষণই দেখতে পেলুম না। ছোটো-বড়ো অনেক জলযানই আসছে আর যাচ্ছে, কিন্তু তাদের মধ্যে কোথায় সেই সবুজ রঙের উপরে লাল ডোরাটানা নতুন বোট?

চোখে দূরবিন লাগিয়ে ভারত গঙ্গার দুই তীরের উপরেই সাবধানী দৃষ্টি সঞ্চালন করতে লাগল, যদি আর কোথাও নতুন আস্তানা পেয়ে বোটখানা আবার কোনও ঘাটের কাছে নোঙর করা থাকে। কিন্তু কোথাও নেই তার কোনও চিহ্নই।

গোবিন্দরাম চিৎকার করে বললে, 'আরও জোরে লঞ্চ চালাও, আরও জোরে!'

লঞ্চের গতি বেড়ে উঠল অধিকতর।

লঞ্চ ছুটল আরও প্রায় ঘণ্টা দেড়েক ধরে। অবশেষে গোবিন্দরাম হতাশ ভাবে বললে, 'আর বৃথা চেষ্টা! ব্যাটারা কোনও তীরে উঠে চম্পট দিয়েছে?'

ভারত বললে, 'আর বোটখানা তারা বোধহয় ঘাড়ে করে বয়ে নিয়ে গিয়েছে?'

গোবিন্দরাম বললে, 'আপনার এমন সন্দেহ অসঙ্গত নয়, অন্তত আমি হলে তাই করতুম বটে। কিন্তু কেন জানি না আমার মনে হচ্ছে যে, এই বিপদগ্রস্ত পলাতকরা ততখানি উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয় দিতে পারবে না। তারা মনে করবে, কলকাতা ছেড়ে যতই বেশি দূরে গিয়ে পড়বে, ততই বেশি নিরাপদ হতে পারবে। আরে, আরে, খুব দূরে ওটা কী দেখা যাচ্ছে দেখুন দেখি!'

গোবিন্দরাম সাগ্রহে বলে উঠল, 'কী দেখা যাচ্ছে, কী দেখা যাচ্ছে? কই, আমি তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না!'

—'এই নিন, আমার দূরবিনটা চোখে লাগিয়ে দেখুন'। দূরবিনের মধ্য দিয়ে কয়েক মুহূর্ত দৃষ্টি চালনা করেই গোবিন্দরাম লাফ মেরে বলে উঠল, 'মোটরবোট! মোটরবোট! একখানা সবুজ রঙের মোটরবোট! সোঁ সোঁ করে জল কেটে ছুটে যাচ্ছে। এই! আরও জোরে লঞ্চ চালাও—যত জোরে পারো!'

এইবারে আমিও দূরবিনটা হস্তগত করে চোখে লাগিয়ে দেখলুম, গঙ্গার মাঝখানটা ফেনোচ্ছ্বাসে চিহ্নিত করে একখানা সবুজ রঙের মোটর বোট সত্যসত্যই দ্রুতবেগে ভেসে চলেছে।

বিপুল আনন্দে উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটোছুটি করতে করতে গোবিন্দরাম চিৎকার করতে

লাগল, 'জোরে চালাও, আরও জোরে, আরও জোরে! বেটাদের এইবারে হাতের কাছে পেয়েছি,—আর যায় কোথায়, এবার বধিব ঘুঘু তোমার পরান!'

ভারত হেসে ফেলে বললে, 'ওদের হাতের কাছে পেয়েছেন বটে, কিন্তু এখনও মুঠোর ভিতরে পাননি! আপনার দাপাদাপিতে লঞ্চখানা টলমলিয়ে উঠছে, শেষটা টাল সামলাতে না পেরে আপনিও ঝপাং করে জলের ভিতরে পড়ে যেতে পারেন, সুতরাং হুঁশিয়ার!'

গোবিন্দরাম তৎক্ষণাৎ লম্ফঝম্প বন্ধ করে বললে, 'ঠিক বলেছেন ভারতবাবু, জলের ভেতর পড়লে আমার আর রক্ষে নেই! আমি একটুও সাঁতার জানি না, জলে পড়লে একেবারে চোঁ চোঁ করে তলায় গিয়ে হাজির হব।'

লঞ্চ তখন জল কাটতে কাটতে ছুটে চলেছে রীতিমতো উদ্দাম বেগে—আহত গঙ্গা প্রতিবাদ করতে লাগল কলকল্লোলে একটানা!

আসামিদের বোটখানাও খুব জোরে ছুটছিল বটে, কিন্তু তার গতি তারা আরও বেশি বাড়াতে পারলে না। লঞ্চ আর বোটের ব্যবধান ক্রমেই কমে আসতে লাগল। অবশেষে তার গতিবিধি লক্ষ করবার জন্যে আর আমাদের দূরবিনের দরকার হল না, নগ্ন চোখেই স্পষ্ট দেখা যেতে লাগল তার সমস্ত খুঁটিনাটি।

গোবিন্দরাম উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে চিৎকার করে বলে উঠল, 'আর কোথায় পালাবে চাঁদ, তোমার কাল পূর্ণ হয়েছে! এখন নৌকো থামিয়ে ভালোমানুষের মতো লোহার বালা পরবে এসো!'

আমি বললুম, 'একজোড়া নয় গোবিন্দবাবু, দু-জোড়া লোহার বালা দরকার। নৌকার ভিতরে অন্তত দুজন আসামি আছে।'

গোবিন্দরাম বললে, 'কিন্তু একটারও টিকি দেখতে পাচ্ছি না যে!'

ভারত বললে, 'আমি কিন্তু দেখতে পাচ্ছি। বোট যে চালাচ্ছে সেই-ই হচ্ছে প্রথম আসামি। ওর মুখের কালো দাড়ির গোছা জোর বাতাসে হু হু করে উড়ছে! ভাস্কর, শ্যামলালবাবুর মুখে শুনেছ তো, তাঁর বাবা যেদিন আতঙ্কে মারা যান, সেদিন ঘরের জানলায় দেখা গিয়েছিল একটা দাড়িওয়ালা লোককে? বোটের চালক সে ছাড়া আর কেউ নয়। ওরই নাম সুজন সাহু। কিন্তু এখনও আমাদের আন্দামানি বন্ধুটি দর্শন দিলে না কেন? ফুকনি থেকে ফুঁ দিয়ে বিষাক্ত শলাকা ছুড়ে সেই তো কামলালকে বধ করেছিল!'

ততক্ষণে লঞ্চখানা একেবারে বোটের কাছে এসে পড়েছিল। আর একটু পরেই লঞ্চ থেকে তার উপরে লাফিয়ে পড়া চলবে।

গোবিন্দরাম হুঙ্কার দিয়ে বললে, 'এই উল্লুকের বাচ্চারা! আর তোদের রক্ষে নাই, ভালো চাস তো এখনও আত্মসমর্পণ কর।'

ভারত বললে, 'দ্যাখো, দ্যাখো, দ্যাখো! এইবারে আমাদের আন্দামানি বন্ধু আত্মপ্রকাশ করতে উদ্যত হয়েছে!'

দেখলুম একটা নয়-দশ বছরের বালকের মতো ছোটো মূর্তি হঠাৎ বোটের পাটাতনের উপরে এসে আবির্ভূত হল। মাথায় সে বালকের মতো বটে, কিন্তু বয়সে নিশ্চয়ই প্রৌঢ়।

আবলুশ কাঠের মতো কুচকুচে কালো রং, বুকের ও হাতের উপরে মাংসপেশিগুলো ভিতর থেকে ঠেলে ঠেলে উঠছে এবং তার কুৎকুতে দুই চক্ষুর ভিতর দিয়ে ফুটে বেরুচ্ছে যেন হিংস্র কেউটের মতো আগুনের ফিনকি!

ভারত তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'সাবধান, সবাই সাবধান! সামনে এসেছে মূর্তিমান মৃত্যু!'

গোবিন্দরাম বললে, 'কেন, বিপদ আবার কীসের? ও বাঁদরটার হাতে তো দেখছি খালি একটা লাঠি রয়েছে।'

ভারত বললে, 'ওটাকে লাঠি বলে ভ্রম করবেন না গোবিন্দবাবু! ওর ভিতরটা ফুকনির মতো ফাঁপা। ওই ফুকনির মাঝে থাকে বিষমাখানো শলা! ফুঁ দিয়ে ওইরকম শলা ছুড়েই লোকটা কামলালবাবুকে খুন করেছে! সুতরাং সাবধান!'

আমি সভয়ে বললুম, 'আরে, আরে, ফুকনিটা যে ও চট করে মুখের উপর তুলে ধরলে!'

ভারত হুমড়ি খেয়ে বসে পড়ে বললে, 'সবাই বসে পড়ো, সবাই বসে পড়ো! শলাকা এখনই ছুটে আসবে,—ওদের লক্ষ্য অব্যর্থ!'

ভারতের মুখের কথা শেষ হবার আগেই গোবিন্দরামের সঙ্গে আমিও নিচু হয়ে বসে পড়লুম।

পরমুহূর্তেই গোবিন্দরামের হাতের রিভলভার গর্জন করে উঠল এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই আন্দামানিটা বিকট চিৎকারে চারিদিকে কাঁপিয়ে শূন্যে দুই হাত ছড়িয়ে ঝুপ করে গঙ্গার উপরে পড়ে জলের তলায় অদৃশ্য হয়ে গেল!

ভারত দাঁড়িয়ে উঠে গোবিন্দরামের মাথা থেকে টুপিটা খুলে নিয়ে বললে, 'দেখুন একবার ব্যাপারটা!'

আমরা স্তম্ভিত নেত্রে দেখলুম, টুপির শীর্ষদেশে বিদ্ধ হয়ে রয়েছে একটা শলাকার খানিকটা!

গোবিন্দরাম হাঁপাতে হাঁপাতে ত্রস্ত স্বরে বললে, 'বাপ রে, গঙ্গায় এসে এখনই আমার গঙ্গাযাত্রা হয়েছিল আর কী!' বলতে বলতে লাফিয়ে উঠে প্রচণ্ড ক্রোধে চিৎকার করে উঠল—'এক বেটা পটল তুলেছে, কিন্তু আর এক দুরাত্মা এখনও বেঁচে আছে! ওকে আর পটল তুলতে দেওয়া নয়, সবাই বোটের উপরে লাফিয়ে পড়ে ওর গলা টিপে ধরো!'

ভারতও চেঁচিয়ে বললে, 'সুজন সাহু! আর পালাবার চেষ্টা বৃথা, এইবারে আত্মসমর্পণ করো!'

সুজন সাহু ভারতের কথা শুনতে পেলে কি না জানি না, কিন্তু বোটখানা আচমকা সাঁৎ করে ঘুরে গঙ্গার তীরের দিকে তিরবেগে ছুটে চলল। এজন্যে আমাদের লঞ্চ প্রস্তুত ছিল না, মোড় ফিরে বোটের পিছু ধরতে তার কয়েক মুহূর্ত দেরি হয়ে গেল।

ইতিমধ্যে বোটখানা আরও খানিকটা আগ বাড়িয়ে সোজা ছুটল গঙ্গাতীরের দিকে।

গোবিন্দরাম উদ্বিগ্ন স্বরে বললে, 'কী আপদ! আমার জাল ছিঁড়ে শ্যামলাল পালিয়েছে,

আবার এ ব্যাটাও ঘাটের কাছে এসে পালিয়ে যাবে নাকি? জোরসে চালাও লঞ্চ—আসামি ভাগতা হ্যায়, হুঁশিয়ার!'

কিন্তু বোটখানা ধরা পড়বার আগেই হুড়মুড় করে সশব্দে গঙ্গার একটা আঘাটার উপরে গিয়ে আছড়ে পড়ল এবং ঠিক তার আগেই বোটের ভিতর থেকে এক লাফ মেরে সুজন সাহু গিয়ে অবতীর্ণ হল গঙ্গাতটের উপরে। কিন্তু সেখানে ছিল কর্দমাক্ত নরম মাটি এবং তারই ভিতরে প্রোথিত হয়ে গেল সুজনের কাঠের পাখানার প্রায় সবটা। সে যখন মুক্তি পাওয়ার জন্যে প্রাণপণে মাটির সঙ্গে ধস্তাধস্তি করছে, সেই সময়ে পাহারাওয়ালারা লঞ্চ থেকে তার উপরে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

সুজন সাহু বন্দি।

॥ একাদশ ॥

রত্নসিন্দুক অধিকার

বোটের ভিতর থেকে রত্নের বাক্সটা লঞ্চের উপরে এনে স্থাপন করা হল। বাক্সের ডালা ছিল তালাবন্ধ।

গোবিন্দরাম ধমক দিয়ে বললে, 'এই রাসকেল! বাক্সের চাবি কোথায়?'

সুজন বললে, 'চাবি গঙ্গার তলায়', বলেই সে কর্কশ স্বরে হা হা হা হা করে অট্টহাস্য করতে লাগল!

এই অসাময়িক হাসির বহর দেখে গোবিন্দরাম বিস্মিত হয়ে বললে, 'আরে মোলো, হাতকড়া পরে আবার হা হা করে হাসি হচ্ছে? একটু সবুর করো না, গুঁতোর চোটে বাবা বলতে হবে!'

ভারত বললে, 'সুজন, চুরি করতে এসে তুমি মানুষ খুন করলে কেন?'

সুজন হাসি থামিয়ে বললে, 'কে মানুষ খুন করেছে? আমি মানুষ খুন করিনি। খুন করেছে ওই তোঙ্গা হতভাগা!'

—'তোঙ্গা! ওটা বুঝি ওই আন্দামানিটার নাম?'

—'হ্যাঁ, আমার বিশ্বস্ত চাকর তোঙ্গা। কিন্তু সে যদি বোকার মতো ওই খুনটা না করত, তাহলে আজ তোমরা আমাকে গ্রেপ্তার করতে আসতে না।'

গোবিন্দরাম বললে, 'আসতুম না মানে? চোর ধরাই তো আমাদের পেশা!'

সুজন মৃদু হাস্য করে বললে, 'এখানে আসল চোর যে কে, সেইটেই হচ্ছে কথা। ওই গুপ্তধনের বাক্সটা অন্তত চারশো বছরের পুরোনো, ওটা ছিল রানি দুর্গাবতীর সম্পত্তি। রামচন্দ্র সিংহ আমাদের চোখে ধুলো দিয়ে ফাঁকতালে বাক্সটা দখল করেছিল। ওই গুপ্তধন আমাদের হাতে এলে রামবাবু কি তার ছেলেরা কেউ পুলিশে খবর দিতে পারত না। কারণ আইনে গুপ্তধনের দখলিস্বত্ব হয় সরকারেরই, কাজেই গুপ্তধন যে তাদের হাতছাড়া হয়ে

গেছে, পুলিশের কাছে এ খবর পৌঁছত কেমন করে? থানায় খবর দিলে, আগে তো তাদেরই জবাবদিহি করতে হত, কেন তারা সরকারের সম্পত্তি এতদিন লুকিয়ে রেখেছিল?'

গোবিন্দরাম বললে, 'আচ্ছা, ওই রত্নসিন্দুকটা কার সম্পত্তি সেসব নিয়ে পরে মাথা ঘামানো যাবে অখন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ওই সম্পত্তির সন্ধান তুমি পেলে কেমন করে?'

সুজন বললে, 'সন্ধান পেলুম কেমন করে? সে অনেক কথা, সবিস্তারে বলবার ধৈর্য কি আগ্রহ আমার নেই। তবে নিতান্তই যদি শুনতে চান, মোদ্দা কথাগুলো বলতে পারি সংক্ষেপে।'

গোবিন্দরাম বললে, 'স্কুল কলেজেও ইতিহাসকে আমি ঘৃণা করতুম। তোমার মুখে কোনও দীর্ঘ ইতিহাস শুনতে আজও আমি রাজি নই। বেশ, তুমি সংক্ষেপেই বলো। ভারতবাবু, একটা সিগারেট ইচ্ছা করেন। ভাস্করবাবু তো এ রসে বঞ্চিত বলেই জানি।'

আমরা তিনজনে একখানা আসন টেনে নিয়ে সুজন সাহুর সামনে বসে পড়লুম। ভারত ও গোবিন্দরাম নিজের নিজের সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করলে। সুজন ধীরে ধীরে বলতে লাগল, 'উত্তর প্রদেশের বীরাঙ্গনা রানি দুর্গাবতীর নাম ভারতের ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছে। গড়মণ্ডলে ছিল তাঁর রাজধানী। বাদশাহ আকবর তাঁর রাজ্য অধিকার করতে এলে, তিনি সসৈন্যে বাধা দেন। যুদ্ধযাত্রা করবার সময় তিনি রাজধানী ছেড়ে যখন বেরিয়ে আসেন, তখন নিজের অনিশ্চিত পরিণামের কথা ভেবে পথিমধ্যে তাঁর এক বাগানবাড়ির ভিতরে মাটির তলায় নিজের এই রত্নসিন্দুকটা পুঁতে রেখে যান। আকবরের সঙ্গে যুদ্ধে অতুলনীয় বীরত্ব দেখিয়ে রানি দুর্গাবতী যে রণক্ষেত্রেই প্রাণত্যাগ করেন ইতিহাসে সে কথা স্পষ্ট ভাষাতেই লেখা আছে। তারপর কেটে যায় শতাব্দীর পর শতাব্দী। রানি দুর্গাবতীর সেই উদ্যান-প্রাসাদকে গভীর অরণ্য আত্মসাৎ করে ফেলে। ক্রমে লোকে তার কথা ভুলে যায় এবং সেই গুপ্তধনের গুপ্তকথাও ঢাকা পড়ে যায় মাটির তলাতেই।

'এইবারে নিজের একটুখানি পরিচয় না দিলে চলবে না। যে সুনিপুণ গোয়েন্দা আমাকে গ্রেপ্তার করেছেন তাঁর কাছে আত্মগোপন করেও লাভ নেই। প্রথম যৌবনে আমি ছিলুম এক দস্যুদলের সর্দার। বাংলা, বিহার ও উত্তর প্রদেশের নানা জায়গায় ডাকাতি করে বেড়াতুম। সেই সময়ে জব্বলপুরের কাছে আমরা এক ধনী গৃহস্থের বাড়ি হানা দিই। বাড়ির কর্তাকে যখন হত্যা করতে উদ্যত হই, তখন সে কাকুতিমিনতি করে জানায়, আমরা যদি তাকে প্রাণে না মারি, তাহলে সে আমাদের এক অগাধ গুপ্তধনের সন্ধান দিতে পারে। আমরা তাকে অভয় দিই। তারপর তার কাছ থেকে পাই রানি দুর্গাবতীর সেই গুপ্তধনের একখানা নকশা আঁকা কাগজ! শুনলুম ওই নকশার যেখানে ত্রিশূলের চিহ্ন আছে, সেইখানটা খুঁড়লেই গুপ্তধনের সন্ধান পাওয়া যাবে। কিন্তু নকশাখানা আমাদের হাতে সমর্পণ করেও সেই হতভাগ্য গৃহস্থ নিজের প্রাণরক্ষা করতে পারলে না। আমার বিনা অনুমতিতেই আমাদের দলের এক দুরাত্মা বন্দুক ছুড়ে তাকে হত্যা করে। সেই হত্যাকাণ্ড আর ডাকাতির পরে আমরাও আত্মরক্ষা করতে পারলুম না, আমার আর তিনজন সঙ্গীর সঙ্গে আমিও ধরা পড়লুম পুলিশের হাতে। সেই তিনজন সঙ্গীর নাম হচ্ছে

আবদুল্লা খাঁ, দোস্ত মহম্মদ আর হাজি মহম্মদ। বিচারে আমাদের প্রতি বিশ বৎসর দ্বীপান্তর বাসের হুকুম হয়।

'আমরা আন্দামানে নির্বাসিত হয়ে বন্দি জীবন যাপন করতে থাকি। সেই ভাবে কেটে যায় দশ বৎসর কাল। তখনও বাকি ছিল আরও দশ বৎসর। কিন্তু অতদিন যে আমরা বেঁচে থাকব, এমন আশা আমাদের পক্ষে ছিল দুরাশা। তবু মানুষ আশা থেকে একেবারে বঞ্চিত হয়ে থাকতে পারে না। গুপ্তধনের নকশা এখনও পর্যন্ত আমরা সযত্নে রক্ষা করে আসছিলুম। কেবল তাই নয়, আমরা আন্দামানে গিয়েই চারজনে মিলে একসঙ্গে প্রতিজ্ঞা করেছিলুম যে যদি কখনও দেশে ফিরি, আর এই গুপ্তধন লাভ করতে পারি, তাহলে তা চারভাগে ভাগ করে ভোগ করব আমরা চারজনেই। নকশার উপরে লেখা রইল চারজনের নাম আর চারজনের ঢ্যারাসই!

'আন্দামানে বারো বৎসর বাস করবার পর ঘটল এক দুর্ঘটনা, হঠাৎ মড়ক দেখা দিল, আর একে একে মারা পড়ল আমার তিন মুসলমান সঙ্গীই। আমি বেঁচে গেলুম বটে, কিন্তু মনে মনে আমারও বড়ো ভয় হল, এই পাণ্ডববর্জিত দেশে আরও কিছুকাল থাকলে আমাকেও হয়তো কোনওদিন এদেরই মতো ইহলোক থেকে সরে পড়তে হবে।

'এই দুর্ভাবনা ভাবতে ভাবতে হাল যখন প্রায় ছেড়েই দিয়েছি, তখন হঠাৎ আমার মাথায় এল এক বুদ্ধি। পরে বুঝেছি সেটা বুদ্ধিমানের সুবুদ্ধি নয়, নির্বোধের দুর্বুদ্ধি।

'সেখানকার পদস্থ পুলিশ কর্মচারী ছিলেন রামচন্দ্র সিংহ, আর নরেন্দ্রনাথ রায় ছিলেন সরকারি ডাক্তার!

'তাঁরা দুজনে যে অভিন্নহৃদয় বন্ধু ছিলেন, এ কথা সেখানে সকলেই জানত। নরেনবাবুকে আমার খুব ভালো লাগত। মানুষ হিসাবেও তিনি ছিলেন মহৎ, আর কয়েদিদের সঙ্গে ব্যবহারেও প্রকাশ পেত তাঁর স্নেহ ও সদাশয়তা। আমি পুরাতন রক্ত আমাশয় রোগে ভুগছিলুম, তিনি খুব যত্নের সঙ্গে আমার চিকিৎসা করতেন। সেই সময় একদিন তাঁর কাছে আমি চুপি চুপি গুপ্তধনের কথা হাসিল করে ফেললুম। তাঁকে বললুম, 'এখানে থাকলে আমি আর বাঁচব না, আপনি যদি রামচন্দ্রবাবুর সঙ্গে ব্যবস্থা করে আমাকে কোনওগতিকে খালাস করতে পারেন, তাহলে এই গুপ্তধন আমরা তিনজনেই ভাগ করে নিতে পারব।'

'তারপরে খবর পেয়ে রামচন্দ্রবাবুও আমাদের সঙ্গে গোপনে দেখা করলেন। তাঁর সঙ্গে কয়েকদিন ধরে আমার যেসব পরামর্শ চলল, এখানে সমস্ত খুলে বলবার দরকার নেই, শেষ পর্যন্ত তিনি জানালেন, এক শর্তে তিনি আমার মুক্তির ব্যবস্থা করতে পারেন : আগে নকশাখানা তাঁর হাতে সমর্পণ করতে হবে। সেই শর্তে রাজি হবার ইচ্ছা আমার ছিল না। কিন্তু তখন আমি নিরুপায়, জলমগ্ন মানুষ যেমন খড়কুটো আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চায়, আমারও অবস্থা ছিল কতকটা সেই রকম। বোকার মতো বিশ্বাস করে নকশাটা তাঁরই হাতে দিলুম।

'তখনও আমি জানতুম না যে, রামচন্দ্রবাবুর কার্যকাল ফুরিয়ে এসেছে, তিনি পেনশন নিয়ে শীঘ্রই দেশে ফিরে যাবেন। তারপর কবে যে তিনি আন্দামান ত্যাগ করেন প্রথমটা তাও আমি জানতে পারিনি।

'সে খবর পেলুম পরে নরেনবাবুর মুখেই। তখন নিষ্ফল আক্রোশে নিজের বুদ্ধিকে ধিক্কার দেওয়া ছাড়া আমার আর কিছুই করবার ছিল না। বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতায় নরেনবাবুও অত্যন্ত দুঃখিত ও লজ্জিত হয়েছিলেন। আমার কাছে ক্ষমা চেয়ে বললেন, 'সুজন, জেনে রাখো, এই অন্যায়ের ভেতরে আমার কোনও হাত নেই। রাম যে এমন জঘন্য কাজ করতে পারে, এটা ছিল আমারও ধারণার অতীত'—বলতে বলতে তাঁর চোখে এসেছিল অশ্রুজল।

'তারপর থেকে আর একটা ব্যাপার লক্ষ করতে লাগলুম। মুক্তি পাওয়া তো দূরের কথা, আমার বন্দিত্বের বন্ধন হয়ে উঠল আরও কঠোর, আরও সুদৃঢ়। বুঝতে বিলম্ব হল না যে, এরও মধ্যে ছিল রামচন্দ্রবাবুর চক্রান্ত। তিনি বোধহয় চেয়েছিলেন আন্দামানেই আমার জীবনের উপরে পড়ে যাক চরম যবনিকা।

'যাই হোক, রামচন্দ্রের আন্দামান ত্যাগের বছর দুই পরেই নরেনবাবুরও কার্যকাল ফুরিয়ে যায়। তিনিও দেশে ফেরেন, কিন্তু ফেরবার আগে আমার সঙ্গে দেখা করে বলে আসেন, 'সুজন, তোমাকে খালাস করবার শক্তি আমার নেই বটে, কিন্তু তোমার জন্যে একটা চেষ্টা আমি করবই। গুপ্তধনের আসল নকশাখানা আমার কাছেই আছে। রামচন্দ্র নিয়ে গেছে খালি তার নকলটা। আমার কথায় তুমি বিশ্বাস করো, ভগবানের নাম নিয়ে আমি শপথ করছি, সেই নকল নকশা দেখে রামচন্দ্র যদি গুপ্তধন পেয়েও থাকে, তবু তুমি তার ভাগ থেকে বঞ্চিত হবে না।'

'তারপর আমার আর বিশেষ কিছুই বলবার নেই। যথাসময়ে মুক্তি পেয়ে নরেনবাবুর শোচনীয় মৃত্যুর কিছু পরে আমিও দেশে ফিরে কলকাতায় এসে আস্তানা পাতি। তারপর একে একে সমস্ত খবরই শুনতে পাই। বেশ বুঝতে পারি, রামবাবুর সঙ্গে আমার পক্ষ নিয়ে কথা কইতে-কইতেই নরেনবাবু মারা পড়েন। আমিও মনে মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করি, আমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা আর নরেনবাবুর অকালমৃত্যুর জন্যে আমিও প্রতিশোধ না নিয়ে ছাড়ব না। যেমন করে পারি সমস্ত গুপ্তধন আবার আমি হস্তগত করবই। সেই প্রতিজ্ঞা করবার পর থেকে আমি ছায়ার মতন রামবাবুর পিছনে পিছনে লেগেছিলুম। তারপর কেমন করে তাঁর মৃত্যু হয় সে কথাও আপনারা জানেন বোধ হয়। তাঁর মৃত্যুর পরেও আমি শ্যামলাল আর কামলালের সমস্ত খবর রাখতুম নখদর্পণে, কেমন করে রাখতুম সে কথা এখন আর না বললেও চলবে। কামলাল গুপ্তধন পুনরাবিষ্কার করেছে, তাও আমি ঠিক সময়ে জানতে পেরেছিলুম। আরও অনেক কিছুই জেনেছিলুম, নিজেও অনেক কিছুই করেছিলুম, কিন্তু সব কথা বলতে আমার আর ভালো লাগছে না। আসল ব্যাপার শুনলেন তো, এইবারে আমাকে একটু বিশ্রাম করতে দিন।'

॥ দ্বাদশ ॥

রত্নসিন্দুকের রত্ন

থানায় আজ সেই রত্নসিন্দুক খোলা হবে।

ভারত বলেছে গুপ্তধনের খানিক অংশ আইনত যখন চিত্রাদেবীর প্রাপ্য, তখন সিন্দুকটা খোলা উচিত তাঁরই সামনে। সেই খবর বহন করে খবরদার রূপে আমি গেলুম চিত্রার বাসায়।

কমলাদেবীর আনন্দ আর ধরে না। মুক্তকণ্ঠে হাসতে হাসতে তিনি বললেন, 'ওরে চিত্রা, গুপ্তধনের মালিক হলে, তুই কি আর তোর এই গরিব পিসিকে মনে রাখবি? হয়তো কোথাকার কে এক মাগী বলে তোর দারোয়ান দরজা থেকেই আমাকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেবে!'

চিত্রা গম্ভীরভাবে মৃদুকণ্ঠে বললে, 'পিসিমা, তুমি বাজে বোকো না।'

অদ্ভুত তরুণী এই চিত্রা! গুপ্তধন পাওয়া যাবার পরেও তার কোনওই ভাবান্তর আমি লক্ষ করিনি। যেন সে এসব ধর্তব্যের মধ্যেই গণ্য করে না! মনে মনে প্রথমটা আমার সন্দেহ হয়েছিল, মেয়েরা অভিনয় করতে ভালোবাসে, এও হচ্ছে তার অভিনয়। মনের কথা মুখে সে প্রকাশ করতে প্রস্তুত নয়। পরে বুঝেছিলুম, আমার সন্দেহের কোনওই মূল্য নেই।

কিন্তু আর একটা কথা ভেবে বুকের ভিতরে আমি ব্যথা অনুভব করেছিলুম। আজই হয়তো ফুরিয়ে যাবে চিত্রার সঙ্গে আমার সকল সম্পর্ক। প্রথমত, মামলার কিনারা হয়ে গেলে পর তার সঙ্গে দেখা করবার কোনও ওজরই আমার থাকবে না। তার উপরে চিত্রা কুমারী ও বিপুল বৈভবের অধিকারিণী। এখন তার সঙ্গে মেলামেশা করতে গেলে নানা লোকের মুখে শোনা যাবে নানান কথা। কেউ কেউ হয়তো মুখ ফুটেই বলতে ছাড়বে না,—বামন হয়েও আমি চাঁদ ধরবার ফিকিরে আছি।

কিন্তু একটা সত্য ভগবান জানেন, আর জানে আমার অন্তরাত্মা। চিত্রা যদি গরিবের ঘরের অনাথা অসহায়া মেয়েও হত, তাহলেও সমস্ত হৃদয়মন দিয়ে তাকে গ্রহণ করবার জন্যে আমি এমনি লালায়িত হয়েই থাকতুম।

চিত্রা আমার মনের কথা জানে না। তাকে জানাবার কোনও সুযোগও আমি পাইনি। আমি তাকে জানালেও আমার মুখের কথাকে সে মনের কথা বলে বিশ্বাসই বা করবে কেন?

কিন্তু তবু আমার মন হতাশ হতে চায় না। এক-এক বার হঠাৎ চোখ তুলে দেখেছি, অজানা এ করুণ আবেদন ভরা দৃষ্টি নিয়ে চিত্রা তাকিয়ে আছে আমার মুখের পানে। তার সঙ্গে চোখাচোখি হলেই তাড়াতাড়ি অপ্রস্তুত ভাবে সে চোখ নামিয়ে নিত এবং তার দুই শুভ্র কপোলে ছড়িয়ে পড়ত লজ্জা গোলাপের সুমধুর আভাস। সে যেন চোরের ধরা পড়ে যাওয়া ভাবের মতো।

এমনি আরও কোনও কোনও ভাবভঙ্গি দেখে আমার সন্দেহ হয়েছে যে চিত্রা আমাকে

পছন্দ করে। কিন্তু এ সন্দেহের উপর আমি বেশি ঝোঁক দিতে চাই না। অধিকাংশ পুরুষেরই এটা একটা দুর্বলতার মতো। এমনকি অনেক কুৎসিত পুরুষও মনে করে, তাকে দেখলেই মেয়ের দল ভালো না বেসে থাকতে পারে না। কার্যক্ষেত্রে এই দুর্বলতার উপরে ঝোঁক দিতে গিয়ে অনেককেই যে রূঢ় আঘাত পেতে হয়েছে, এ কথাও আমার কাছে অবিদিত নয়।

গাড়িতে যেতে যেতে চিত্রা আমাকে বললে, 'গোবিন্দবাবুর মত নিয়েই আপনি আমাকে থানায় নিয়ে যাচ্ছেন তো?'

আমি হাসতে হাসতে বললুম, 'সত্যি কথা বলতে কী, গোবিন্দবাবু প্রথমটায় আমাদের প্রস্তাবে রাজি হননি। কিন্তু ভারত যখন বিশেষ জোর দিয়ে বললে, 'এ মামলা হচ্ছে আমার মামলা, আর এ মামলার ভার পেয়েছি আমি চিত্রাদেবীর কাছ থেকেই। সরকারি পুলিশের কোনও সাহায্য না নিয়েই আমি এই মামলার নিষ্পত্তি করতে পেরেছি, আর পুলিশের বিনা সাহায্যেই আসামিকে অনায়াসেই আমি গ্রেপ্তার করতে পারতুম। সুতরাং এখানে চিত্রাদেবীর উপস্থিতি অত্যন্ত দরকার। আর আপনারই বা আপত্তি করবার কারণ কী? আমি তো থাকব যবনিকার অন্তরালে। আপনার ভাগ্যে ফাঁকতালে লাভ হবে তো মামলার যা কিছু বাহাদুরি!' ভারতের কথা শুনে গোবিন্দবাবু শেষটা আর রাজি না হয়ে পারেননি।'

চিত্রা ধীরে ধীরে শান্ত স্বরে বললে, 'ভাস্করবাবু, আমার একটা কথা বিশ্বাস করবেন কি? এই গুপ্তধন লাভ করবার জন্যে আমার মন একটুও ইচ্ছুক নয়।'

আমি সবিস্ময়ে বললুম, 'সে কী! কেন?'

চিত্রা বললে, 'ভেবে দেখুন ভাস্করবাবু, এই গুপ্তধনের জন্যে যে কয়জন লোক লুব্ধ হয়েছিল, এক সুজন সাহু ছাড়া তাদের কেউ আর বেঁচে নেই। সুজনকেও হতে হয়েছে আজ খুনের আসামি। তারও কপালে কী আছে তা বলা যায় না। আমার হাতে গুপ্তধন আসবে, এ কথা ভেবেই আমার অত্যন্ত ভয় হচ্ছে!'

—'চিত্রা, এটা তোমার কুসংস্কার ছাড়া আর কিছুই নয়।'

—'কুসংস্কার বলতে চান বলুন। কিন্তু আমার বিশ্বাস, ওই গুপ্তধনের উপরে আছে রানি দুর্গাবতীর অভিশাপ। শুনেছি যকের ধনের উপরেও নাকি এইরকম অভিশাপ থাকে। কোনও অনধিকারী তা হস্তগত করতে গেলেই মারা পড়ে। আমারই বা এই গুপ্তধনের উপরে কী অধিকার আছে? মহীয়সী বীর ললনা রানি দুর্গাবতী, ভারত-নারীর মুখ যিনি উজ্জ্বল করে গিয়েছেন, সেই প্রাতঃস্মরণীয়া নারীর নিজস্ব সম্পত্তি আজ আমরা চাইছি চোরের মতন দখল করতে! কেবল রানি দুর্গাবতীর নয় ভাস্করবাবু, ওই গুপ্তধনের উপরে আছে ভগবানের অভিশাপ! যে ওকে স্পর্শ করবে তাকে মরতেই হবে! আমি বাঁচতে চাই, আমি গুপ্তধন চাই না।'

গাড়ি থানার দরজায় এসে পৌঁছুল। থানায় প্রবেশ করে দেখলুম, ঘরের ভেতরে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে ভারত ও গোবিন্দরাম এবং তাদের সামনেই মেঝের উপরে বসানো আছে গুপ্তধনের সেই সিন্দুকটা।

ভারত উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'চিত্রাদেবী উপস্থিত। গোবিন্দবাবু, এইবারে তোরঙ্গটা খোলবার চেষ্টা করুন।'

চিত্রাকে পাশের একখানা চেয়ারে বসিয়ে আমিও আসন গ্রহণ করলুম। গোবিন্দরামের হুকুমে একটা শাবল নিয়ে একজন পাহারাওয়ালা ঘরের ভিতরে প্রবেশ করল।

গোবিন্দরাম বললে, 'তালার কাছে শাবলের চাড় দিয়ে খুলে ফ্যালো তোরঙ্গটা।'

পাহারাওয়ালা তাই করলে। তালাটা ভেঙে গেল সশব্দে। গোবিন্দরাম তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে তোরঙ্গের ডালাটা তুলে ধরতে গেল।

আমি চিত্রার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে দেখলুম। সত্য-সত্যই সে ভয় পেয়েছে! তার মুখ প্রায় মৃতের মতো সাদা, আর তার দুই চক্ষু মুদ্রিত।

তোরঙ্গের ডালাটা একটানে খুলে ফেলে তার মধ্যে দৃষ্টিচালনা করে গোবিন্দরাম মহাবিস্ময়ে বলে উঠল, 'কী আশ্চর্য! তোরঙ্গের ভেতরে এগুলো সব কী?'

আমরাও সাগ্রহে ঝুঁকে পড়ে দেখলুম। তোরঙ্গের মধ্যে ধনরত্ন কিছুই নেই, আছে কেবল কতকগুলো লোহালক্কড়!

ভারত হাস্যমুখে বললে, 'খুনের দায়ে ধরা পড়েও সুজনকে হাসতে দেখে আমারও কেমন একটা সন্দেহ হয়েছিল। সে আমাদের ফাঁকি দিয়েছে—ধনরত্নগুলো সরিয়ে ফেলেছে!'

দুইজন পাহারাওয়ালা সুজন সাহুকে ঘরের ভিতরে এনে হাজির করলে। সে তখন হাসতে হাসতে যেন গড়িয়ে পড়তে চায়।

গোবিন্দরাম আরও বেশি খাপ্পা হয়ে বললে, 'হাসতে ভয় হচ্ছে না তোর? দাঁড়া-না, এখুনি মজাটা টের পাবি!'

সুজন আরও জোরে হো হো করে হেসে বলে উঠল, 'কী মজাটা আর দেখাতে চাও? খুনের দায়ে ধরা পড়েছি, কথায় বলে, মড়ার বাড়া গাল নেই! সমুদ্রে ডুবে শিশিরে কে ভয় পায়?'

রুদ্ধ আক্রোশে কাঁপতে কাঁপতে গোবিন্দরাম বললে, 'তোরঙ্গের মালপত্তরগুলো কোথায় রেখেছিস?'

সুজন খুব সহজ ভাবেই বললে, 'গঙ্গার তলায়।'

—'কী!'

—'মণি মুক্তো হিরে জহরত সব আমি গঙ্গার জলে ফেলে দিয়েছি।'

—'ফেলে দিয়েছিস!'

—'হ্যাঁ।'

—'কোথায়?'

—'মোটরবোট চালাতে চালাতে মাইল পাঁচেক আসবার পর সেগুলো সব যেখানে সেখানে ছড়াতে ছড়াতে এসেছি।'

ভারত কঠিন স্বরে বললে, 'এতটা পরিশ্রম করবার কারণ?'

স্থির দৃষ্টিতে ভারতের মুখের পানে তাকিয়ে সুজন বললে, 'বুঝতে পারছি, আমি

তোমার জন্যেই ধরা পড়েছি। পুলিশ আমাকে কিছুতেই গ্রেপ্তার করতে পারত না। যখন দেখলুম পুলিশ আমার পিছনে তাড়া করেছে, তখনই স্থির করলুম, যে-গুপ্তধন আমার ভোগে লাগল না, আমি তা আর কারুর ভোগেই লাগতে দেব না। কিন্তু গঙ্গার এক জায়গাতেই আমি যদি তোরঙ্গটা ফেলে দিই, কিংবা ধনরত্নগুলো এক জায়গাতেই নিক্ষেপ করি, তাহলে তোমরা হয়তো ডুবুরি নামিয়ে আবার তা উদ্ধার করবে। তাই মাইল পাঁচ ধরে আমি গুপ্তধন ফেলে দিতে দিতে এসেছি। গঙ্গার গভীর জলের ভিতর থেকে সেসব উদ্ধার করবার ক্ষমতা আর কারুর হবে না। হা, হা, হা, হা! গুপ্তধন কোথায়, গুপ্তধন কোথায়? মা গঙ্গাকে জিজ্ঞাসা করো! হা, হা, হা, হা!'

॥ পরিশিষ্ট ॥

হাতে হাত, চোখে চোখ

সন্ধ্যা নেমেছে কলকাতা শিয়রে। শহরে নেই চাঁদের সমাদর। হাজার হাজার বিজলি বাতি দখল করে বসে চাঁদের আসর।

গাড়ির ভিতরে প্রবেশ করেই চিত্রা একটা আশ্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলে উঠল, 'বাবা, বাঁচলুম! রানি দুর্গাবতীর গুপ্তধন গ্রহণ করলেন মা গঙ্গা! গুপ্তধনের এর চেয়ে সদগতি আর কিছুই হতে পারত না! কী বলেন ভাস্করবাবু, তাই নয় কি?'

আমি বললুম, 'কী উত্তর দেব বুঝতে পারছি না। তবে ভগবান তোমারই আর্জি মঞ্জুর করলেন দেখছি। গুপ্তধনের ভার তোমাকে আর বহন করতে হল না।'

—'সত্যি বলছি ভাস্করবাবু, আমি দুঃখিত হইনি।'

—'কিন্তু চিত্রা, একদিক দিয়ে আমি আশ্বস্ত হয়েছি। গুপ্তধন পেলে তুমি থাকতে কত উচ্চে, আমি কি আর তোমার কাছে পৌঁছুতে পারতুম?'

চকিত চোখে আমার দিকে ক্ষণিক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে চিত্রা খুব নীচু গলায় বললে, 'তাহলে আপনার কি বিশ্বাস, আপনি আজ আমার কাছ পর্যন্ত পৌঁছতে পেরেছেন?'

—'হ্যাঁ চিত্রা, মনে তো হয় পৌঁছতে পেরেছি। দয়া করে এখন তুমি যেন আর দূরে সরে যেয়ো না।'

চিত্রা নিরুত্তর হয়ে বসে রইল।

আমি তার দিকে আর একটু এগিয়ে গিয়ে বললুম, 'ষোড়শ শতাব্দীর গুপ্তধনের রহস্য এই বিংশ শতাব্দীতে একটা অস্বাভাবিক রোমান্সের মতো শোনায়। তার চেয়ে যা স্বাভাবিক, এখন তাই নিয়েই আমরা মাথা ঘামাই এসো।'

—'কী স্বাভাবিক ভাস্করবাবু?'

—'বাস্তব জীবনের রোমান্স। তারই মধ্যে জন্মলাভ করেছিল পৃথিবীর প্রথম পুরুষ আর

প্রথম নারী। তাদেরই কামনা আজ এই বিংশ শতাব্দীর কোটি কোটি নরনারীর মনের গোপনতার ভিতরে ছড়িয়ে আছে বসন্তের উদ্দাম বাতাসের মতো। নিখিল মানুষের মন যা চায় আমরাও কি তাই চাইতে পারি না?'

তখনও চিত্রা কোনও কথা বললে না। কিন্তু, আমার হাতের উপরে রাখলে একখানি থরথর কম্পিত কুসুম সুকুমার বাহুলতা। তার দৃষ্টির সঙ্গে মিলল আমার দৃষ্টি, সে আজ আর চোখ নামিয়ে নিলে না।*

দুপুরে

চোখ পড়ে ঢুলে গো, মন পড়ে ঢুলে গো,
তপনের মায়াতে,
চোত গেছে পালিয়ে, তাপ-শিখা জ্বালিয়ে,
স্বপনের ছায়াতে।

ফটিকের ধারা কই, চাতকেরা সারা ওই,—
বুক হল মরু যে!
সুর-ভোলা পাপিয়া! মূর্ছিত কাঁপিয়া
বকুলের তরু যে!

কাছে আর সুদূরে, দুপুরের নূপুরে,
হু-হু তান আগুনের,
শোনা যায় ক্ষিতিতে, শুধু আজ স্মৃতিতে
'কুহু' গান ফাগুনের!

গোলাপের রেণু নাই, প্রলাপের বেণু তাই
বাতাসেতে গুঞ্জে,
একি কাল-বেলি এ, কুঁড়ি তাই এলিয়ে
হুতাশেতে কুঞ্জে!

রাখাল সে ঘুমিয়ে, বাঁশি-মুখ চুমিয়ে,
ধূপ-শুকো হাওয়া রে!
মহিষেরা কর্দম মাখে শুধু হর্দম!
আর খোঁজে ছাওয়া যে!

ঘু-ঘু-ঘু ওই ডাকে নির্জনে বৈশাখে
কোথা দূর বনেতে,

*'দুপুরে' কবিতাটি দেবসাহিত্য কুটীরের 'ছোটদের চয়নিকা' থেকে সংকলিত।

রোদ-ভরা পথ দিয়ে, প্রাণ-ভরা ঘুম নিয়ে
আসে সুর মনেতে!

ঘু-ঘু-ঘু ডাকেরে, মরমের ফাঁকেরে
ছায়া মাখা ছন্দে,
যেন সুর নাচেরে, করুণায় যাচেরে,
ঘুমেরই আনন্দে!

ঘু-ঘু-ঘু আসে গীত, আকাশে ভাসে প্রীত,
সাথে নিয়ে তন্দ্রা,
চোখ পড়ে ঢুলে গো, মন পড়ে ঢুলে গো,
তাপে আনে চন্দ্রা!

চৈনিক চৈতন-চুটকি

স্বপনে কাল পেয়েছিলাম আলাদিনের প্রদীপ রে ভাই!
ঘষতে প্রদীপ সামনে হাজির মস্ত বড়ো দৈত্যমশাই!
বললে আমায়—'খোকাবাবু! ডাকলে কেন! কী চাই বলো?'
বলনু আমি—'আলিবাবার রত্নগুহায় নিয়ে চলো?'

গেলাম সেথায়, কাসিম-মিয়া শুনলে যেথায় শমন-ডাক।
চল্লিশজন দস্যু সেথায় আর বলে না—'চিচিং-ফাঁক'!
গুহা আছে—মোহর তো নেই! কলশিগুলো ফক্কা হায়,
সাত-রাজার-ধন মানিক-টানিক কিছুই এখন নেই সেথায়।

বেরিয়ে এসে বলনু আমি—'শুনো শুনো দৈত্যবর!
বলতে পারো, সিন্দবাদের রক-পাখিদের কোথায় ঘর?'
দৈত্য বলে—'রক-পাখিদের বধ করেছে স্বয়ং যম,
বাসা তাদের উড়িয়ে দিলে হিরোসিমার অ্যাটম-বোম!'

*'চৈনিক চৈতন-চটকি' কবিতাটি 'মৌচাক' পত্রিকার ৩৪ বর্ষ-একাদশ সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩৬০ থেকে সংকলিত।

বলনু আমি—'গল্পে শুনি তুমি নাকি একদিনেই
তৈরি করে দিয়েছিলে সাতমহলা প্রাসাদকেই?'
হাহা-হোহো হাস্য করে বললে দৈত্য-জাঁহাবাজ—
'আরে সে যে তাদের প্রাসাদ, তৈরি করা শিশুর কাজ!'

জিজ্ঞাসিনু—'হ্যাঁগো দাদা, আলাদিনের বংশধর,
সাকিন তাদের কোথায় এখন, জানো কি ভাই তার খবর?'
'আটশো বছর বয়স আমার, ঠিকানা আর নাইকো স্মরণ,
দেখবে খোকা, জবর জিনিস? কাছে আছে চিনে-চৈতন।'

'চিনে-চৈতন? বাক্যি শুনে হচ্ছি দাদা হতজ্ঞান!'
'চৈতনকেই টিকি বলে বাংলা ভাষার অভিধান।
শেষ-বিদায়ের দিনে আমায় বলেছিলেন আলাদিন—
'আমার মাথার এই টিকিটি নাও উপহার তুমি জিন'!'

আলাদিনের চিনে-চৈতন লম্বায় প্রায় আটাশ ফিট,
তাই দিয়ে কেউ রাখলে বেঁধে পাগলা হাতি হবে ঢিট।
চোখ পাকিয়ে দেখতে গিয়ে মিলিয়ে গেল স্বপ্নলোক,
জাগরণের দেশে এলাম দু-হাত দিয়ে কচলে চোখ।